আরব দেশ ও জাতি ঃ
উৎস এবং মহাযুদ্ধের উত্তরাধিকার

মূলঃ এডওয়ার্ড আতিয়াহ্
অনুবাদঃ মোঃ আলী আজম

প্রকাশনা সংস্থা
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
www.marupalash.net
রিয়াদ, সউদী আরব।

প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ
কার্তিক, হেমন্তকাল ১৪১৫বাঙলা
ইন্টারনেট সংস্করণঃ
১২ নভেম্বর ২০০৮ইং।।

প্রকাশক ঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ
রিয়াদ, সউদী আরব।।
E-mail: marupalash@gmail.com
Mobile # 056 072 4131

বাংলা কম্পোজ ঃ
বৃষ্টি এবং নদী

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ অনুবাদক /লেখক

সকল যোগাযোগঃ
E-mail: marupalash@gmail.com
website : www.marupalash.net

“আরব দেশ ও জাতি ঃ উৎস এবং মহাযুদ্ধের উত্তরাধিকার”

মূল : এডওয়ার্ড আতিয়াহ্
অনুবাদ: মোঃ আলী আজম

প্রসঙ্গ কথা

আরব কিংবা পারস্য, রাজনৈতিক বিতর্ক এড়াতে উপসাগরীয় এলাকাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, একপ্রজন্মে তিন তিনটা মারাত্মক যুদ্ধে এই ভৌগলিক অঞ্চলের আর্থিক , মানবিক ক্ষয়ক্ষতির তাতে কোন হেরফের হয়না। যুদ্ধ এ জনপদে নুতন কোন ঘটনা নয়। প্রাচীন অনেক সভ্যতারও লীলাভূমি এ’ মাটি। এ খর্জুর বীথি থেকেই একদিন যুদ্ধ এবং শান্তি হাতে হাত ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে আর আজ যুদ্ধকে যেন এর রাজা-বাদশাহ,আমীর উমরাহরা দাওয়াত করেই আনছে। চলমান তৃতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ মানবিক অবক্ষয় আর বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমানকে ছাড়িয়ে আরবদের আরব পরিচয়কেই নড়বড়ে করে দিয়েছে। আরবদের ভাষাভিত্তিক,ধর্মীয় ঐক্যসুত্রের বৃহত্তর পরিচয় আজ নানা সংকীর্ণতার পাঁকে আবদ্ধ; ধনী দরিদ্রের বিভেদ তো আছেই ।

কথার কথায় পর্যাবসিত আরববিশ্বের ভৌগলিক ঠিকানা। অথচ ইতি উতি মার খাওয়া মানুষের মধ্যে একজন সালাহ্ উদ্দিন আয়ুবী কিংবা জামাল আব্দুল নাসেরের নামে নিখিল আরব জাতিয়তাবাদের স্বপ্নে বিভোর সাধারনের খোঁজ পাওয়া যায় সহজেই, ৮০০ বছর ইউরোপ শাসনের নস্টালজিয়ায় ভোগেন এখানকার কম-বেশী সবাই। ধর্মীয় ঐক্যসুত্রে আমরাও হাতে তার খোশবু খুঁজি। কিন্তু ভেবে দিশা পাইনা দামেস্ক, বাগদাদ , কর্ডোভা,গ্রানাডার পতনের পর এতকালব্যাপী ,আরবদের নিজের আঙিনায় অপদস্থ হওয়ার হেতু কি। বিশ্ব জুড়ে অঞ্চল ভেদে যে আর্থ-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ফোরাম পারস্পরিক বিরোধ মেটায়,সংহতি দৃঢ় করে আরব বিশ্বে তা আরও নুতন ঝগড়ার প্লাটফরমে পরিণত হয় কেন ।

শ্রেণী বিশেষের কাছে বিত্ত বিলাসের পুনরাবির্ভাব এই ভৌগলিক সীমানায় অতীতকে হার মানালেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা-বিকাশ কিংবা সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতির বিচারে কৃষ্ণ গহ্বরে নিপতিত নুতন আরব্য উপন্যাস। বিশ্বের বন্দর থেকে বন্দরে ঘুরে যারা একদিন পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার স্ফীত করেছিল, পায়ের নীচে তরল সোনার নির্ঝর পেয়েও তাদের এই হতমান, দৈন্যদশা নানা প্রশ্ন উস্কে দেয়। বলাবাহুল্য এই প্রশ্নগুলো মৌলিক আরব চরিত্রকে ঘিরে।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ খোলস পাল্টানোর যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের শক্তিতেই দেশে দেশে মানুষ জেগে উঠেছে,সাম্রাজ্যবাদী শেকল ঝেড়েও ফেলেছে অনেকে। ব্যতিক্রম শুধু এই আরব দুনিয়া; সাম্রাজ্যবাদ এখান থেকে কখনও চিরতরে হাত গুটোয়নি, তার প্রয়োজনও হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বুদ্ধিবৃত্তির জাগরন , জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, ক্ষেত্র বিশেষে ধর্ম-বর্ণ-সাংস্কৃতিক প্রেরনায় উজ্জীবিত উগ্র জাতীয়তাবাদের স্ফুলিঙ্গ এখানেও দেখা গেছে। হারানো সাম্রাজ্য ,ঐক্য কিংবা অর্থবহ স্বাধীনতার বদলে নিত্য নুতন রাজা বাদশা উপহারের মধ্য দিয়ে আরব মনের এ চিত্ত চাঞ্চল্য অনায়াসেই মিটিয়ে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ।

প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। নানা ফন্দি-ফিকিরের রোড ম্যাপের মুলো ঝুলছে। জর্জ লয়েড ,ক্লিম্যন স্যু ,উইলসনদের বদলে মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন এবং হচ্ছেন খোকাবুশ, ব্লেয়ার। মিলনার, চার্চিলদের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে বসরা,বাগদাদের অলি গলিতে। তাদের আহলান সাহলান করার নরোত্তমও অনেক। আর বিচ্ছিন্ন , বিক্ষুব্ধ আরব মানসকেও খুঁজে পাওয়া যায় আল ফাত্তাত, আল আহদ এর আদলে গড়ে উঠা ধোঁয়াটে কিন্তু অধিকতর হিংস্র অন্য কোন নামে। নুতন সহস্রাব্দের পৃথিবীতে পশ্চিমা প্রযোজনায় আরবদের নামে এ উপস্থাপনা শান্তিকামী মানুষের কাম্য ছিলনা।

পুনরাবৃত্তিই ইতিহাসের মুল স্রোত। বিংশ শতক শুরুর ইতিহাস মুলতঃ আরবদের মৌলিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের এই পুনরাবৃত্তিরই ইতিহাস। উপসাগর থেকে মহাসাগর ব্যাপী জনপদের চালচিত্রে তারই বিশদ বর্ণনা, 'শাত ইল আরব'র বেলাভুমিতে তারই অনুরণন। আবেগী , নির্মোহ এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সনে (ঢ়বহমঁরহব নড়ড়শং) প্রকাশিত এডওয়ার্ড আতিয়াহ্' (বিশিষ্ট আরব শিক্ষাবিদ ,১৯৪৫ সন পর্য্যন্ত সুদান সরকারের জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং পরবর্তীতে, পশ্চিমা দুনিয়ায় আরব দেশসমুহ, বিশেষতঃ প্যালেস্টাইন প্রশ্নে আরব অবস্থান তুলে ধরার উদ্দেশ্যে গঠিত লন্ডনে বিখ্যাত 'আরব অফিস' তথা আজকের আরব লীগ এর সংগঠক) র লেখা *ওএ্যব অৎধনঝ* গ্রন্থের ভাবানুবাদ। সমকালীন বাস্তবতা ধরে রাখতে লেখক প্রদত্ত তথ্য উপাত্ত ,পরিসংখ্যান যথাযথভাবে (১৯৫০ এর কাছাকাছি এবং *চিহ্নিত) অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, সংযোজন বলতে মহাপুরুষদের নামে সাম্মাণিক শান্তি বর্ষন। ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গীও লেখকের নিজস্ব।

পুনশ্চঃ মুল বইটি ১৯৫০ এর প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা।

ভূমিকা..

আরব জনগন এবং ইতিহাসে তাদের অতীত-বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে যথার্থ অনুসন্ধান প্রচেষ্টার আগে কতিপয় বিষয় পরিস্কার করে নেয়া জরুরী। প্রথম হচ্ছে 'আরব' শব্দটা যে বিভিন্ন অর্থ বহন করে এবং যা পশ্চিমা পাঠকের কাছে প্রায়ই বিভ্রান্তির উৎস, এর অতিরিক্ত আরোপিত, অপ্রসাঙ্গিক সংস্কার অথবা অতি প্রশংসার কোনটাই আরবদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। আদিতে,কোরাণ তো বটেই , বাইবেল এবং বাইবেলপূর্ব যুগেও এরা ছিল মুলতঃ আরব উপদ্বীপে বসবাসকারী যাযাবর জনগোষ্ঠী। এদের পূর্বপুরুষের ভাষাতাত্বিক গ্রুপের এক শাখা থেকে ইহুদীদেরও জন্ম। শুধু আরব উপদ্বীপে নয় বরং জর্দান, সিরিয়া, ইরাক এবং উত্তর আফ্রিকায় আজও যাযাবর আরবদের দেখা মিলে। এরা 'বেদু' অথবা বেদুইন নামে পরিচিত, এবং ইতিহাসে প্রথম অর্ন্তভুক্তির দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত এদের জীবনধারা সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে।

তারা এখনও উটের পিঠে চড়ে দিক-চি হ্নহীন মরুভূমি পাড়ি দেয় যখন তাদের মাথার উপর দিয়ে জেট বিমান উড়ে। উট-ভেড়ার চারণভূমি থেকে নিকটবর্তী পানির কূয়ো পর্য্যন্ত এখনও তাদের দু' একদিনের পথ ভ্রমন করতে হয় । পানি ছাড়া প্রাণ বাঁচেনা, এবং পশুচর্মের মশকে করে তা তারা তাবুতে নিয়ে ফেরে । এই মরুচারীদের আদিম জীবন যাপনে প্রবল ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে সামাজিক শৃঙ্খলার কড়া বিধি নিষেধের চিরন্তন দ্বন্ধ বিদ্যমান। তাদের সামাজিক বিধান- একদিকে অন্য গোত্রকে লুন্ঠন করার অনুমতি দেয় আবার কোন আগন্তুককে আশ্রয় আতিথ্য দেবার বাধ্য-বাধকতাও আরোপ করে।

আদি ধারনায় 'আরব' বলতে এই আদিম জনগোষ্ঠীকেই বুঝায়। এমনকি আজকের আরববিশ্বের কায়রো অথবা খার্তুম,দামেস্ক অথবা বাগদাদের সুসভ্য অলস নাগরিকেরাও এই যাযাবরদের সুনির্দিষ্টভাবে 'আরব' আখ্যা দিতে উদগ্র। অতএব, বিভিন্ন সময়ে হলিউডের সেলুলয়েডে একজন রুডলফ ভেলেন্টিনো কিংবা ডগলাস ফেয়ারব্যাংকের কল্যাণে,সাধারণ বিশেষঃত পশ্চিমা মানসপটে উট,মরুভূমি,খর্জুর বীথি,তাবুর প্রেক্ষাপটে দুর্দম সামন্ত জীবনের এই চিত্রই আঁকা হবে তাতে আর আশ্চর্য্যের কি? সাধারণ পশ্চিমা মনে 'আরবের' সাথে যাযাবরদের একাত্ম করা এই চিত্র অংকনে স্বনামধন্য বৃটিশ পন্ডিত-পর্যটক বার্টন ডাউটি, টি ই লরেন্স প্রমুখের মরু ও মরুচারীদের জীবন নিয়ে মোহন রচনার অবদানও যথেষ্ট ।

আরব বলতে আরও বুঝায় ,কম-বেশী খাঁটি আরব বংশজাত এবং গৃহী ও যাযাবর নির্বিশেষে আরব উপদ্বীপের মানুষ। এই অর্থে শব্দটা আজকের সৌদী, ইয়েমেনী, কুয়েতী, প্রভৃতি 'বঃযহরপ্থ জাতি-গোষ্ঠী তথা আরবজন্মভূমির আদি বাসিন্দাদের অপরাপর উত্তর বংশধরদের বুঝায়। উপদ্বীপের এই অংশে তেমন একটা গোত্র সংমিশ্রন ঘটেনি। আদি আরবদের মধ্যে সংমিশ্রন ঘটেছে, বিশেষঃত বিজয়ের দিনগুলোতে বাইরে থেকে স্ত্রী, রক্ষিতা আমদানীর ফলে। তাৎপর্য্যপুর্ন এইযে , আজকের দিনে আরব বলতে সাধারণভাবে একটি সাংস্কৃতিক বন্ধনভুক্ত গোষ্ঠীকে বুঝায় । পুরো মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা (অবশ্যই আরব উপদ্বীপ সহ)- সপ্তম-অষ্টম শতকে মুসলিম বিজয়ের ফলে চিরস্থায়ীভাবে আরবীয়করণকৃত এই আরব বিশ্বের সমগ্র জনগোষ্ঠিই 'আরব' পরিচয়ভুক্ত।

আরবীয়করন ঘটেছে মুলতঃ তিন ভাবে।
১) বিজিত ভূমিতে আরব বিজেতাদের বৈবাহিক সম্পর্ক এবং বসতি স্থাপন।
২)সেখানে বৈশ্বিক ভাষা হিসেবে আরবীর প্রচলন প্রতিষ্ঠা
৩)বিজিত জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের ইসলাম ধর্ম গ্রহন।

স্বাভাবিকভাবে গোত্র সংমিশ্রন বেশী ঘটেছে আরব উপ-দ্বীপের সন্নিকটবর্তী অঞ্চল যেখানে আরব অভিবাসীরা অধিক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেছে যেমন প্যালেস্টাইন, জর্দানে । অন্যদিকে ইরাক, সিরিয়া, মিশর, সুদান হয়ে পুরো উত্তর আফ্রিকার বেলাভূমি ধরে সুদুর মরক্কো পর্য্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এই মিশ্রন অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় ঘটেছে। এসব দেশের নিজ নিজ গোত্রের ভেতর আরব রক্তের অনুপাত নির্ধারন আজ যেমন অসম্ভব; তেমনি ব্যক্তি বিশেষের পক্ষেও বলা সম্ভব নয় সে কতোটা, কতোমাত্রায় আরব বংশের অধঃস্তন,যদি আদৌ সে তা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উত্তর সুদানে আগ্রাসী আরব গোষ্ঠী আদিবাসী কৃষ্ণকায়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পেতে এমন এক বংশধর জন্ম দিয়েছে যারা গাত্রবর্ণে আফ্রিকান আবলুস কাঠের রং থেকে শুরু করে 'নজদি 'আরবের হালকা বাদামী পর্য্যন্ত সব বর্ণ এবং আকৃতির দিক থেকেও পুরু ঠোঁট, খাঁদা নাকের নিগ্রোয়েড থেকে খাড়া,ঈগল চঞ্চুর মত বক্র --সেমেটিয় পর্য্যন্ত সব আকৃতি ধারণ করে। মিশরীয়, সিরীয়,এবং লেবানীজদের মধ্যে এই বিভিন্নতা যেমন---কালো চোখ , গাঢ় ত্বক থেকে শুরু করে আকাশী নীল চোখ,সুন্দর চুল, ইউরোপীয় গঠন পর্য্যন্ত দেখা যায় যা গ্রীক-রোমান অথবা স্যাক্সন ক্রুসেডারদের উত্তরাধিকার গন্য হতে পারে।

আদি গোত্র উৎসের এই অনিশ্চয়তা স্বত্বেও, আরব বিশ্বের জনগন ,পূর্বে পারস্য উপ-সাগর থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ,এবং উত্তরে আলেপ্পো থেকে দক্ষিণে খার্তুম ছাড়িয়ে অব্যাহত বিস্তৃত আরবী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী নিজেদের আরব পরিচয় দেয় । এদের মধ্যে আছে পারস্য উপ-সাগরীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের বাসিন্দাগণ;ইরাকী,ইয়েমেনী,সৌদী,সিরীয়,লেবানীজ, ফিলিস্তিনী,জর্দানী,মিশরীয়,উত্তর সুদানীজ, লিবিয়ান, তিউনিসিয়ান, আলজেরীয়ান এবং মরোক্কানরা । এই বিশাল এলাকায় বসবাসকারী জনগনের মধ্যে যাযাবরদের অনুপাত নিতান্তই ক্ষুদ্র, সৌদিয়ায় * সর্বোচ্চ ২৪-৩০%। মিশর এবং লেবাননে তাদের সংখ্যা প্রায় শুন্যের কোঠায় নেমে গেছে। এখানে জনগনের বিরাট অংশ 'ফেল্লাহীন' বা চাষা, গ্রাম দেশে বাস করে তবে বেশ ভাল অংশ পুরনো প্রসিদ্ধ শহর সমুহ যথা-আলেপ্পো, দামেস্ক, বৈরুত, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ, জেরুযালেম, তিউনিস, ফেজ এ বাস করে। এ'শহরগুলো একসময় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। রোম-বাইজান্টাইন যুগ কিংবা তারও আগে থেকেও যদি না হয়ে থাকে,অন্ততঃ আরব বিজয়ের পর থেকে এখানে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টা পরিস্কার করা দরকার তা হচ্ছে 'আরবত্ব 'এবং ইসলাম ব্যাখ্যাতীতভাবে পরস্পর সম্পর্কিত, এবং শুরুতে বাস্তবিকই তা অবিচ্ছেধ্য ছিল (প্রাক-ইসলামী যুগের আরব রাজ্য গাসসানিদ এবং হেরার প্রসঙ্গ ছাড়া)। অবশ্য পরিস্থিতি আজ আর তেমন নয়। এখন আরব বলতেই সবসময় মুসলিম বুঝায়না, আবার মুসলিম বলতেও সবসময় আরব বুঝায়না।

উদাহরণ স্বরূপ পারস্য যদিও আরব সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং আজও মুসলিম অধ্যুষিত কিন্তু আরবীকে পাকাপাকি নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহন করে কিংবা আরবদের সাথে গোত্র সংমিশ্রনের মাধ্যমে তা কখনও আরবীয় হয়নি । তদুপরি ভারতবর্ষ, চীন, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অসংখ্য মানুষকে ইসলাম ধর্মান্তরিত করেছে তাদের আরব বিশ্বের বলয়ে না এনে কিংবা সেখানে আরবী ভাষা চাপিয়ে না দিয়ে। এমনকি পরবর্তীতে আরব বিজেতা তুর্কিরাও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে আরবীয় না হয়ে। এখন আমাদের সামনে বেশকয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ এশীয় রাষ্ট্র রয়েছে যারা মুসলিম কিন্তু আরব নয়। পারস্য, তুর্কির পর এদের মধ্যে আছে আফগানিস্তান, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আরব বিশ্বে যথেষ্ট সংখ্যায় খ্রীশ্চান সম্প্রদায় রয়েছে।

ইসলাম ধর্মের আগমনেরও অনেক আগে দক্ষিণ সিরিয়া এবং ইরাকের আরব বসতি সমুহ (গাসসানিদ এবং হেরার জনগনের মত) খ্রীশ্চান ধর্মমত গ্রহন করেছিল । এটাও সম্ভব যে আজকের লেবানন, প্যালেস্টাইন এবং ইরাকের অনেক খ্রীশ্চানেরা সেই প্রথম দিকের খ্রীশ্চান আরবদের বংশধর। জাতিতে তারা আরব, এবং

সবসময়ই আরবী তাদের মাতৃভাষা। আরব বিশ্বের অন্যান্য খ্রীশ্চানরা যেমন- মিশরের 'কপ্ট',লেবাননের 'মেরনাইট'রা গোত্র বিচারে আরব নয়। তাদের অনেক স্বদেশী মুসলিমদের মত তারাও বিজিত হয়েই আরব হয়েছে। তবে পূর্বোক্তরা যেখানে ইসলাম ধর্ম এবং আরবী ভাষা গ্রহন করেছে, সেখানে পরবর্তিরা শুধু আরব হয়েছে তাদের নিজস্ব খ্রীশ্চান ধর্মমতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আচার-সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহন করে। তা স্বত্বেও শাসক সংখ্যাগুরুর প্রভাব, আধিপত্য এতই প্রবল ছিল যে বিজয়ী মুসলিমদের অনেক ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতিও ক্ষুদ্র খ্রীশ্চান সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো গ্রহন করেছে এবং তা তাদের মধ্যে টিকেও গেছে। এভাবে এই সেদিনও , এবং দেশের শাসন ক্ষমতা মুসলিমদের বদলে খ্রীশ্চানদের (ফরাসী) হাতে গেলেও সিরিয়ার হোমস এবং হামা শহরতলীর খ্রীশ্চান রমনীরা তাদের মুসলিম বোনদের মতই বোরকা পরা অব্যাহত রেখেছে।

আরব বিশ্বে সবচে' বড় খ্রীশ্চান সম্প্রদায় রয়েছে মিশরে (যেখানে মোট * ২২ মিলিয়ন জনসংখ্যায় 'কপ্ট'দের সংখ্যা প্রায় সোয়া মিলিয়ন), এবং লেবাননে যেখানে মিলিয়ন জনসংখ্যার প্রায় সমান সমান খ্রীশ্চান ও মুসলিম; মাউন্ট লেবানন (উপকূলীয় শহর হিসেবে এবং দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্নতর বিধায়) জনসংখ্যা এবং আচারে খ্রীশ্চান প্রধান। সিরিয়ায় (প্রায় * সাড়ে তিন মিলিয়ন জনসংখ্যার)১০% খ্রীশ্চান, ইরাকে প্রায় * ৫ মিলিয়ন জনগনের মধ্যে ৯০ হাজার খ্রীশ্চান, প্যালেস্টাইন আরব জনগন ১৯৪৮ সনে বাস্তুহারা হওয়ার আগে সংখ্যায়* সোয়া মিলিয়ন যার প্রায় ১ লাখ ২০হাজার খ্রীশ্চান। এই প্যালেস্টাইনী খ্রীশ্চানদের অধিকাংশই এখন জর্দানে ।

খোদ আরব উপদ্বীপে খ্রীশ্চান সম্প্রদায় নেই । ইসলাম ধমের্র ভিত্তিভূমি শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত থাকবে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল দ্বিতীয় খলিফা ওমরের রাজত্বকালে। তখন ক্ষুদ্র খ্রীশ্চান (এবং ইহুদী) সম্প্রদায়কে উপদ্বীপ ছেড়ে দক্ষিণ সিরিয়ায় বসবাসের জন্যে বরাদ্দ দেয়া জায়গায় চলে যেতে হয়েছে। পশ্চিম আরব বিশ্বে (যেমন -লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কোয়) অনুরূপ কোন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত না হলেও স্থানীয় জনগনের মধ্যে খ্রীশ্চান সম্প্রদায় নেই।

এসব আরব খ্রীশ্চানরা যে সমস্ত চার্চের আওতাভুক্ত তাতে---রোম এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যেকার মারাত্মক বিরোধ এবং তার আগে পরের খ্রীস্টীয় ঐক্য-বিনাশী ফিতনা-ফ্যাসাদ সমূহ পুরোপুরিই বিদ্যমান। উদাহরন স্বরূপ ৫ম -৬ষ্ঠ শতকের ঐতিহ্য নিয়ে 'কপ্টিক চার্চ' নিজস্ব কর্তৃত্বে বিদ্যমান, এবং রোম কিংবা পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীক অর্থডক্স চার্চ থেকে স্বাধীন। মিশর,প্যালেস্টাইন(এখন জর্দানে) লেবানন,সিরিয়ায় অর্থডক্স চার্চের অনেক অনুসারী আছে এবং এর চারটি প্রধান কেন্দ্রের তিনটি আরব শহর যথাক্রমে আলেকজান্দ্রিয়া,জেরুযালেম, এবং এন্টিয়কে; চতুর্থটা কন্সটান্টিনোপলে। এর অনুসারীদের সংখ্যা ক্যাথলিক চার্চসমূহের মত বিশাল না হলেও এদের মধ্যে আছে (রোমান চার্চ বাদে) মেরনাইট,গ্রীক ক্যাথলিক এবং অন্যান্য শাখা প্রশাখা সমূহ যারা কোন না কোন সময়ে রোমের সাথে সম্পর্ক রেখেও কিছুটা স্বকীয়তা বজায় রাখে।

গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে প্রধানতঃ গ্রীক অর্থডক্স শ্রেণী থেকে সদস্য সংগ্রহ করে, মার্কিন-বৃটিশ মিশনারীদের মাধ্যমে এখানে কিছু প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ গড়ে উঠছে। আরব বিশ্বে এ'সংখ্যালঘু খ্রীশ্চান সম্প্রদায় সমুহের ঠিকে থাকার পেছনে মুসলিম বিজেতাদের সহনশীলতা এবং অংশতঃ বিচক্ষণতার ফসল। মুসলিম বিজেতারা বিজিত জনগনকে ইসলাম অথবা তরবারী পছন্দের সুযোগ দিয়েছিলেন বলে প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাসটা বাস্তবের সাথে মিলেনা। অবশ্যই আরব উপদ্বীপের পৌত্তলিকদের জন্যে এই নির্দেশ থাকলেও ধর্মগ্রন্থের অনুসারী (খ্রীশ্চান এবং ইহুদী) এবং পারস্যের জুরুস্ত্রীয়দের জন্যে--খলিফাকে কর দিয়ে স্ব-স্ব ধর্মবিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখার তৃতীয় বিকল্প রাখা হয়েছিল। যে সমস্ত খ্রীশ্চান ধর্মান্তরে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে তাদের শুধু যে চার্চের বিধি বিধানের আওতায় থাকতে দেয়া হয়েছে তা নয় বরং তাদের পুরোহিতদেরকেও মুসলিম শাসকগন বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় প্রায় -রাজনৈতিক ক্ষমতাও দিয়েছেন।

সত্য বটে এই খ্রীশ্চান সংখ্যালঘুরা আরব গোত্রের হলেও তারা আরব সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বিবেচিত হয়েছে। উপস্থিতি সহ্য করা হলেও তাদের কখনও মুসলিমদের সমান হিসেবে গ্রহন করা হয়নি। পক্ষান্তরে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে নও মুসলিমরা আরব গোত্রের না হলে আরব বিশ্বাসীরা তাদের সমান মর্য্যাদায় গ্রহন করেনি এবং এটা হয়েছে বিশ্বাসীদের প্রতি তাত্বিক সমতা বিধানে নবীর নির্দেশ স্বত্বেও । উঁচু পদের জন্যে কাউকে একই সাথে মুসলিম এবং আরব গোত্রের হতেই হত। তবে মর্য্যাদা পুরোপুরি নির্ধারিত হতো পিতার গোত্র এবং ধর্ম বিচারে । মায়ের ধর্ম,গোত্র এবং পিতার সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের মর্য্যাদা (যেহেতু অধর্মান্তরীত খ্রীশ্চান, ইহুদী রমনীকে স্ত্রী কিংবা উপপত্নি হিসেবে গ্রহন করার অনুমতি ছিল) নির্বিশেষে আরব মুসলিম পিতার সন্তান মাত্রেই কুলীন বিবেচিত হয়েছে।

শতাব্দীর গতি প্রবাহে খ্রীশ্চান আরব সম্প্রদায় সমুহ, আলবার্ট হোরাইনীর অবিস্মরনীয় উক্তিতে 'সংখ্যালঘুর দুর্ভাগ্যজনক বিজ্ঞতা-- ঠিকে থাকার জ্ঞান' অর্জন করেছে । ঠিকে তারা আছেও, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আজকের আরব দেশসমূহে তাদের মর্য্যাদা পরবর্তীতে আলোচ্য। আপাততঃ ইতিহাস ব্যাপী আরব বিশ্বের এক উপাদান হিসেবে তাদের অস্তিত্ব মনে রাখাই যথেষ্ট। শেষতঃ খোদ ইসলাম এবং 'জুডাইজম' ও 'খ্রীশ্চানিটি'র সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি কথা -- মুসলিমদের বিবেচনায় 'গোত্রীয় বিশেষায়ন' এবং ইহুদী,খ্রীশ্চানদের চর্চায় আরোপিত সুক্ষ্ম,দার্শণিক ধর্মতত্ব ছাড়া সবার ঈশ্বর মুলতঃ একই।

নবী মোহাম্মদ (দঃ) শুধু যে ইহুদী, খ্রীশ্চান উৎস থেকে একেশ্বরবাদ জেনেছেন তা নয়,অধিকন্তু মুসা (দঃ), ঈসা(দঃ)কে তাঁর পুর্বসুরীর মর্য্যাদা দিয়ে এবং তাঁদের বানীর পরিপুর্নতা দেবার মিশনে শেষ নবীর দাবীও করেন। বাইবেলের অনেক পরিচিত গল্প এবং নাম কোরাণে আছে। ঠিক কোন সময়টাতে মোহাম্মদ(দঃ) উপলব্ধি করেন যে তিনি আরব উপদ্বীপের পৌত্তলিকদের সামনে শুধু যে ইহুদী, খ্রীশ্চান একেশ্বরবাদ প্রচার করছেন তা নয় ,মুর্তি বিজিত পতিত খ্রীশ্চান বাইজান্টাইনদের শুধু পেছনের পথেই ডাকছেন না বরং বিশ্বের সামনে এক নুতন, স্বাধীন, বিজয়ীর ধর্ম প্রবর্তন করছেন তা নিরুপন করা দুরুহ। এই ধর্ম যুগপৎ তাত্বিক ও ব্যাবহারিক। মোহাম্মদ(দঃ) বিজয়ী হয়েছিলেন এবং তাঁর মিশন পরিপুর্নতার যাত্রাপথে শাসকও হয়েছিলেন। খ্রীস্ট অনুমোদিত আলাদা এখতিয়ারের বদলে ইসলামে ঈশ্বর ও সিজারের কর্তৃত্ব সাম্রাজ্য মিলে মিশে যায়।

এখানে স্বগীয় অনুমোদনে সামাজিক আইন কানুনের পরিপুর্ন পদ্ধতি প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম খ্রীশ্চানিটির চেয়ে 'জুডাইজমের' অনেক কাছাকাছি। পক্ষান্তরে পার্থিব জীবনের বদলে পরবর্তী জীবনে সুনির্দিষ্ট এবং সুনিশ্চিত পুরস্কার ও শাস্তির বিধান দিয়ে , গোত্রের বদলে সার্বজনীন বৈশ্বিক বাণী প্রচারের মাধ্যমে ইহুদীদের চেয়ে বরং খ্রীশ্চান জাগতিক অসারতা তত্ব অনুসরন করে, যদিও বিশ্বাসীদের প্রতি এর প্রতিশ্রুত স্বর্গ, খ্রীশ্চান স্বর্গের মত অস্পষ্ট অনুভবের নয়। মর্ত্যের মাটিতে প্রথম দিকের মুসলিম জীবনের কঠোরতা বিশেষতঃ প্রথম হুত) প্রথম দিকের খ্রীশ্চানদের কঠোর সংযমের মতোই, একই দুই খলিফা আবু বকর, ওমরের মধ্যে যা চির্চা ভাবে উপভোগ করে একই সাদামাঠা আধ্যাত্ম গৌরব, এবং সম্পদ ঐশ্বর্য্যের প্রতি একই বিরাগ--যে বিশ্বাসের জন্য শাশ্বত মুল্যবোধে।

প্রথম অধ্যায়

আরব সাম্রাজ্যের উত্থান- পতন

গিবনের Decline and fall of The Roman Empire গ্রন্থের ৪৭তম অধ্যায় শেষ হচেছ এভাবে– "সম্রাট(হেরাক্লিয়াস)যখন কন্সটান্টিনোপল কিংবা জেরুযালেমে বিজয়োৎসব করছেন তখন সিরিয়ার সীমান্তে কোন অখ্যাত শহর লুঠ করছিল সারাসিনরা। প্রতিরোধে আসা ছোট ছোট সেনাদলকেও তারা ছিন্ন ভিন্ন করছিল। প্রচন্ড কোন বিপ্লবের আগমনী বার্তা না হলে এসব খুবই তুচ্ছ,সাদামাঠা ঘটনা। এই দস্যুরা ছিল মোহাম্মদের অনুসারী,ধ্বজাধারী: তাদের উন্মত্ত বিক্রম মরু থেকে উত্থিত,এবং হেরাক্লিয়াস তার রাজত্বের শেষ আট বছরে পারস্যবাসীর কাছ থেকে উদ্ধার করা প্রদেশগুলো এই আরবদের কাছেই হারিয়েছেন।" ইতিহাসে এভাবেই আরবদের পদার্পন। তাদেরকে এভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে , আপাতঃদৃশ্যে খুবই হালকা চালে পেছনের দরজা দিয়ে, একজন মানুষের নৈপুন্য দ্বারা,যিনি অসংখ্য পৌত্তলিক মুর্তির রাজত্বের স্থলে এক ঈশ্বরের অধিষ্টান ঘটিয়েছেন এবং যিনি আল্লাহর রসুল হিসেবে তাঁর শাসন মেনে নিতে উপত্যকার দুর্দম,বিক্ষিপ্ত বেদুইন গোত্রদের বাধ্য করেছিলেন ।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসব বিক্ষিপ্ত আক্রমনের ঘটনার আগে আরবরা যেমন বিশ্বে গভীর কিংবা দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব ফেলেনি, পৃথিবীও তেমনি তাদের কোন খবর রাখেনি। আজকের জর্ডান এবং সিরিয়া নামের দেশসমূহে অতীত অভিবাসনের ফলে গড়ে উঠেছিল নাবাতীয় রাজ্য যার রাজধানী পেট্রা, এবং পালমিরা রাজ্য। মুলতঃ আরব হলেও দু'টি রাজ্যই বৃহত্তর পরিসরে গ্রীক প্রভাবে আচ্ছন্ন এবং ভাষা হিসেবেও তারা 'আরামিক' গ্রহন করেছিল।

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম অব্দে নাবাতীয় রাজ্য রোমের প্রদেশভুক্ত হয়। বিখ্যাত রানী জেনোবিয়া (আরবীতে জয়নব)র শাসনাধীন পালমিরাও রোমের পদানত হয় অন্ততঃ আরো তিন শতাব্দী পরে। পরবর্তি অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় সিরিয়ার সীমান্ত রাজ্য ঘাসসান এবং ইরাকের হেরা। উভয় দেশই খ্রীস্টিয় ধর্ম বলয় ভুক্ত হয় এবং ইসলামের আবির্ভাবের আগ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বাইজান্টাইন ও পারস্যের শাসনাধীনে থাকে। সময়ে সময়ে আরবের প্রতিবেশী মিশর, পারস্য , রোম, কন্সটান্টিনোপল ইত্যাদি পরাক্রমশালী বিশ্বশক্তিসমূহ এই উপত্যকার উপর অবাস্তব প্রভুত্ব দাবী করেছে, শুধু একবার বহিরাগত আক্রমণকারী (এক রোমান কন্সালের নেতৃত্বে) মুল আরব ভুমিতে এসে পোঁছে,পক্ষান্তরে সীমান্ত রাজ্যের এক আরব রোমের সিংহাসনে বসেন খ্রীস্টিয় তৃতীয় শতকে।

...

ইসলামের উত্থানের প্রায় দু'হাজার বছরেরও বেশী পূর্বে একই আরবদের পূর্বপুরুষদের আরও একটি শাখা, খুব সম্ভব একই উপত্যকা থেকে অনুরূপ ঐতিহাসিক উত্থান ঘটিয়েছে যা তদপরবর্তি সময়ে মানব জাতির চিন্তা চেতনার ধারাকে সমন্বিত ,সংহিত করে চলেছে। এই খ্রীস্টিয় গৌরব, মূলে সেমেটিক প্রভাব নিয়ে অনারব বিশ্বে বিকশিত এবং এটাই মোহাম্মদের(দঃ) অনুসারীদের আক্রমণের মুখে পড়েছে। যখন হিব্রুরা মিশর ও ব্যাবিলনে প্রজাদাসত্বে দিন কাটাচ্ছিল, মুসা(দঃ) যখন তাদের মরুভুমির মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং জেরুযালেমে যখন সলোমন(দঃ) প্রার্থনা গৃহ নির্মাণ করছিলেন; এবং এমনকি পরবর্তীতে বেথেলহেমে জন্ম নেয়া দাউদের(দঃ) বংশধর যখন মানবতার বানী নিয়ে গ্রীক– রোমান সাম্রাজ্য জয় করছিলেন তখনও আরবরা মুলতঃ তাদের মাতৃভূমিতে সভ্যতার মুলধারার বাইরে গতানুগতিক জীবন যাপন করছিল।

এই জীবন ছিল বহুদেবত্ববাদ,এবং মুলতঃ যাযাবরের। উপত্যকার দক্ষিণের অংশে সামান্য কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার বিকাশ ঘটলেও উত্তরের রুক্ষ মরুর এখানে ওখানে অতি অল্প কতেক কুয়ো ,ঝর্ণাকে ঘিরে বিক্ষিপ্তজনগোষ্ঠী কৃষি ভিত্তিক জীবন ধারণ করছিল। এই জনগোষ্ঠীগুলো বেদুইনদের লুঠতরাজ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যে দেয়াল ঘেরা শহরে বাস করতো; এবং এই শহর গুলোর সাথে এক পর্য্যায়ে দক্ষিণ সিরিয়ার কারাভাঁ যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। খ্রীস্টিয় সপ্তম শতাব্দী নাগাদ এই শহরগুলোর মধ্যে মক্কা ও মদীনা বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে, শহরের জনসংখ্যা যথাক্রমে প্রায়* ১৫ থেকে ২০ হাজার ,আয়তনে মক্কা সামান্য বৃহত্তর । তবে মক্কার গুরুত্ব বাণিজ্য কিংবা কৃষির চেয়ে ধর্মীয় দিক থেকে বেশী। বিবদমান গোত্রগুলোর মাঝখানে পৌত্তলিক আরবের কেন্দ্রভূমি মক্কা --- পুন্যভূমি, সন্ধি এবং বরাভয়ের আশ্রয়স্থল।

বরাভয়ের মূলে ক্বাবা----- এক সুপ্রাচীন, ছোট, কালো পাথরে গড়া চতুর্ভূজাকৃতির প্রার্থনা গৃহ । এর প্রধান ভিত্তিতে ইব্রাহিমের (দঃ) পরশধন্য এক উল্কাপিন্ডের অবশেষ, যা দেশের সর্বত্র সব ছোট ছোট গোত্র দেবতার রক্ষাকর্তা হিসেবে সম্মাণিত। সেখানে সন্ধির মাস ছিল যখন গোত্র দ্বন্ধ স্থগিত রেখে ক্বাবায় উপাসনা এবং পবিত্র সন্ধি উদযাপনে লোকজন দলে দলে মক্কায় পুন্য যাত্রা করতো। মক্কার অনতিদুরে 'ওকাজ' নামক স্থানে মেলা বসতো, তাতে কবিতা আবৃত্তি ছিল উৎসবের প্রাণ। প্রেমের কবিতা, শোক গাঁথা,যুবরাজ-গন্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসা অথবা কবির নিজের উট, গোত্র এবং পূর্ব পুরুষের যশ গাঁথা এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে চূড়ান্ত স্বাধীনতায় কবির পৌরুষ বিক্রমের ফিরিস্তিও থাকতো। যশোঃপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিজেদের ভাষায় এই প্রতিযোগীতা আরবদের রুচি ও সৃষ্টিশীল বিনোদনের মুল উৎস হয়ে উঠতে থাকে। বিজয়ী কবিরা গৌরবান্বিত হন, এবং তাদের সেরা কবিতা ক্বাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এরকম ঝুলন্ত কবিতা নামের সাতটি কবিতা আজতক ঠিকে আছে।

দৃশ্যপটে মোহাম্মদ (দঃ)র আসার সময়কালে আরবী ভাষার উৎকর্ষতাকে বাড়িয়ে বলার অবকাশ নেই । আরব সভ্যতা এবং আরব সাম্রাজ্য যৌথভাবে ইসলাম ধর্ম এবং আরবী ভাষার সৃষ্টি। সপ্তম শতাব্দী নাগাদ আরব মরুভুমির উগ্র আদিম অধিবাসীরা মানব জিহ্বা এবং মনে তৈরী সর্বোৎকৃষ্ঠ এবং সর্বাধিক ভাব প্রকাশযোগ্য বাচন প্রক্রিয়ার অধিকারী না হলে এই দ্বৈত অর্জন কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা। কথ্য আরবী শব্দ ছাড়া ইসলামকেও চিন্তা করা যায়না, যেহেতু মোহাম্মদে(দঃ)র কাছে কোরাণ নাযেল হয়েছে মুখে মুখে,পংক্তিবন্ধভাবে সুর সমৃদ্ধ কবিতার আদলে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এর বিষয়বস্তু অদৃশ্য সৌন্দর্য্য ও শক্তি। কে বলবে আরবের নবী (দঃ)তাঁর নুতোন ধর্ম প্রচারে কতটুকু সার্থক হতেন যদি তাঁর ভাব প্রকাশের মাধ্যম অতখানি তৈরী অথবা আরব মন মানসিকতাও তাদের কবিতা ভালোবাসা ও চর্চার মাধ্যমে ভাষার চমৎকারীত্বের প্রতি অতটা সংবেদনশীল না হতো ? লেখার প্রচার প্রসার ঘটেনি এমন যুগে কাব্য প্রীতি ও আবৃত্তির চর্চা মরুবাসীদের বিস্ময়করভাবে স্মৃতিশক্তির প্রতি নির্ভরশীল করে তোলে। বিশেষতঃ দীর্ঘ কাব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মুখস্থ রাখা এবং তা আবৃত্তির মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় স্থান থেকে স্থানান্তরে যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে।

বিষয়টি সে সময়কার এক রাজকুমার সম্পর্কিত বিস্ময়কর এক গল্পে এভাবে বিধৃত:- এক রাজকুমারের ছিল আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তিধর একজোড়া ক্রীতদাস ও দাসী। ছেলেটা যে কোন কিছু একবার শুনে,এবং মেয়েটা তা দু'বার শুনে হুবহু আবৃত্তি করতে পারতো। একবার রাজকুমার রাজ্যজুড়ে ঘোষনা দিলেন কোন কবি যদি তাকে এমন কোন নুতন কবিতা শোনাতে পারে যা তিনি কিংবা তার ক্রীতদাস-দাসী শোনেনি তবে তাকে পান্ডুলিপির ওজনে স্বর্ণমুদ্রায় পুরস্কৃত করবেন। একের পর এক চারণ এসে চ্যালেঞ্জ গ্রহন করতে থাকলো কিন্তু

আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই ক্রীতদাস বলে উঠে 'এই কবিতা আমি আগেও শুনেছি' এবং হুবহু সে ঐ কবিতা আবৃত্তি শুরু করে।

চারণকে অধিকতর বেকায়দায় ফেলতে এবার ক্রীতদাসী এগিয়ে আসে, যেহেতু সে ইতোমধ্যেই কবিতাটা দু'বার শুনেছে সুতরাং সেও তা হুবহু আবৃত্তি করে যায়। কেউ আর পুরস্কার জিততে পারেনা। অবশেষে এক অখ্যাত চারণ এসে রাজকুমারের সামনে আবৃত্তির নামে বিরামহীনভাবে এমন দুর্বোধ্য চীৎকার শুরু করলো যা মনে রাখা অসম্ভব। আবৃত্তি শেষ হলে রাজকুমার ডানে বামে তার ক্রীত দাস-দাসীর দিকে তাকায় ,কিন্তু হতাশা-ব্যর্থতায় ওরা শোকে মুহ্যমান। 'মনে হচ্ছে আপনার কবিতাটা সত্যিই নুতোন' যুবরাজ চারণকে তার পাড়ুলিপিটা আনতে বললেন। চারণ বললো যুবরাজ 'আমি দরিদ্র মানুষ ,ছাগ চর্ম কেনার পয়সা নেই তাই এক পাথর খন্ডের উপর কবিতাটা লিখেছি। সেটা এখন বাইরে উটের পিঠে, দয়া করে আপনার চাকরদের বলুন সেটা বয়ে আনতে, আমার একার পক্ষে তা বয়ে আনা অসম্ভব'।

কবিতা মুখস্থ রাখার ব্যাপক চর্চার ফলে কোরাণ সংরক্ষণ ও পরে তা লিখিত রূপদানে বহুলাংশে সহায়ক হয়। সময়ের প্রয়োজনে কিংবা যখনই নবী (দঃ) বানী প্রাপ্ত হয়ে তা অনুসারীদের কাছে বলেছেন ওরা তাৎক্ষণিক তার প্রতিটি শব্দ মুখস্থ করেছে। তাদের এই সংগ্রহ খলিফা ওমরের শাসন কালের প্রথম পর্য্যায় পর্য্যন্ত একক পুস্ত কাকারে সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। মোহাম্মদ(স:)র মৃত্যুর ৪/৫ বছর পর ঐশী বানী রূপে, তার প্রতিটি বাক্য , শব্দ হোক তা খেজুর পাতা ,চামড়ার ঠুকরো, অংস ফলক, পাথর খন্ড কিংবা মানব হৃদয়ে লেখা--- সব একত্র করা হয়।

২

বহু দেব-দেবীর পৌত্তলিক আরবের ইয়েমেন এবং মদীনায় ইহুদীরা (বেশীর ভাগই আরব, ধর্মান্তরিত ইহুদী) ছিল,একই সাথে বিক্ষিপ্ত খ্রীশ্চান গোত্রসমূহ। মক্কার কোরাইশ বংশের হাশেম গোত্রে দাদার কর্তৃতে(যেহেতু পিতা বাল্যকালে মারা যান) প্রতিপালিত হতে থাকা কিশোর মোহাম্মদ (দঃ)র কাছে এই সুত্রেই আল্লাহ তথা এক ইশ্বরের ধারনা আসে। এও সম্ভব যে খাদিজার (বিত্তবতী বিধবা যাঁকে পরবতীতে তিনি বিয়ে করেন) ব্যাবসায়িক কারাভাঁ নিয়ে যখন তিনি দক্ষিণ সিরিয়া যান সেখানে প্রচলিত বাইজান্টাইন খ্রীস্টিয় আচার দেখে একেশ্বরবাদের প্রতি তার অনুরাগ ,বিশ্বাস বেড়ে থাকতে পারে। এবং কুমারী মেরীর প্রতি ক্রমবর্ধমান অসঙ্গত উপাসনা, ত্রিত্ববাদ (পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মা),ছবি, ব্যক্তিত্ব পুজা ইত্যাদি প্রধান আচার সমুহ মোহাম্মদে(দঃ)র কাছে পৌত্তলিকতা এবং বহু ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন প্রতীয়মান হয়ে থাকবে।

চল্লিশ বৎসর বয়সকাল পর্য্যন্ত আরবের নবী সম্মানের, অথচ উল্লেখযোগ্য কোন জীবন যাপন করছিলেননা । তারপরই ভাগ্য তাঁকে এক বিস্ময়কর অবস্থানে নিয়ে যায় যা প্রচার প্রসারে তিনি আত্মীয় বন্ধুদের মুখোমুখি হন । খুব শিগগিরই তিনি অনেককে ধর্মান্তরিত করেন। প্রথমদিকে তাঁর কাজে মক্কার বনেদী শাসক গোষ্ঠী তেমন আপত্তি করেনি,শুধু যখন নুতন ধর্মের কারণে মক্কায় পুন্যযাত্রা এবং এর বাসিন্দাদের লাভজনক অবস্থানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তখনই ক্বাবার অধিকর্তারা নবী (দঃ)এবং তার অনুসারীদের বিরূদ্ধাচারন শুরু করে। এই বিরূদ্ধাচারন যখন চরম মাত্রায়,খুনের পর্য্যায়ে পৌঁছায় তখন মদীনার আরবদের কাছ থেকে মোহাম্মদ(দঃ) সেখানে আশ্রয় এবং তাদের বিচারপতি ও আইন প্রণেতা হবার আমন্ত্রন পান। বিবদমান দু'দলের দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ মদীনাবাসী তখন একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীকে স্বাগত জানাতে আনন্দবোধ করছিল। নবী প্রথমে তার শ্বশুর এবং অতি কাছের মানুষ আবু বকর ছাড়া অন্য অনুসারীদের সেখানে পাঠিয়ে

তাঁর যাবার পথ প্রশস্থ করেন । সবশেষে ৬২২খ্রীস্টাব্দে আবু বকরকে নিয়ে একরাতে তিনি মক্কা ত্যাগ করেন। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয় কিন্তু দীর্ঘ ঘুরপথ, পাহাড়ে নিরাপদে লুকিয়ে থাকার কৌশলে যেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় আগে থেকেই সঞ্চয় করা হয়েছিল যাতে তারা নিরাপদে মদীনার গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হন। এভাবেই মানব ইতিহাসের বিখ্যাত মুসলিম বর্ষ হিজরি সনের সূচনা হয়, যার অর্থ অভিবাসন ।

পরবর্তী এগারো বছরে প্রচার, কূটনীতি, অথবা তরবারীর জোরে মক্কাসহ আরব উপদ্বীপের বিরাট অংশ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয় এবং নবী (স:))র ধর্মীয় অনুশাসনের আওতায় আসে । তাঁর নিজের লোকজন এবং পূর্বতন শত্রু মক্কাবাসীদের সাথে নবী(দঃ) একটা সমঝোতায় আসেন। তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহনের সুবাদে তিনি ক্বাবার পবিত্রতার স্বীকৃতি দেন, ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তিনি এমন এক অবস্থান নেন যাতে ইব্রাহিম (দঃ)যুক্ত, এবং তিনি মুসলিমদের প্রার্থনার সময় ,এযাবৎ চলে আসা জেরুযালেমের বদলে এদিকে মুখ ফেরাবার নির্দেশ দেন।

কোরাণের সাথে নবী(দ:)র নৈতিক শিক্ষা এবং কার্যকলাপ মুসলিমদের ধর্ম বিশ্বাস এবং সেমতে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বিধান দিয়েছে । ধর্ম বিশ্বাসটি সহজ সরল--কোন রকমের আপোষহীন একেশ্বরবাদ, ইহুদী-খ্রীশ্চান ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গঠিত কিন্তু মোহাম্মদ (দঃ)র দৃষ্টিতে পৌত্তলিকতা কিংবা বহু ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় যেমন খ্রীস্টের কিংবা পবিত্র ত্রিত্বের দেবত্ব সেরকম সবকিছুই পরিত্যাক্ত। খ্রীস্টকে গ্রহন করা হয়েছে শুধু নবী হিসেবে এবং কোরানের সর্বত্র তিনি 'মরিয়মের পুত্র ঈসা(দঃ)। তাঁর আবেগ, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা এই বিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়েছে যে মৃত্যুর আগেই তাঁকে সশরীরে স্বর্গে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, ক্রুশে তার মৃত্যু উপস্থিত দর্শকদের বিভ্রম মাত্র। পরকালে জাগতিক অবিচারের প্রতিকার হবে, পুনরুত্থান এবং শেষ বিচারের দিন থাকবে; মানুষ- যাকে ঈশ্বর ভাল-মন্দ বিচার শক্তি দিয়েছেন তাদের হিসেব নিকেশের জন্যে ডাকা হবে,পূর্বতন পছন্দের ভিত্তিতে তার প্রাপ্তি যোগ ঘটবে। ভাল তথা খাঁটি বিশ্বাসীদের জন্যে বেহেশতের আনন্দ আর দুস্টের জন্যে নরকের আগুন ।

মুসলিম হওয়ার জন্যে কাউকে 'আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ ব্যতিত কোন ইশ্বর নেই, এবং মোহাম্মদ(দঃ) আল্লাহর রসুল' এই কথাগুলো উল্লেখ করে স্বাক্ষ্য দিতে হয়। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ নামে পরিচিতদের মধ্যে এটা প্রথম স্তম্ভ। বাকী চারটির মধ্যে আছে বিশ্বাসীদের জন্যে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের বিধি বিধানের নির্দেশনা। দৈণিক পাঁচবার প্রার্থনা, বাৎসরীক রমজান মাসে রোজা- সুর্যোদয় থেকে সুর্যাস্ত পয্যন্ত পানাহার এবং যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকা, সামর্থ্য থাকা সাপেক্ষে জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কায় হজ্বব্রত পালন , দরিদ্রকে ভিক্ষা দেয়া। এসব সম্পুর্ন ধর্মীয় দায় দায়ীত্বের সাথে আরো রইল রসুল(দ:)র শিক্ষা এবং উদাহরণ থেকে সৃষ্ট ইসলামী আইন শরীয়াহ যা সামাজিক ও ধর্মীয় , দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি-বিধান দেয়ার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি বিষয়কে নিয়ন্ত্রণের দাবী করে। এর মুল পাওয়া যায় মদীনায় বিচারক হিসেবে মোহাম্মদ(দ:)র প্রদত্ত রায়ে-যা কখনও তার ব্যাক্তিগত সিদ্ধান্ত ,কখনওবা শহরের আরব ইহুদী প্রচলিত বিধিকে অনুসরন করেছে। এই সিদ্ধান্ত সমুহ হতে পারে তাৎক্ষণিক কিংবা কোরাণে বর্ণিত বিধি নিষেধের প্রয়োগ। এখানে শরীয়াহ আইনের কিছু উদাহরন দেয়া যেতে পারে বিশেষতঃ যাতে মুসার (দঃ)আইনের ছায়া পড়ে অথবা যাতে রয়েছে আরব সমাজের সুদুর প্রসারী উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক ,শিল্পকলার উপর প্রভাব। শুকরের মাংস ভক্ষন নিষিদ্ধ, মদ-জুয়া নিষিদ্ধ,চুরির দায়ে হাত কাটার বিধান, যে কোন হারে সুদে টাকা খাটানো নিষিদ্ধ,যাতে মুর্তি পুজার উন্মেষ না ঘটতে পারে তার জন্যে জীব-জন্তু, প্রাণীর ছবি অঙ্কন নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

দেশ বিজয়ে আরবদের নিজেদের উপদ্বীপ থেকে বেরোনর পর বিশেষতঃ পুর্বতন বাইজান্টাইন কিংবা পারস্যভুমিতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর মুসলিম সমাজে সার্বজনীন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন হিসেবে

অপরিবর্তনীয় শরীয়াহ আইন প্রয়োগ ক্রমান্বয়ে অসম্ভব হয়ে উঠে। নানাদিক থেকে উন্নত নুতোন সমাজের জনগোষ্ঠী নিজেদের পুরোন আইন কানুন প্রথা সমৃদ্ধ; ইসলাম ধর্ম গ্রহন সত্বেও তাদের অনেকে তা ছাড়তে রাজী নয় । মুসলিম শাসকগন দেখলেন যে নুতন বিজিত দেশের পরিবেশে শরীয়াহ আইন পর্যাপ্ত কিংবা যথার্থ নয়। এই মত দানা বাধতে শুরু করলো যে শরীয়া আইনে এমন এক আদর্শ বিবৃত,সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি সমুহ যার পরিপুর্ন পবিত্র রূপ অনুধাবন অসম্ভব করে তোলে। পরবর্তীতে অটোমন সাম্রাজ্যে এবং আজকের আরব রাষ্ট্র সমুহে (সৌদী আরব ও ইয়েমেন বাদে) মুলতঃ বিয়ে , তালাক এবং উত্তরাধিকারের বিষয় বাদে দেওয়ানী ,ফৌজদারী বিধান হিসেবে শরীয়াহ আইনের বদলে একরকম সেক্যুলার আইন ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

এভাবে মোহাম্মদ(দ:)'র আইনের কতিপয় সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, এবং নানামুখী সামাজিক ক্ষতিকর পরিণতির সূচনা হয়। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ইহুদী , খ্রীশ্চান সম্প্রদায় সমুহের মত ইসলামের আগে আরবরা বল্গাহীন বহুগামীতায় অভ্যস্থ ছিল , সুতরাং কোন সময়ে প্রত্যেক পুরুষকে সর্বোচ্চ চার স্ত্রী গ্রহনের অনুমতি দিয়ে নবী (দঃ)সে ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে এবং সীমাবদ্ধতায় আনলেন । অধিকন্তু তিনি এটাকে এভাবে শর্তযুক্ত করলেন যে স্বামীকে স্ত্রীদের সাথে আচরনে সমতা বিধান করতে হবে , পাদটীকা দিলেন "এবং এটা তোমরা করতে পারনা" ---আজকের প্রগতিশীল মুসলিমদের ব্যাখ্যায় প্রকৃত পক্ষে এর ভেতর দিয়ে মোহাম্মদ (দ:) বহুগামীতার বিরুদ্ধেই বলেছেন। সে যাই হোক মুসলিমরা আইনের পরবর্তী অংশের দুর্ভাবনা ছাড়াই অনুমতি সংক্রান্ত অংশ গ্রহন করেছে। আবার পুরুষের জন্যে তালাকও এত সহজ যে (শুধু ইচ্ছে প্রকাশ ও কিছু টাকা দেবার ক্ষমতা থাকলেই চলে)একই সময়ে চার বিয়ে না করতে পারলেও,আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে পর্য্যায়ক্রমে যত খুশী বিয়ে করা যায়।

এভাবেই রসুলের নাতি আল হাসান মাত্র ৪১ বছরের জীবনে শ'খানেক বিয়ে এবং তালাকে সমর্থ হয়। বৈধ বিয়ের পাশাপাশি যত খুশী সংখ্যক রক্ষিতাও রাখা যেত। আরব মুসলিমরা এই বৈধ স্বেচ্ছাচারীতার পুর্ন সদ্ব্যাবহার করলো উপদ্বীপের বাইরে সাম্যাজ্য জয় করতে গিয়ে। যখন যুদ্ধে হাজার হাজার নারী বন্দীকে বিজয়ীদের মধ্যে গণিমতের অংশ হিসেবে ভাগ করে দেয়া হল। এই পরিবেশে ইউরোপীয় সভ্যতার দু'টি অত্যন্ত গঠনমুলক উপাদান ---স্বামী-স্ত্রীর সমান অংশীদারীত্বে (যাতে নারী পুরুষের জন্যে ঘরের দায়ীত্ব নেয়) পরিবারের গড়ে উঠা ,এবং নারী-পুরুষের মানবিক মেলামেশায় সমন্বিত সামাজিক জীবন মুসলিম সমাজ থেকে বাদ পড়ে। গড়ে উঠে হারেম;নারীর পরিপুর্ন এবং সক্রিয় ভূমিকায় সমৃদ্ধ সমন্বিত সমাজ জীবনের বদলে (বহুগামীতা স্বত্বেও প্রাক ইসলামী যুগে আরবে যা ছিল) লিঙ্গ ভেদ, নারীদের জন্যে অসম্মানের জায়গা-- যে পরিস্থিতি থেকে বর্তমান শতকের আগ পর্য্যন্ত তারা উঠে দাঁড়াতে পারেনি।

ইসলাম এবং নবীর সমর্থনে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি পাইকারী ভাবে লিঙ্গভেদ কিংবা নারীদের পর্দার আদেশ দেননি। তিনি তাঁর স্ত্রীদের আলাদা করেছিলেন এবং তাও পরিস্কার ভাবে নবী(দঃ)'র স্ত্রীর বিশেষ মর্য্যাদার কারনে, তা উদাহরন হিসেবে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিলনা । তাঁর উদাহরন অনুসৃত হল বিশেষতঃ রক্ষিতা বৃদ্ধি এবং হারেম সাজানো বিজয়ের যোগাযোগে। তারপরেও সত্যের খাতিরে বলতেই হয় কতিপয় ক্ষেত্রে মুসলিম বিবাহিতা নারীর মর্য্যাদা,অনেক অনেক বছর পর অতি সাম্প্রতিক আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে মর্য্যাদা পাওয়া ইংরেজ রমনীদের চাইতে সবসময় উন্নত ছিল। মুসলিম স্ত্রী শুরু থেকেই নিজের অধিকারে নির্দিষ্ট পরিমান সম্পদের মালিকানার অধিকারী । স্বামীর মৃত্যুতে সম্পদের নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারও তার নিশ্চিত । প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে শরীয়া আইন মৃতের পরিবারের প্রত্যেককেই আমলে নিয়েছে। নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার শুধু স্ত্রী , ছেলে-মেয়েদের জন্যেই (কন্যার দ্বিগুন অংশ পুত্র পায়) নয় বরং পিতা

মাতার জন্যেও অংশ আছে । এই বিধানের মানবিক বিচার অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। পাশাপাশি উত্তরাধিকার আইনের ফলে ভূমির ক্রম বিভাজন মারাত্মক আর্থ -সামাজিক বিপদেরও জন্ম দিয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে মানুষ কিংবা প্রানীর প্রতিকৃতি তৈরীতে নিষেধাজ্ঞা আরব নন্দন শিল্প-রুচি বিকাশকে যে বাধাগ্রস্থ করেছে স্থাপত্য এবং বিমুর্ত সাজ সজ্জার রীতিতে এর বিশেষ ছায়া পড়ে । এই বিধি নিষেধও শুরু থেকেই প্রায়শঃই অগ্রাহ্য করা হয়েছে মোঘল এবং পারসী চিত্রকলা তার প্রমাণ। আজকের আরব এবং মুসলিম দেশ সমূহে তা পুরোপুরি লোপ পেয়েছে , এমনকি রাজা ইবনে সউদও (যিনি শুদ্ধাচারী ওহাবী গোত্রভুক্ত এবং এই গোত্র তাত্বিক ইসলামের আদি শুদ্ধরূপ ধরে রাখায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) নিজের ছবি তুলতে অনুমতি দিয়েছেন। মৌলিক শরীয়াহ আইনের প্রতি এই শৈথিল্যের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, যেখানে পৌত্তলিক ধ্যান-ধারনাবিদ্যমান সেখানেই শুধু নবী(দঃ)র নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য । অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাবসা বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে সুদে টাকা ধার দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর সহজ ব্যাখ্যা বিদ্যমান। এই ব্যাখ্যায় ধার দেওয়া অর্থে ব্যাবসা আরো লাভজনক তথা উপার্জন হলে তাতে সুদ দাবী করা যায়। তা সত্বেও নবীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন এমন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমের সাক্ষাৎ আজও মিলে । মিশর সিরিয়ায় কখনও কখনও এমন ধনকুবেরের সাক্ষাৎ মিলে যিনি তার বিশাল অংকের মেয়াদী আমানতের সুদ নিতে অস্বীকার করছেন। এই সেদিনও মিশরের ন্যাশনাল ব্যাংক তেমনি এক ব্যাংকারের পাওনা বিশাল অংকের সুদ ছেড়ে দেয়া বাবদ ধন্যবাদ জ্ঞাপনে তার সম্মানে বাৎসরিক চা-চক্রের আয়োজন করে তাকে রুপোর রেকাবীতে করে কিছু পাউন্ড প্রতিকী উপহার দিতেন ।

৩

হিজরী একাদশ বর্ষে মৃত্যুকালীন সময়ে নবী (দঃ)যেমন এক পার্থিব সাম্রাজ্যের সম্রাট তেমনি এক নুতন ধর্মের প্রতিষ্টাতা। এই ধর্মের কর্তৃত্বশালী কোন কেন্দ্র কিংবা যাজক নেই। এর একটি মাত্র ভিত্তি , অনুসারীদের জন্যে প্রতিশ্রুত বেহেশতের একমাত্র চাবিকাঠি ---কোরাণ। এটা ছিল সহজ এবং ব্যাবহারিক ধর্ম,অনুসারীদের সামনে অসাধ্য সাধনব্রত ছিলনা, এবং সামান্য শিক্ষায় বুঝে নেবার ধারন ক্ষমতাও তাদের ছিল। মোহাম্মদ(দঃ)র নবুয়ত মিশন পুরোপুরি ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং তাঁর জীবনাবসানের সাথে সাথে তা সম্পন্ন হওয়ার কথা, এবং একই সাথে কোরাণেরও পরিপুর্নতা। অতএব তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার মনোনয়নের প্রশ্ন কখনও উঠেনি। কিন্তু তাঁর অর্জিত বিশাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন অন্যরকম। আরবরা মুসলিম পরিচয়ে মুহম্মদে(দঃ)র শাসনাধীনে জাতীবদ্ধ হলো (যদিও বন্ধনটা অনিশ্চিত) এবং তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্যই নুতোন শাসকের প্রয়োজন। তাঁর কোন পুরুষ উত্তরাধিকার ছিলনা, ছেলে সন্তানেরা শৈশবেই মারা যায়, কন্যা সন্তানদের মধ্যে শুধু আলীর স্ত্রী ফাতেমা যিনি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠদের একজন এবং প্রথমদিকের ধর্মান্তরিত মুসলিম; নবী(দ:)র অন্তিম সময়েও বেঁচেছিলেন।

সে যাই হোক আরবে রাজতন্ত্র তথা উত্তরাধিকার সুত্রে নেতৃত্বেরও প্রচলন ছিলনা, কোন গোত্রের শেখ মারা গেলে বয়োঃজেষ্ঠদের মধ্যে থেকে যোগ্য কাউকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হতো। নবী(দঃ)র কাছ থেকে আশা করা যেতে পারতো তিনি তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের কাউকে নির্বাচিত করার বিষয়ে লোকজনদের পরামর্শ দেবেন কিন্তু তিনি তা করেননি । তবে যখন তিনি নিয়মিত প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেবার মত সুস্থ ছিলেননা তখন শ্বশুর আবু বকরকে ইমামতি করতে ডেকেছিলেন; এভাবে আবু বকর (খানিক ইতস্তঃতার পর, যখন মদীনার লোকজন তাদের মধ্য থেকে একজনকে মোহাম্মদ (দঃ)র স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করেছেন) প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন,আরবীতে যার অর্থ উত্তরাধিকারী। পরবর্তীতে "বিশ্বাসীদের সেনাপতি " হিসেবে খলিফাদের যে পরিচিতি তাতেই তাঁদের দায়ীত্বের আবশ্যকীয় পার্থিব চরিত্র বুঝা যায়। খলিফারা শাসক ছিলেন, ধর্মগুরু নন,যদিও

মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে তারা ইসলামের আধ্যাত্মিক নেতাও বটে । বয়োবৃদ্ধ আবুবকর দুর্জয় মনোবলের সাথে বিশ্বাসের সাধু সুলভ পবিত্রতার মিল ঘটিয়েছিলেন। তাঁর অনমনীয় সিদ্ধান্ত , ঝুঁকিপুর্ন বড় পদক্ষেপ নেবার সাহসের ফলেই মোহাম্মদ (দঃ)র মৃত্যুর প্রথম ধাক্কাটা ইসলাম কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়, ভিত্তিমুল ধ্বসিয়ে দেবার মত চরম বিপজ্জনক মুহূর্ত কাটিয়ে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপদ্বীপের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।

প্রথমতঃ বাস্তবতা ছিল মোহাম্মদের (দঃ)মৃত্যু। যদিও নবী(দ:) কখনও অতি মানবীয় গুনাবলীর দাবী করেননি এবং সবসময় মরণশীল মাটির মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়ের উপর জোর দিয়েছেন তবুও তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অনুসারীরা তা সবিস্ময়ে অবিশ্বাস করেছে। ওমর নুতোন ধর্মের এক শক্ত স্তম্ভ (পরবর্তীতে যিনি আবুবকরের পর খলিফা হন) তিনিও তাঁর গুরুর মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেননি বরং মরদেহ দেখে বলছিলেন মুর্চ্ছা গেছেন মাত্র । তখনই সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে আবু বকর বলেন "মোহাম্মদের (দঃ)পূজারী যদি কেউ থাকে তবে তাকে জানিয়ে দাও মোহাম্মদ(দঃ) এখন মৃত, ঈশ্বরের পূজারী কে জানিয়ে দাও ইশ্বর বেঁচে আছেন এবং তিনি মরেন না"। মোহাম্মদ(দ:) কতৃক ধর্মান্তরিত , বিজিত অনেক বেদুইনদের কাছে বিশ্বাস হিসেবে ইসলাম তখনও দৃঢ় হয়নি, পক্ষান্তরে এর শৃঙ্খলাবোধ, আরোপিত দায় দায়িত্ব ছিল বেশ ভারী। নবী(দ:)র মৃত্যুর পর তাদের অস্থিরতা একটা সুযোগ পেয়ে যায়।

এই মৃত্যু তাদের চোখে তাঁর সাথে সম্পাদিত বোঝাপড়ার অবসান। সুতরাং এই অস্থিরমতি দুর্বল চিত্তের বিশ্বাসীদের মধ্যে পৌত্তলিকতা এবং গোষ্ঠীভেদ ছড়িয়ে পড়ে, মোহাম্মদ (দঃ)র সার্থকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর মৃত্যুর কিয়ৎকাল পুর্বে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী নবীর আবির্ভাব ঘটে এবং উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় তারা সমর্থকও পেতে থাকে । খলিফা হয়ে আবুবকরকে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। তা সত্বেও তাঁর প্রথম কাজ ছিল মৃত্যুর অব্যবহতি পুর্বে রেখে যাওয়া মুহম্মদ (দঃ)র নির্দেশ প্রতিপালন,যার ফলে বেশ কিছু নির্ভর যোগ্য মুসলিম যোদ্ধার সাহচর্য্য তিনি পাননি । তিন বছর পুর্বে সিরিয়ার সীমান্তে যুদ্ধে নবী(দ:)র ঘনিষ্ঠ সহচর যেয়াদের মৃত্যু সহ আরবরা প্রভুত ক্ষতিগ্রস্থ হয় । নবীর (দঃ)জীবনের শেষ দিনগুলোতে পুর্বতন যুদ্ধের বদলা নিতে যিয়াদের পুত্রের নেতৃত্বে পুনঃরায় সিরিয়ার সীমান্ত আক্রমনের নির্দেশ দেন, সেমতে সেনাদল তৈরীও হয় কিন্তু নবী (দঃ)মৃত্যু বরন করেন।

ধর্মের উপর চারিদিকে বিপদ দেখে অনেকেই আবুবকরকে এ অভিযান বাতিল করতে পরামর্শ দেয় কিন্তু বৃদ্ধ আবুবকর নবী (দ:)র রেখে যাওয়া নির্দেশ পুনঃবিবেচনা করতে রাজী হননি বরং বলেন "এই অভিযানে ধর্মত্যাগকারী , বিভেদকারীরা মুসলিম শক্তির পরিচয় পাবে"। অতএব অভিযান এগিয়ে যায় । যদিও এটা গিবন উল্লেখিত ছোট হামলা (রেইড)মাত্র, তথাপি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দুয়ারে মুসলিম আরবদের দ্বিতীয় ধাক্কা হিসেবে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং এর পরে ছিল আরও গুরুত্বপুর্ন বিষয়ের আভাস। নিজ ডেরায় আবুবকর প্রতিদ্বন্দ্বী নবী এবং স্বধর্মত্যাগীদের আক্রমন করলেন প্রচন্ডভাবে। তাঁর হাতে ছিল আল্লাহর তরবারী -- খালেদ বিন ওয়ালিদ বিখ্যাত বিজয়ী সেনাপতি,দ্রুত এবং নিশ্চিত বিজয়ী আঘাত হানার সুবাদে যিনি ওই নামে খ্যাত। নুতন নবুয়তের দাবীদারেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল,স্বধর্মত্যাগকারীরা মার খেয়ে ফিরে এল এবং দ্বিধাগ্রস্থরা বিশ্বাসীদের সাথে থাকলো। এভাবে দ্বিতীয় সঙ্কট কাটলো।

নবী (দ:)র মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই মুসলিমরা আরব উপদ্বীপে চুড়ান্ত এবং সুদৃঢ ভাবে বিজয়ী হল , এবং তাদের সামনে জয়ের অপেক্ষায় পুরো পৃথিবী। ইসলামের এই দ্রুত সেরে উঠা এবং পরবর্তীতে এর প্রচন্ড প্রভাবের ব্যাখ্যায় এটুকু বলা যায় যে, আরবদের জাতীয় পুনরুত্থান এবং সম্প্রসারনের বিদ্যমান শক্তিকে

মেহাম্মদ(দঃ) নুতন যাত্রাপথে গতিশীল করতে যতটা নুতন আন্দোলনের জন্ম দেননি , তাঁর উত্থান পর্বে সেখানে বিদ্যমান অসংখ্য দেব-দেবীত্ববাদ,আদিম পাশবিকতার স্থলে উচ্চতর ধর্মীয় আদর্শের প্রেরনায় আরবদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান তারচেয়েও বেশী ভূমিকা রেখেছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে অর্থনৈতিক চাপে আরব উপদ্বীপ থেকে একের পর এক সেমেটিক অভিযান পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছে। হিব্রুরা বেরিয়েছে , কেনানীয়রা বেরিয়েছে, ফিনিশিয়রা এবং এভাবে মরুভূমি আর আরবের সীমান্তে কৃষিভূমির মাঝে আরব গোত্র গুলো প্রতিষ্ঠা করেছে পালমিরা, পেট্রা রাজ্য,গাসসান এবং হেরা পরবর্তীতে যা সীমান্তরাজ্য হিসেবে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় । নবী মোহাম্মদ(দঃ)র মৃত্যুর পর আরবদের পারস্য , এবং বাইজান্টাইন সাম্যাজ্য আক্রমন তাও মুলতঃ নিজ ভুমিতে সম্পদের তুলনায় বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার ফলে অনেক বর্হিমুখী অভিযানের অন্যতম। ইসলাম তাতে আপাতঃ উপলক্ষ্য যোগ করেছে একই সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সমাধা করার একটা নুতন শক্তিশালী হাতিয়ার: একতাবোধ এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের অনুভূতি এবং আত্মবিশ্বাস এসবের সাথে এবং বেদুইনদের পুরাতন যুদ্ধ ও লুঠতরাজ প্রিয়তার উপর যোগ করেছে অতিন্দ্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব। পৌত্তলিক আগ্রাসীরা জাগতিক লোভে জীবনের ঝুঁকি নিতে অভ্যস্থ ছিল, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়লে বিশ্বাসীর জন্যে অপেক্ষমান থাকছে স্বর্গ । কোন ঝুঁকি নেই, শুধু জেতার আছে বড় কিংবা ছোট পুরস্কার।

আগ্রাসনে আরব জাতির সম্প্রসারন ঘটেছে ইসলামের নয়- এরকম যুক্তির সমর্থনে বলা হয়ে থাকে যে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, আমর ইবনে আস প্রমুখ বিজয়ী বীর সেনাপতিরা প্রথমতঃ এবং চুড়ান্ত বিচারে জাগতিক যোদ্ধা ছিলেন ,যাদের বিশ্বাস ছিল কিছুটা সাধারণ মানের(ফর্মাল) ও সুযোগ সন্ধানী চরিত্রের, এবং প্রথমদিকের অভিযান সমুহে খুব কম সংখ্যক জানবাজিরাখা বিশ্বাসীরা অংশ নেন। অধিকাংশ অভিযান খলিফাদের পরিকল্পনা প্রসুত ছিলনা কিংবা সুচিন্তিত পলিসি বাস্তবায়নে পরিচালিত হয়নি। প্রকৃত প্রস্তাবে এসবের পেছনে খুব সামান্যই পরিকল্পনা ছিল। খালেদ বিজিত এবং বশীভূত গোত্র থেকে এসব বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালিত হয়েছিল। এমনও নয় যে এরা নিজেদের উপদ্বীপ জয় শেষে উত্তর সীমান্তের দিকে বিশ্ব বিজয়ে গেছে,বরং বিদেশে যুদ্ধের আকর্ষনে একতাবদ্ধ হওয়ার উপাদান ছাড়া পুরো উপদ্বীপ ইসলামের জন্যে চিরতরে জয় করা সম্ভব ছিলনা। ক্রমাগত একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমনের পরিবর্তে আরব গোত্র সমুহ সংঘবদ্ধ শক্তিহিসেবে উপদ্বীপের বাইরের খোলা পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই খোলা পৃথিবীর পূর্বদিকে সাসানীয় সাম্রাজ্য এবং পশ্চিমে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য- রাজধানী কন্সটান্টিনোপল । উভয় সাম্রাজ্যই মারাত্মক আভ্যান্তরীন দুর্বলতায় জীর্ন এবং তিন শতাব্দী ব্যাপী পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে ক্লান্ত।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সংস্কৃতিতে গ্রীক, ধর্মে খ্রীশ্চান। কিন্তু পঞ্চম শতকে সিরিয়া,মিশরে বিকশিত ফিতনা-ফ্যাসাদ (কন্সটান্টিনোপলে গ্রীক অর্থডক্স শক্তি কর্তৃক পরিচালিত) সিরিয়ার আরামিক এবং মিশরের 'কপ্ট' জনসাধারনকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে চরম বিষিয়ে তোলে। এর সাথে যুক্ত হয় উভয় প্রদেশে উচ্চ হারে করারোপের বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

মৌলবাদী কিংবা সংস্কারপন্থী নির্বিশেষে খ্রীশ্চানিটিরও আগের সে প্রাণশক্তি ছিলনা। দলাদলি, সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম তাত্বিক মতান্তর, এবং প্রতিকৃতি পুজার ফলে এর আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি অনেকটাই হ্রাসপ্রাপ্ত। পারস্যেও(যার রাজধর্ম জুরুস্ত্রীয়)দলাদলি. ধর্মীয় মতান্তর ছিল। এই স্বৈরাচারী সামরিকশক্তি শাসিত সাম্রাজ্য এবং তার ক্ষয়িষ্ণু

সামন্তবাদী কাঠামো আরব আক্রমনের প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে ভেঙ্গে পড়ার অপেক্ষায়। দক্ষিণ ইরাকে কঠোর করভারে জর্জরিত পারস্যের এক অক্ষত 'সেমেটিক' প্রদেশেরও একই অবস্থা। একইভাবে দক্ষিণ সিরিয়ায় বাইজান্টাইন আরব সামন্ত অধিপতিরাও বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছ থেকে পেয়ে আসা ভর্তুকি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট। এই হচ্ছে দুই শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরবদের বিস্ময়কর সাফল্যের কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ। তারপরেও ইতিহাসের অনেক বড় বড় ঘটনার মত--- প্রতিষ্ঠিত সরকার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী, সপ্তম শতকের পৃথিবীর দুই মূল শক্তিধর দেয়াল ঘেরা নগরের বিরুদ্ধে আদিম মরুচারী দলের সাফল্যে এমন কিছু আছে যা যুক্তিকে হার মানায়।

বিজয়ের সহায়ক হিসেবে আরবদের মধ্যে বিদ্যমান তিনটি প্রধান উপাদানঃ

১-নুতন বিশ্বাসে উজ্জীবিত নুতন জাতির উঁচু মনোবল । বিশেষতঃ কতিপয় প্রাথমিক বিজয়ের পর তারা জানতো ডেভিড হয়ে তারা নিশ্চিত পরাজয়ের 'গোলাইয়েত' এর মুখোমুখি হচ্ছে।
২-তাদের দুই কুশলী , পরাক্রমশালী সেনাপতি খালেদ ও আমর এর সিরিয়া, ইরাক ও মিশর অভিযান নেপোলিয়ন কিংবা আলেকজান্ডারের সফল সেনা অভিযান সমুহের সমতুল্য।

৩-দিক চি হ্নহীন মরুভূমি পাড়ি দিয়ে শত্রুকে আক্রমন করার মত পরিবেশের সাথে মানান সই চমৎকার যুদ্ধকৌশল ও পরিকল্পনা । তাদের কৌশলের মধ্যে ছিল অশ্বারোহী বাহিনীর চমৎকার ব্যাবহার যা রোমান,বাইজান্টাইনরা কখনও শেখেনি। তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনায় উট গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করেছে,অধিক দুরত্বে তুলনামূলক কম সময়ে সেনা পরিবহনে সক্ষমতার কারনে তারা সম্পুর্ন অপ্রত্যাশিতভাবে ঝটিকা আক্রমনের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারতো। যেমনটা খালেদের ক্ষেত্রে হয়েছে; দামেস্ক আক্রমনে আরবদের সাহায্যের আবেদনে তিনি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ইরাক পাড়ি দিয়ে প্রয়োজনীয় নুতন সেনাসরবরাহ নিয়ে শহরের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। অধ্যাপক বার্নার্ড লুইস আরবদের মরুভূমি ব্যাবহারকে বৃটিশদের সমুদ্র ব্যবহারের সাথে তুলনা করেছেন। মরুর সন্তান হিসেবে আরবরা মরুভূমির নাড়ি নক্ষত্র চেনে যেমনটা তাদের শত্রুপক্ষ চেনেনা। হঠাৎ আক্রমন করে তারা যেন মরুতেই মিশে যায়,শত্রু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে পেরে উঠেনা। বিজিত দেশ সমুহে তারা শক্তি সংহত করতো মুলতঃ মরু সংলগ্ন সামরিক কৌশলগত শহরে--বৃটিশ ইতিহাসে যেমন জিব্রাল্টার, মাল্টা, সিংগাপুর।

সিরিয়া এবং ইরাকে প্রচুর ধন সম্পদ পাওয়া যাবে এ রকম সংবাদে খুব দ্রুত, উপদ্বীপ থেকে অভিবাসীর দল বেশ উদ্দীপনা পায়। এখানে ছিল পুরোন সভ্যতার উৎকর্ষ , বিলাসীতার যাবতীয় উপকরণ। বিজয় এবং লুঠের জীবনে কৃপণ বেদুইনরা এর বেশী স্বপ্ন দেখেনি। প্রতি যুদ্ধের শেষে নারী, অর্থ, সোনা-দানা, ঝাঁকালো কাপড়-চোপড়, রেশমখন্ড যা বিজয়ীদের মধ্যে ভাগ হয় শুধু পঞ্চমটা পাঠাতে হয় মদীনায় খলিফার কাছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে এসব খবর ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে যোদ্ধারা বিশ্বাসীদের সাথে যোগ দিতে ছুটে, নারী -শিশুসহ পুরো গোত্র উপদ্বীপ ছাড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই এদের সংখ্যা খুবই অনুমান নির্ভর, তবুও ধারনা করা হয় নবী(দ:)র মৃত্যুর বারো বছরের মধ্যে এ সংখ্যা অর্ধ মিলিয়নে পৌঁছে, এবং তা দ্বিগুন, তিনগুন হতেও সময় লাগেনি।

উপদ্বীপের বাইরে বড় বিজয়ের ধারা শুরু হয় আবু বকরের সংক্ষিপ্ত শাসনকালে (৬৩২-৪) তবে তা চরমে পৌঁছে উমরের দশ বছরের খিলাফতকালে। পারস্যের খসরু, বাইজান্টাইনের কাইজার, বিশ্বাসীদের সেনাপতিদের হাতে পরাস্ত হয়। পারস্য সাম্রাজ্য পুরোপুরি ধ্বংস হয়, এর সাথে করদ রাজ্য সহ ইরাক

আরবদের দখলে আসে। কন্সটান্টিনোপল, আনাতোলিয়ায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কোনমতে ঠিকে থাকে তবে সিরিয়া এবং মিশর (খ্রীশ্চান অধিবাসীরা দেখল যে ,গ্রীকদের চেয়ে মুসলিমরা অধিকতর সহনীয়) হস্তচ্যুত হয়। দামেস্ক, জেরুযালেম, আলেকজান্দ্রিয়ার মত প্রাচীন শহর সমুহ মরুর বীরদের দখলে চলে যায়। যে খলিফার সেনাবাহিনী এ' অসাধ্য সাধন করেন তিনি ওমর ইবন আল খাত্তাব, আরব অথবা মুসলিম ইতিহাসে অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব। তার শাসন আমলে খেলাফত জাগতিক রাজ্য জয়ের পাশাপাশি মহান, সুশৃঙ্খল,বিশ্বস্বীকৃত ধর্মরাজ হিসেবে আধ্যাত্মিক শিখর বিন্দুতেও পৌঁছে। তার উত্তর সুরী ওসমান ততটা উল্লেখযোগ্য নন, এবং চতুর্থ খলিফা আলী (নবীর জামাতা)র সময়ে শুরু হওয়া বিভেদ এ যাবৎ ইসলামকে দ্বিখন্ডিত করে রেখেছে। উমাইয়াদের নেতৃত্বে খেলাফত পুরোপুরি সেক্যুলার রাজতন্ত্র।

সমসাময়িক পৃথিবীর দু'জন শ্রেষ্ঠ বীরের বিরুদ্ধে বিজয়ের পরেও উমর তাঁর প্রাথমিক জীবনের সাধাসিধা জীবন যাপন ধরে রাখেন। যখন তিনি জেরুযালেমের দখল বুঝে নিতে আসেন গায়ে মোটা কাপড়ের জামা, বাহন বলতে একটি উট,সঙ্গী একজন ভৃত্য। তাকে গ্রহন করতে, ইতোমধ্যে বিজিত আড়ম্বরে আচ্ছন্ন, রেশম বস্ত্রের জৌলুসে আচ্ছাদিত আরব সেনাপতিরা সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়েছিলেন । কথিত আছে যে, জাগতিক ভোগবিলাসের এ প্রদর্শনীতে উমর এতটাই রেগেছিলেন যে তিনি তার সম্মুখের মুল্যবান বস্ত্রখন্ডের উপর মুঠো বালি নিক্ষেপ করেছিলেন। এমনও কথিত আছে যে শহরের প্রধান পুরোহিত যখন তাকে 'পবিত্র সমাধি গীর্জায় ' নামাজ পড়তে আহ্বান করেন তিনি এই যুক্তিতে তা অগ্রাহ্য করেন যে তাতে ভবিষ্যতে মুসলিমরা খ্রীশ্চানদের গীর্জা থেকে বের করে দিয়ে তা মসজিদে রূপান্তরের অযুহাত পাবে।

মুসলিম প্রবাদ কথার প্রশংসায় এরকম অনেক দৃষ্টান্তের নায়ক উমরের সেরা কৃতিত্বটি তাঁর অনমনীয় বিচারবোধ প্রসঙ্গে । প্রশ্ন সাপেক্ষ যত অতিরঞ্জনের কথা মনে রেখেও মুহম্মদ(দঃ)র দ্বিতীয় উত্তরাধিকারীর মধ্যে একজন সুউচ্চ নৈতিক মানদন্ডের মানুষ একই সাথে মহান শাসককে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। উমরের শাসনামলে মুসলিম –আরবজাতির রাজ্যসীমা বৃদ্ধি মরুর জনগন ও তাদের ধর্মকে বিশ্ব শক্তিতে পরিণত করেছে। এই কৃতিত্বের পাশাপাশি দ্বিতীয় খলিফা বিশেষ দু'টি গুরুত্বপূর্ন কৃতিত্বের অধিকারী। আবুবকরের রাজত্বকালে এক যুদ্ধে বেশ কিছু হাফেজের মৃত্যু ঘটলে তিনি ই প্রথম অনুধাবন করেন যে, কোরাণকে লিখিত একটি পুস্তকাকারে সংহত করা দরকার। তাৎক্ষণিক ভাবে কাজ শুরু হয় এবং তা শেষ হয় উমরের আমলে। যদিও তার পরবর্তী খলিফার আমলে তা আবারও সুসংহত করা পুর্বক সরকারী ভাবে চুড়ান্ত ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি ধর্মীয় নয় বরং পুরোপুরি বৈষয়িক। কোরান লিপিবদ্ধ করার মত গুরুত্বপূর্ন না হলেও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক সময়ে আরব বিজেতাদের চরিত্র ও মর্য্যাদা নির্ধারণে এর গুরুত্ব ঐতিহাসিক। সেটা ছিল আরবদের নিবন্ধিকরন ও প্রত্যেককে (স্ব স্ব দাবীর বিপরীতে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের ভিত্তিতে) রাজকীয় কোষাগার ও যুদ্ধের গণিমত থেকে বাৎসরিক ভাতা বরাদ্দকরণ। এভাবে আরবরা ভর্তুকি প্রাপ্ত সেনা সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং এই অবস্থা বলবৎ থাকে যতদিন পর্য্যন্ত না সাম্রাজ্যের পুর্ন বিস্তার, গোত্র সংমিশ্রন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আরবদের আলেকজান্দ্রিয়া দখল নিয়ে পশ্চিমা দুনিয়ায় যে অপপ্রচার আছে তা স্বয়ং গিবনের সময়েই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। বিষয়টা ছিল খলিফার নির্দেশে আরব সেনাপতি আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্মুল্য লাইব্রেরীটা এই যুক্তিতে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন যে বই গুলো হয় কোরানের বক্তব্য সমর্থন করে অতএব নিস্প্রয়োজন অথবা

কোরানের বিরোধী অতএব ক্ষতিকর। আধুনিক গবেষনায় জানা যায় আরবদের মিশর জয়ের বহু পুর্বেই দুটি দুর্ঘটনা জনিত অগ্নিকান্ডে লাইব্রেরীটি ধ্বংস হয়েছে। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে যখন শহরে জুলিয়াস সিজার লড়াই করছিল । ইচ্ছাকৃতভাবে , কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে এই ধ্বংসলীলার দায় মুসলিম আরবদের উপর চাপিয়ে দেয়া ইসলামের প্রতি খ্রীশ্চানদের পক্ষপাত দুষ্ট, বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ।

বলা যেতে পারে ইসলাম ও আরব সাম্রাজ্যের মৌলিক ধর্মতন্ত্র শেষ হয়ে যায় যখন আলী (অর্থডক্স চার খলিফার সর্বশেষ) তার খিলাফত লাভের বিরুদ্ধাচারীদের দমন করতে মদীনা ছেড়ে ইরাক গমন করেন। এই যাত্রায় মদীনা চিরতরে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানীর গৌরব হারায় । যে শহরে নবী(দ:)আশ্রয় পেয়েছিলেন, তাঁর শাসনে যেখানে ইসলাম গোষ্ঠীরূপে বিকশিত হয়, এবং যেখান থেকে প্রথম বিজয়ী সেনাদল সমুহ পারস্য, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করে সেই মদীনায় পরবর্তীতে আর কোন খলিফা আসন নেননি। এর পর থেকে উপদ্বীপ ছেড়ে যাওয়া আরবশক্তি বিজিত সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি বিচারে রাজনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্বে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে যায়। ক্রমবিস্তৃত সাম্রাজ্যে মক্কা, মদীনার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে বটে কুফা, দামেস্ক, বাগদাদ, কর্ডোভা, তিউনিস, কায়রো শহরে গড়ে উঠে একের পর এক শাসন এবং সভ্যতার কেন্দ্র।

আলীর মদীনা ত্যাগ আরও একটি দুঃখজনক গুরুত্ব বহন করে । সেই প্রথমবার মুসলিমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করে। এই দ্বন্ধ থেকে সৃষ্ট মৌলিক বিভেদ আজও মুসলিম সমাজকে সুন্নী (এক অর্থে গোড়া অর্থডক্স) এবং শিয়া (বিদ্রোহী: যেমন আলীর) গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রেখেছে। সুন্নীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা তবে ইরাকে শিয়াদের পাল্লা ভারী, এবং অধিকাংশ আরবদেশেই তাদের উপস্থিতি রয়েছে। একাদশ শতকে এই সম্প্রদায়ই ফাতেমীয় বংশ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সরকার এবং প্রশাসনের মৌলিক কাঠামো বজায় রেখে তাতে আরব অভিবাসীদের শাসক শ্রেনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে , আরবদের খলিফা হিসেবে পুরোপুরি সম্রাট না হোক সাময়িক পার্থিব প্রভুর প্রতি সাধারণ আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে ,৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়ার নেতৃত্বে ,দামেস্কে প্রথম কেন্দ্র ভিত্তিক সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠিত হয়। খলিফা উমরের ফরমান বলে এযাবৎ আরবরা ভর্তুকি প্রাপ্ত, সামরিক অভিজাত হিসেবে প্রথম দিকে দুরত্ব রেখে বসবাস করতো ; বাণিজ্য, কৃষি অথবা হস্ত শিল্প থেকে নিজেরা বিরত ছিল। চারপাশের ইহুদী , খ্রীশ্চানদের উপর নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়া দুরে থাক , রাষ্ট্রীয় বৃত্তির সুবিধার্থে ওদের কাছ থেকে কর হিসেবে আদায় করা অর্থের প্রাচুর্য্য বজায় রাখতে মুসলিম সমাজ থেকে তাদের দুরে রাখতে পছন্দ করতো।

অমুসলিমদের চেয়ে কম হারে হলেও মুসলিমদের উপরেও কিছু কর ধার্য্য ছিল। এই বাস্তবতা এবং এর সাথে শাসক শ্রেণীর ধর্মভুক্ত হয়ে মর্য্যাদাবান হওয়ার লোভে,আরবদের পক্ষ থেকে ধর্মন্তকরনের কোন উদ্যোগ না থাকা স্বত্বেও ইহুদী ও খ্রীশ্চানদের মধ্যে ধর্মান্তরিত মুসলিম সংখ্যা বাড়তে থাকে। এর ফলে মারাত্মক আর্থিক বিপর্য্যয় দেখা দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই যেখানে বিপুল সংখ্যক আর্থিক ভর্তুকি প্রাপ্ত শাসক শ্রেণী থাকে সেখানে ওই অর্থের জোগান দাতা জনগোষ্ঠীর সংখ্যাকে একটা নির্দিষ্ট স্তরের নীচে নামতে দেয়া যায়না, অতএব রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড ধর্মান্তর নিরুৎসাহিত করলো। ভুমির খাজনাকেই বেছে নেয়া হল মুল হাতিয়ার হিসেবে, এতে বলাহয় ভূমির মালিকানার উপর নয় বরং ভূমির উপরই খাজনা ধার্য্য সুতরাং একটা নির্দিষ্ট তারিখের পর সকল ধর্মান্ত রীত মুসলিমের উপরই অমুসলিম হারে ভুমিকর বলবৎ রইল।

এভাবে দেখা যায় শুধু ইসলাম ধর্মে দীক্ষাই প্রথমতঃ অনারব মুসলিমদের সাথে আরবদের সমতা বিধান করেনি। অংশতঃ আন্তঃ গোত্র মিশ্রণের ফলে এবং ভাষার ক্ষেত্রে পুরোপুরি আরবীয়করনকৃত একটি গোষ্ঠীর উত্থানের মধ্য দিয়ে আরব-অনারব ব্যাবধান সুক্ষ হয়ে যেতে সময় লেগেছে আরও কিছুকাল। আরব বিজেতাদের বহুগামীতা এবং একাধিক রক্ষিতা রাখার যত সামাজিক কুফলই থাক, তা বিজিত ভূমিকে আরবীয়করনে বড় ভূমিকা রেখেছে। বিশেষতঃ ইসলাম যখন আরবদের ধর্মান্তর ছাড়াই ইহুদী, খ্রীশ্চান নারীদের বিয়ের অনুমতি দেয়, এবং মা'র ধর্ম মর্য্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই আরব পিতার সন্তানকে সমান মর্য্যাদা দেয়।

উমাইয়া শাসনামলে সিরিয়িায় বিখ্যাত আরব তথা মুসলিম সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়, যা পরবর্তী পাঁচশত বছর ধরে পত্র পুষ্পে বিকশিত হয়ে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা , স্পেনে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত আলো ছড়ায় এবং ত্রয়োদশ শতকের ইউরোপীয় জ্ঞানবাদে অবদান রাখে; এবং গ্রীক পন্ডিতদের অটোমন তুর্কীদের হাতে গ্রেফতার এড়াতে কন্সটান্টিনোপল ছেড়ে পশ্চিমে পলায়নেরও অনেক অনেক আগে রেনেসাঁর বীজ ছড়ায়।

এক্ষণে কোন বিচারে এই নানা উৎসের মিশ্র সভ্যতাকে সঠিকভাবে আরব অভিহিত করা যায় তার খোঁজ নেয়া যাক। মিশ্র বলতে অতি অবশ্যই তা ব্যাপক অর্থে, যেমন এর উপাদান তেমনি যারা এর সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে সেই কলাকুশলী তথা চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পীদের ধর্ম-বর্ণ-এবং ভৌগলিক পরিবেশ বিচারে।

বর্হিবিশ্বের বিজিত অধিকতর উন্নত তবে মুমুর্ষ অধিবাসীদের জন্যে উপদ্বীপ থেকে আরবরা দুটি মহৎ অবদান সাথে করে এনেছে; ইসলাম এবং আরবী ভাষা,সাথে মরুর বীরধর্ম শৌর্য্য-বীর্য্য, তার সাথে প্রবল বিজয়ী জাতির যোগ্য মানসিক উদ্দীপনা।

এই পৃথিবীতে ছিল গ্রীক দর্শন,আইন এবং সরকার বিষয়ে রোমান ধারাণা,বাইজান্টাইন এবং পারস্যের শিল্পকলা,খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ব এবং ইহুদী প্রথা পদ্ধতি। আরব সভ্যতা ছিল এসব কিছুরই ফসল। যেসব কৃতবিদ্য মনিষীরা এর রূপকার,সৃষ্টি করেছেন এসব পরম ধ্রুপদী নৈপুন্যের উদাহরন, তাদের অধিকাংশই অনারব বাইজান্টাইন সিরিয়, পারসী , ইহুদী এবং অন্যান্য গোত্রের। যারা এই সভ্যতার ঐক্যসূত্র ইসলামের মধ্যে খুঁজে পান ,একে আরব নয় বরং ইসলামী সভ্যতা বলতে চান তাদের উদ্দেশ্যে এটুকুই বলা যায়--- এর চরম উৎকর্ষের সময়ে (বাগদাদের আব্বাসীয় বংশের প্রারম্ভিক যুগে) খ্রীশ্চান, ইহুদীরা সৃষ্টিশীলতা এবং যোগাযোগের (গ্রীক এবং 'সিরিয়াক' থেকে অনুবাদের মাধ্যমে) প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপুর্ন অবদান রেখেছেন যা নুতন এক সার্বজনীন, বিশ্বসমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি তৈরী করেছে । এই খ্রীশ্চান , ইহুদীরা আরবীকে নিজেদের ভাষা করে নেন ,তাতে লেখেন এবং অনুবাদ করেন।

আরবী হয়ে উঠে নুতন সভ্যতার নুতন ভাষা, চিন্তার বাহন এবং আইন ও প্রশাসনের হাতিয়ার। সুতরাং একভাবে এই পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, এবং স্পেনের এই মধ্যযুগীয় সভ্যতাকে আরব বলা যায়। আরেক দিকে এটা ঘটেছে আরবদের বিজয়ের ফলে, আরব আনুকূল্যে, এবং আরবদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক,সামাজিক বাতাবরনে । এভাবে আরবরা নুতন সভ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং তার অগ্রগতির উপাদান সমূহ একত্রে সংহত করেছে। অবশ্যই পুরো আরব সাম্রাজ্যের জনগন (সামান্য খ্রীশ্চান,ইহুদীদের কথা বাদ দিলে) মুসলিম ছিল। ইসলামী চিন্তাধারা , আইন,ধর্ম, আধ্যাত্মবাদ তা যেখানেই প্রকাশিত হোক না

কেন তাদের চিন্তা-ভাবনার দিক নির্দেশ ,এবং জীবন গঠনে তা মৌলিক ভুমিকা রেখেছে। মনে রাখতেই হবে ইসলাম আরবদের কাছ থেকে এসেছে এবং আরব শক্তিতেই এগিয়েছে।

(৭)

৭৫০ খ্রীস্টাব্দে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে। তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় আব্বাসীয়রা (নবী(দ:)র চাচা আল আব্বাসের বংশধর), এবং আরব সাম্রাজ্যের কেন্দ্র পরিবর্তিত হয় সিরিয়া থেকে ইরাকে, দামেস্ক থেকে বাগদাদ; আরব্য উপন্যাসের বিখ্যাত নগরে যেখানে হারুন আল রশীদ তার দরবার বসান। বাগদাদ দামেস্কের মত নিজস্ব পুর্ব প্রতিষ্ঠিত জীবনধারা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কোন পুরাতন নগর নয়। আব্বাসীয়রা নিজে এক পুরোন গ্রামের স্থলে এটা তৈরী করে, এখানে জেগে উঠা জীবনধারা ও সংস্কৃতি পুরোটাই এর নিজস্ব যদিও এর উৎস এসেছে আরও প্রাচীনকালেব নানা যায়গা থেকে।

শাসক বংশ এবং রাজধানী বদলের ফলে আরবের ইতিহাসে কিছু গুরুত্বপুর্ন পরিবর্তন সাধিত হয় । পুর্বতন সময়ে মদীনা থেকে হযরত আলীর বেরিয়ে আসা এবং উমাইয়া বংশ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে যেমন মুসলিম ধর্মরাজের অবসান ঘটে তেমনি আব্বাসীয়দের ক্ষমতারোহনেও আরব সাম্রাজ্যে এক খলিফার নেতৃত্বে রাজনৈতিক একতাবদ্ধতা চিরতরে বিনষ্ট হয়। জবরদখলকারীদের হাতে আত্মীয়স্বজনদের গণহত্যা থেকে পালিয়ে উমাইয়াদের একজন স্পেনে যান (সেখানে ৭১১ খ্রীস্টাব্দ থেকে আরব শক্তির হাতে শাসন ক্ষমতা) এবং আলাদা এক রাজ্য গঠন করেন,বাগদাদের খলিফাকে অগ্রাহ্য করে তিনি নিজেই খলিফা উপাধি নেন। তখন থেকেই শুরু হয় আরব সাম্রাজ্যের খন্ড বিখন্ড হওয়া। অথচ তখনও পাশাপাশি সাম্রাজ্য জয় ও বিস্তার চলছিল । এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী শতাব্দী নাগাদ শাসক শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রচিত হয়। এভাবে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বংশের পর বংশ ,রাজধানীর পর রাজধানী পরিবর্তিত হতে থাকে যতদিন না অটোমন তুর্কিদের হাত ধরে বাইরে থেকে পুনর্বার ঐক্য চেপে বসে। ততদিনে স্পেন আরবদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

বাগদাদ কর্তৃক দামেস্ক পরাস্ত হওয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ন ফল হচ্ছে আরব জীবনে সমৃদ্ধ পারস্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রবাহ। দামেস্কে আরবদের উপর তাৎক্ষণিক এবং মুল প্রভাব ছিল বাইজান্টাইন । বাগদাদে এসে তাতে যুক্ত হলো পারস্যের এবং পারস্য হয়ে ভারতীয় প্রভাব। অন্ততঃ সমকালীন পরিবেশ, পরিস্থিতি, সামাজিক আদান প্রদান, এবং সে সময়ের চিন্তাবিদ, কলা-কুশলীদের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে এটাই ছিল বাস্তবতা। এখানে একই সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে আরব চিন্তা চেতনার ভেতরে এসময়ে পশ্চিমা প্রভাবের এক নুতন ও প্রচন্ড স্রোত পারস্য প্রভাবের সমান্তরালে বইতে শুরু করে। এই সমান্তরাল প্রভাব দৃশ্যমান হয় গুনী, দানশীল আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠপোষাকতায় গ্রীক দর্শণ, বিজ্ঞান এবং গণিত মুল গ্রীক কিংবা অনুদিত 'সিরিয়াক' থেকে আরবীতে অনুবাদের ভেতর দিয়ে।

এই বাগদাদেই স্থানীয় জনসাধারন থেকে আলাদাভাবে ভর্তুকি প্রাপ্ত শাসকশ্রেণী হিসেবে আরবদের সুবিধাভোগীতার অবসান ঘটে। অবশ্যই উমাইয়া শাসনে আরব কৌলিন্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবই আব্বাসীয়দের ক্ষমতাসীন করে। এর পেছনে শুধু ধর্মান্তরিত অনারব মুসলিমরাই নয় বরং উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের আরবরাও ছিল যারা উত্তরের আরবদের মত স্বীকৃত অভিজাত ছিলনা। বাগদাদে একই জনজীবনের এক মিশ্র শহুরে সমাজের উৎপত্তি হয়। খিলাফতের প্রকৃতি এবং তাতে নির্ভর সরকারেরও মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় । শাসক গোত্রের প্রতি নির্ভরশীলতার পরিবর্তে খলিফা এখানে অনেকটাই ব্যক্তিগত ভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার

অধিকারী। তিনি আড়ম্বর বেষ্টিত, সংস্কার মুক্ত এবং বেতনভুক্ত আমলা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পেশাদার সেনাদলের মাধ্যমে শাসন কার্য্য চালান।

যদিও আরবরা উমাইয়া যুগের আগেই ভারতে পৌঁছে কিন্তু রাজধানী বাগদাদে আসার ফলে–যা মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যরুটের সাথেই পড়ে, পুর্বদিকে তাদের বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা সহজতর হয়। এখানে মধ্য এশিয়ায় আরবরা প্রথমে তুর্কিদের সংস্পর্শে আসে, অদৃষ্ট যাদের সাথে তাদের কোন কোনভাবে পরবর্তীতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত জুড়ে রাখবে। আরবরা প্রথম সংস্পর্শে আসে সেলজুক গোত্রীয় তুর্কিদের। এরা সেই অটোমনদের চেয়ে ভিন্ন যারা শুধু পুরো আরব বিশ্ব (মরক্কো , এবং আরব উপদ্বিপের কিছু অংশ বাদে) নয় বরং এর সাথে আরবরা যা জয় করতে ব্যর্থ হয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সেই অংশ সমুহও জয় করে নেয়।

শেলজুকরা বাগদাদে আসে বিচ্ছিন্নভাবে , হয় যুদ্ধবন্দী নয়তো বাজার থেকে কেনা ক্রীতদাস হিসেবে। এইকারনে তারা পরবর্তী সময়ে মামলুক (অধিকৃত) নামে পরিচিত । এমনকি পরবর্তীতে সেনা গোত্র হিসেবে ক্ষমতা দখল করে বংশ পরম্পরায় কয়েক শতাব্দী মিশর শাসন করলেও তাদের সে পরিচয় অক্ষুন্ন থাকে। আরব প্রভূরা তাদের সেনা নৈপুন্যের কারনে সেনাবাহিনীতে ব্যবহার করে যেখানে তারা খুব শিগগিরই পদস্থ কর্মকর্তায় পরিনত হয়। ক্রমান্বয়ে সবংশে ইরাকে অভিবাসন করে ,বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফাকে নামমাত্র প্রধান রেখে সেলজুক শাসকরা সুলতান উপাধি গ্রহন পুর্বক পুর্বাঞ্চলীয় আরব দেশের শাসক হতে খুব দেরী করেনি। ইতিমধ্যে খ্রীস্টিয় দশম শতকে উত্তর আফ্রিকা এবং মিশরে শিয়া মতাবলম্বীদের দ্বারা (যারা আলীর স্ত্রী এবং নবীর কন্যা ও একমাত্র উত্তরাধিকার ফাতিমার নামে ফাতেমীয় নামে পরিচিত) তৃতীয় খিলাফতের আবির্ভাব আরব সাম্রাজ্যে আরও একপ্রস্থ ভাঙ্গান ধরায় ।

তাদের যুগ বিখ্যাত সালাদিন (সালাউদ্দিন আল আয়ুবী) এর শাসনের মাধ্যমে শেষ হয় । কুর্দিশ সেনা কর্মকর্তা সালাউদ্দিনের উত্থান দ্বাদশ শতকে, সেলজুক শাসনাধীন মসুলে। মিশরে তিনি খ্যাতির শিখরে পৌঁছেন এবং সিরিয়া ও মিশর নিয়ে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করেন,তার নামানুসারে তার বংশ আয়ুবী বংশ নামে পরিচিত; পরবর্তীতে তারা মামলুকদের হাতে উৎখাত হন। সালাউদ্দিনের ক্ষমতা আরোহন ক্রুসেডের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। ক্রুসেড প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা খ্রীশ্চান চ্যালেঞ্জের ফলশ্রুতিতে মুসলিম প্রতিক্রিয়ার অংশ মাত্র। পুর্বে কন্সটান্টিনোপলের দ্বার থেকে পশ্চিমে পীরেনীজের (বাস্তবে সম্প্রসারনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ,স্বল্পকালীন সময়ের জন্যে পীরেনিজও অতিক্রম করেছে।) কাছে শক্ত হয়ে গেড়ে বসা আরব মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পশ্চিমা খ্রীশ্চানদের মরীয়া হইয়া উঠা বিরোধীতার প্রথম পর্য্যায় দেখেছে একাদশ শতাব্দী।

১০৮৫ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের খ্রীশ্চানদের হাতে টলেডোর পতন হয়, তার দশ বছর পর প্যালেস্টাইনে খ্রীশ্চানদের পবিত্র স্থান সমূহ পুনর্দখলের লক্ষ্যে প্রথম ক্রুসেড পরিচালিত হয় । ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের আরব বিজয়ের মত অন্যান্য লক্ষ্য যেমন – বানিজ্যিক স্বপ্ন এবং ইটালীয়ান শহর সমূহে আধিপত্য,অভিজাত সামন্ত সন্তানদের উপযুক্ত কাজ জোটানো,বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে একজোট করার মাধ্যমে ইউরোপীয় অভিজাতদের আভ্যান্তরীন দ্বন্ধ নিরসন ইত্যাদি উদ্দেশ্যের সাথে ধর্মীয় উদ্দীপনা খ্রীশ্চানদের ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। দুই শতাব্দী যাবৎ সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এমনকি মিশরও এই থেকে থেকে ইউরোপীয় আগ্রাসনের এবং স্থান বিশেষে বেশ দীর্ঘ জবরদখলের শিকার হয়। এভাবে জেরুযালেমে ল্যাটিন রাজত্ব চলে প্রায় একশত বছর, এবং এর অবসান হলেও ক্রুসেডারেরা লেবানন , সিরিয়ার বেশকিছু সুরক্ষিত, উপকূলীয় জেলা দীর্ঘ কাল যাবৎ দখল করে রাখে।

এত কিছু সত্বেও ক্রুসেডারেরা আরব সাম্রাজ্যের কাঠামোয় কোন ক্ষতি কিংবা এর চরিত্রে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। এর চেয়েও অধিকতর ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর রেখেছে মঙ্গোল আগ্রাসন। চেঙ্গিস খানের হাতে শুরু হয়ে ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে হালাকু খানের হাতে বাগদাদের দখল-লুণ্ঠন-ভস্মীভূত হওয়া ,বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা খুন কিছুই বাদ যায়নি। সেই সময় থেকে ষোড়শ শতকে অটোমন তুর্কিদের আগমন পর্য্যন্ত ইরাক,পারস্য কেন্দ্রীক মোঙ্গল সাম্রাজ্যভুক্ত থাকে। মোঙ্গলরা অবশ্য তাদের পুর্বেকার সেলজুক এবং পরবর্তী অটোমনদের মত ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে, যেমন জার্মান (গথ)রা বিজিত রোমের খ্রীশ্চান ধর্ম গ্রহন করেছিল।

মামলুক শাসক বে'বার উত্তর সিরিয়ায় মোঙ্গালদের চূড়ান্ত ভাবে পরাস্ত করলে ইরাকের মত দুর্ভাগ্য থেকে সিরিয়া এবং মিশর বেচেঁ যায়। মামলুকরা একজন আব্বাসীয়কে কায়রোতে খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত করান । এভাবে ঐতিহাসিক খিলাফত পুনর্জীবীত হলেও, সেলজুক শাসনাধীন বাগদাদের মত এখানেও এর গুরুত্ব থাকেনা। ইতোমধ্যে ভাঙ্গন বেড়ে চলে উত্তর আফ্রিকায়,তবে আরবরা সবচেয়ে বড় বিপর্য্যয়ে পড়ে স্পেনে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরো একটা দেশ আরব সাম্রাজ্যের অংশ এবং আরব সভ্যতার কেন্দ্রভূমি এই স্পেন ইউরোপীয় খ্রীশ্চানরা জয় করে নেয়। এই সভ্যতার সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত কেন্দ্র কর্ডোভা বেদখল হয় ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে,গ্রানাডার পতন হয় ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে। এখানে আরবরা শুধু যে শাসন ক্ষমতা হারিয়েছে তা নয় বরং পুরো দেশটাই আরব কিংবা মুসলিম পরিচয় হারায়। উত্তর দিকে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রমের আট শতাব্দী পর ,৭০৯ খ্রীস্টাব্দে যে আরব-বার্বার বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার দেশটাকে প্লাবিত করেছিল তা পুরোপুরি মুল উৎস উত্তর আফ্রিকায় গুটিয়ে আসে। পশ্চিমে আরব বিশ্বের সীমানা হয়ে যায় মরক্কোর আটলান্টিক উপকূল। সিসিলিতেও আরবদের একই পশ্চাদপসারন ঘটে।

এতকিছু সত্বেও ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে অটোমন সুলতান প্রথম সেলিমের কায়রো দখল পর্য্যন্ত আরব সমাজ চূড়ান্ত দুর্গতিতে পড়েনি। সমগ্র আরব ভূমি (মরক্কেরার স্বতন্ত্র খেলাফত, এবং আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রে কম-বেশী নিরবচ্ছিন্ন নিজেদের আমীর শাসিত 'নজদ' ব্যতিত) অটোমন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, সর্বত্রই আরব এবং আরবীয় জনগন কর্তৃত্ব হারায়, শক্তির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় কন্সটান্টিনোপল অথবা তুর্কিদের ভাষায় ইস্তাম্বুল। অটোমন সুলতানেরা খলিফা উপাধি গ্রহন করেন। নুতোন সাংস্কৃতিক জীবনের আলোড়ন আর রাজনৈতিক উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হতে আরবদের সময় লাগে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত; এবং এই উদ্দীপনার ফসল ফলে বিংশ শতাব্দী নাগাদ। আরব সাম্রাজ্য ও সভ্যতার এত দ্রুত পতনের কারন এখনও পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হয়নি। বিভেদ এবং জড়ত্ব ঝড়োগতিতে অগ্রগতি ও বিকাশের দিন গুলোকে অনুসরণ করেছে, এবং এর ব্যাখ্যা হিসেবে প্রদত্ত বক্তব্যও মৌলিক প্রশ্ন বই কিছু নয়। এসব ব্যাখ্যার মধ্যে বলা যায় আদি বিভেদ আরব সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট করেছে,মারাত্মক শিয়া-সুন্নী মতভেদ এবং পরবর্তীতে স্পেনে শুরু হওয়া খিলাফতের ভাঙ্গন, পুর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যে আব্বাসীয়রা যখন উমাইয়াদের উৎখাত করে। কেউ আরও পেছনে গিয়ে প্রশ্ন করতে পারে আরব চরিত্র,ঐতিহ্যে নিজেদের অর্জিত ঐক্যবিনাশী এমন কিছু কি ছিল?

চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে বিশিষ্ট আরব ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খলদুন তাঁর দেশ তিউনিসে ফিরে আরব সমাজের পচনের বিষয়ে মন্তব্য করেন "সাধারন ভাবে বলতে গেলে ধর্মীয় ভিত্তি যেমন নবী অথবা সাধু পুরুষের ঐশী বানী ছাড়া আরবরা সাম্রাজ্য স্থাপনে অসমর্থ, কারণ তাদের উগ্র মেজাজ, অহংকার, বিশেষত: রাজনৈতিক বিষয়ে একের প্রতি অন্যের ঈর্ষাকাতরতা তাদের এমন এক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে যাদের পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া দুরূহ,যেহেতু তাদের চিন্তা -ভাবনায় ঐক্য কদাচিৎ,এবং অধিকন্তু প্রত্যেক আরবই

নিজেকে শাসনকর্তার যোগ্য মনে করে। বাপ-ভাই,কিংবা গোষ্ঠী প্রধান সে যেই হোক খুব কম ক্ষেত্রেই একে অন্যকে ছাড় দেয়,যদি দিতেও হয় তা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে। আরব বলতে খলদুন এখানে আরব উপদ্বীপের বেদুইনদের বুঝিয়েছেন। তারপরেও খোলা প্রশ্ন থেকে যায় ইসলামের কঠোর শৃঙ্খলাবোধ সত্বেও মরুচারীর চরম এবং অস্থির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুরো আরব সাম্রাজ্যে প্রচন্ড কেন্দ্রবিমুখ ঝোঁক তৈরী , এবং এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সাথে স্থায়ী জীবন যাপনের পরেও তা আরবদের মৌলিক সামাজিক দুর্বলতা হিসেবে থেকে গিয়েছিল কিনা।

ইবনে খলদুনের বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক মিল আজও খোলা চোখে দেখা যায়। উদ্ধত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এবং অন্যের নেতৃত্ব মানতে অনিচ্ছা যা তিনি ছয় শতাব্দী আগে এত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা আজও আরব সমাজে স্থায়ী-যাযাবর, মুসলিম- খ্রীশ্চান নির্বিশেষে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। মুহম্মদ (দ:)র ধর্ম এবং প্রথমদিকের বিজয়ের পুরস্কার ও সম্মান কিছু সময়ের জন্যে এই অপশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পীরেনীজ থেকে চীন সীমান্ত পর্যন্ত উমাইয়া সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব করেছিল। কিন্তু বিজয়ী বিশ্বাসের প্রাথমিক উচ্ছাস তিথিয়ে এলে মরু থেকে বয়ে আনা প্রাক ইসলামী যুগের দুর্বলতা সব প্রকাশ পেতে শুরু করে।

রাজদরবারের জৌলুস আড়ম্বরের তলে বাগদাদের সিংহাসনে খোদ খিলাফত এবং তাতে নির্ভরশীল পুরো সরকার ব্যাবস্থা চাপা পড়ে যায়। ধন-সম্পদ বিলাসীতা ও ইন্দ্রীয়পরায়নতার পথ প্রশস্থ করে (রোমের মত) আরব পৌরুষে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বহুগামীতা এবং রক্ষিতা রাখার চল পরিবারের একতা তথা সংহতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে, পারিবারিক উত্তরাধিকারের প্রশ্ন প্রায়শঃই এমনকি খলিফার পরিবারেও বিরোধের জন্ম দিয়েছে। পেশাদার সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হওয়া খেলাফত কালক্রমে সামরিক অভিজাতদের প্রভাব বলয়ে খলিফাকে গুরুত্বহীন করে তোলে। মামলুক তুর্কিদের 'প্রিটরিয়ান গার্ড' সামঞ্জস্যতার মধ্য দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের সাথে আরও একটি মিল তৈরী করে ।

চুড়ান্তভাবে আরবদের বিজিত বিরাট সাম্রাজ্যে একক শাসন চালু রাখার মত যোগাযোগ ব্যাবস্থার অভাবে এখানে ওখানে স্থানীয় সালতানাত গড়ে উঠে কালক্রমে যা বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এখানেও রোম সাম্রাজ্যের সাথে সাদৃশ্য মনে আসতে পারে এবং তা'হল ওরাও পুর্ব এবং পশ্চিম সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দুটোই পর্য্যায়ক্রমে ধ্বংস হয়। কিন্তু যেখানে ভৌগলিক,রাজনৈতিক দুরত্বের ফলে রোমান চার্চ এবং কন্সটান্টিনোপলের চার্চের মধ্যে সুগভীর বিভেদের সৃষ্টি হয় সেখানে ইসলামের প্রারম্ভিক সময়েই আরব ইতিহাসে শিয়া সুন্নী দ্বন্ধ সৃষ্টি এবং তা যতটা না রাজনৈতিক বিভেদের ফল তারও বেশী বিভেদের কারন। সব মিলিয়ে আরব সাম্রাজ্যের পতনদশা নানাভাবে রোম সাম্রাজ্যের অন্তিম দশাকেই মনে করিয়ে দেয়।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে আরব সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতনের পর তা অনেকগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত না হয়ে বরং প্রায় পুরোটাই অটোমন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এভাবে একটা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আরববিশ্বের মৌলিক ঐক্যটা ঠিকে যায়। অধিকন্তু অটোমন তুর্কিরা আরব বিশ্ব দখল ও শাসন করে তা আত্তীকরন কিংবা নিজেরা তাতে আত্তিকৃত না হয়ে। দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে কতেক পরিমানে বংশ মিশ্রন ঘটে,সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অটোমনরা ইতোমধ্যেই তাদের ধর্ম হিসেবে ইসলামকে গ্রহন করে,এবং ফারসীদের মত ,আরবী ভাষা ও বর্ণমালা থেকে বহুলাংশে ধার করে নিজেদের জন্যে নুতন ভাষার উদ্ভব ঘটায়। এভাবে অটোমন শাসন যদিও সাধারণভাবে বন্ধ্যা ছিল, তারা আরব বিশ্বে নুতন কোন সাংস্কৃতিক মুল্যবোধ সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরনা আনেনি; সাম্রাজ্যের ধন সম্পদের উৎসে যদিও তারা কঠোর ও ধ্বংসাত্মক ছিল তথাপি এর জনগনের আরবীয়তার উপর তা আরোপ করেনি ফলতঃ তিন শতাব্দী পর যখন আরবরা আবার জেগে উঠে

আরব হিসেবেই জেগে উঠে। আরব ইতিহাসের এই পরবর্তী অধ্যায়ে যাওয়ার আগে,তাদের সাংস্কৃতিক অর্জন, এবং বিশ্ব ইতিহাসে তাদের অবদান পর্য্যালোচনা প্রয়োজন।

ইতিহাসে আরবদের অবস্থান

আনুমানিক খ্রীস্টপুর্ব ৬০০অব্দ থেকে পুরাতন বিশ্ব যেমন গ্রীক এবং রোমানদের করায়ত্ব, আজকের বিশ্ব যেমন ইউরোপ এবং আমেরিকানদের কর্তৃত্বাধীন তেমনি মধ্যযুগের পৃথিবী ছিল আরবদের পদানত। ইতিহাসে আরবদের স্থান অথবা ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারনে আরবদের ভূমিকা তিনটি আলাদা বৈশিষ্ঠ্যে উজ্বল।

প্রথমতঃ যেমনটা আমরা দেখেছি , পুরো উত্তর আফ্রিকা এবং প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য পাকাপাকিভাবে আরবীয়করণের মাধ্যমে আরবরা পৃথিবীর মানচিত্রের এক অংশকে নিজেদের করে নিয়েছে। এ অঞ্চলের প্রায় *৬০মিলিয়ন মানুষ আজ আরবী ভাষায় কথা বলে এবং কোন না কোন ভাবে নিজেকে আরব বলে পরিচয় দেয়। দ্বিতীয়তঃ আরবরা ইসলামকে আরব বিশ্বের বাইরে অনেক অনেক দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেছে। রাজ্য জয়ের মাধ্যমে (যখন তাদের সাম্রাজ্য স্পেন থেকে চীন পয্যন্ত বিস্তৃত, রোমান সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আয়তনের দ্বিগুন),এবং বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিস্তৃতির মাধ্যমে তারা নবী(দ:)র ধর্মকে এশিয়ার উপকণ্ঠ থেকে এর দক্ষিণপুর্ব বিন্দু মালয় এবং সমুদ্র পেরিয়ে পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পয্যন্ত নিয়ে যায়।

** আজকের পৃথিবীতে প্রায় তিনশত পঞ্চাশ মিলিয়ন মুসলিম ---- পুর্ব গোলার্ধে বিস্তৃত বিশাল এক ‘মনোলিথিক’ জনগোষ্ঠী প্রধানতঃ নবী(দ:)র উপদেশাবলী এবং কোরাণের নির্দেশিত সামাজিক বিধান মতে জীবন যাপন করছে। যদিও ওই বিশ্ব-সমাজের ছয় সপ্তমাংশ জনগন নিজেরা আরব কিংবা আরবী ভাষাভাষি নয় তথাপি তারা আরব উৎকর্ষ , উদ্দীপনারই ফসল । ইতিহাসে এ অবদান ক্ষুদ্র অথচ জটিল ‘হোমোজেনাস’ আরব বিশ্বের চেয়ে কম গুরুত্ব পুর্ন নয়। তৃতীয়তঃ দামেস্ক,বাগদাদ, টলেডো,কর্ডোভায় সৃষ্টিশীলতার শিখরে আরবরা সভ্যতায় পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে। তাদের নিজস্ব যা ছিল এবং যা তারা প্রাচীন গ্রীস-পারস্য-ভারত থেকে শিখেছে তার সবই মানব সমাজের ক্রম অগ্রগতিতে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করেছে।

পৌরাণিক সভ্যতার ঝলমলে উষা থেকে গন্‌গনে রেনেসাঁর ভরদুপুর পর্যান্ত মধ্যবর্তী সময়ে সভ্যতার মূলস্রোতধারার লীলাভূমি ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এরাই আলো দিয়েছে। এক্ষণে এই শেষোক্ত অবদানই আলোচনা করা যাক। আরবরা ভূ-গোলের আকাশ মাটি দু তরফেই সমানভাবে আরবী শব্দাবলী দিয়ে ইউরোপে তাদের সাংস্কৃতিক দখলের চিরস্থায়ী প্রমান রেখে গেছে। *Betelgeuse,Rigel (পা),Al –Kaid (নেতা), Al- Tair (ঈগল)* এবং আরবী শব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক পরিভাষায় অন্যান্য নক্ষত্রের নাম এই বিষয়ে আরব অবদান ,উৎকর্ষ এবং বিশ্বজ্ঞানকোষে আরব উৎকর্ষতার পাকা দলিল ।

স্পেন হয়ে বৃটিশ ইতিহাস এবং লন্ডনবাসীর দৈনন্দিন জীবনে ঢুকে পড়া অনেক আরবী নামের মধ্যে আছে লন্ডনের একটি বিখ্যাত স্থান, বৃটিশ নৌ শক্তির বিখ্যাত কেন্দ্রের নাম ট্রাফালগার স্কয়ার, এসেছে দুটি আরবী শব্দ *Taraf-al-Ghar* (অর্থাৎ : গুহা সমৃদ্ধ অন্তরীপ) থেকে। জিব্রাল্টার এসেছে আরবী শব্দ *Jebel Tariq,* (অর্থাৎ তারিক পাহাড়) উত্তর আফ্রিকা পাড়ি দিয়ে স্পেন পৌঁছানো প্রথম আরব সেনাপতির নামে। বলতে গেলে স্পেনের মানচিত্রটাই আরবী নামে চিত্রিত। স্পেনের অনেক নদীর নাম *Guada* আরবী শব্দ *Wadi* র বিকৃত রূপ,যার অর্থ উপত্যকা, এখানে নদী। *Guadal Kibir* অর্থাৎ বড় নদী। একইভাবে স্পেনের বিখ্যাত ইমারত গুলো আজও আরব স্থপতিদের দেয়া আরবী নামেই পরিচিত, *Al cazar, Al hambra* অর্থাৎ ,যথাক্রমে প্রাসাদ এবং লাল দালান ইত্যাদি। ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে আরবী শব্দের প্রবেশ শুধু নক্ষত্র কিংবা স্থান নামের মধ্যেই সীমিত নয়।

বস্তু, পেশা , খেলাধুলা, দাপ্তরীক কর্মকান্ডে দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দমালায়ও তা পাওয়া যাবে । এভাবে দেরাজের স্পেনীয় প্রতিশব্দ *Alacena* এসেছে আরবী *Al-Khizana* থেকে, *Alcalde* (জজ) এসেছে *Al qadi* থেকে , *Aduana (* এবংফরাসী *douane* ও ইতালীয়ান *doagne*) অর্থাৎ শুল্ক ঘর এসেছে আরবী *Al –Diwan* থেকে, পর্তুগীজ *Alcatifa* এসেছে আরবী *Al-qatifa* (অর্থাৎ কম্বল অথবা ভেলভেট) থেকে। *Alfandega* (কাস্টম হাউস) এসেছে আরবী *Al-funduq* (চলতি আরবীতে অর্থ হোটেল), *Safra* (পরিত্যাক্ত ভূমি)এসেছে আরবী *Sahra* শব্দ থেকে। ইংরেজী ভাষায় এরকম মূলে আরবী এবং ব্যবহারে, অন্ততঃ পশ্চিম ইউরোপের ভাষায় , আন্তর্জাতিক চরিত্রের শত শত শব্দ থাকলেও *Admiral* ছাড়া কোন শব্দটি অত বেশী ইংরেজ- আয়ত্ব এবং ঐতিহ্য, স্মৃতি জাগানিয়া? অথচ তাও এসেছে আরবী *Amir Al-bahr* (অর্থ: নৌ সেনাপতি) থেকে। ফরাসী প্রতিশব্দ আরবী মূলের আরও কাছাকাছি,প্রথমে আরবী *Amir* শব্দ তার দ্বিতীয়ার্ধের সাথে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক *Al* যোগে *Amiral* , ইংরেজীতে সমসাময়িক প্রচলনে *'Abdul'*এর অনুকৃতি। *Arsenal,Sloop,Cable, Traffick, Tariff, Monson* প্রভৃতি শব্দ মূলে আরবী থেকে উৎপত্তি এবং মধ্যযুগে নৌ বিদ্যায় আরবদের বৃহত্তর ভূমিকার স্বাক্ষ্য দেয়।

Algebra, Algorism, Zero, Alchemy, Chess, Check, Checkmate ইত্যাদি আরবী থেকে উদ্ভুত শব্দ গণিত, রসায়ন এবং সভ্য সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক বিনোদন কর্মকান্ডে আরব প্রভাবের পরিচিতি। শুরুতেই বলা হয়েছে-*'Al'* হচ্ছে আরবীতে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক বিশেষণ। এই *'Al'* শব্দ সহযোগে ,মুলতঃ আরবী থেকে সৃষ্ট যথেষ্ট ইউরোপীয় শব্দ আছে। এরকম ধার দেনার আরও একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ফরাসী শব্দ *Salamalec,*আরবী সম্ভাষণ *Salam Aleik* (অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ।

'শুন্য' সংখ্যা, তথাকথিত আরবী সংখ্যামালা,এবং দশমিক হিসেবের ধারনা সবই ভারতীয়দের আবিষ্কার কিন্তু আরবরাই তা বিশ্ব সভ্যতার সেবায় নিয়ে আসে এবং ইউরোপে পৌঁছে দেয়। এভাবে শুধু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জানা অংকই সার হয়নি বরং উচ্চতর গণিতেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। শুন্য এবং আরবী সংখ্যামালা ছাড়া মৌলিক মেধা,সেরা জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন গ্রীকদের পক্ষেও সামনে এগোন সম্ভব হতোনা।

একইভাবে দাবা আবিষ্কার করে ভারতীয়রা, এবং আরবরা তা প্রথম দেখে পারস্যে। এর ইংরেজী নাম (ফরাসী তো বটেই) এবং খেলার সমাপ্তির চুড়ান্ত ঘোষনা *Check-mate,* ফারসী *Shah* এবং *Shah mat (* অর্থ যথাক্রমে 'রাজা' এবং 'রাজা মৃত') আরবদের মাধ্যমেই এসেছে।

আরবী থেকে উদ্ভুত আরও কিছু ইংরেজী শব্দ ব্যাবসা বাণিজ্য,হস্ত শিল্প, কৃষি ইত্যাদিতে আরব প্রভাবের স্বাক্ষ্য দেয় । আরবী *'Saqq'* থেকে উদ্ভুত,ইংরেজী *Cheque* শব্দ ব্যাবসায়ীক লেনদেন মাধ্যমে আরব অস্তিত্ব মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু পৃথিবী আপন কক্ষপথে এতটাই পূর্নবৃত্তে ঘুরে এসেছে যে খোদ আরবরাই আজকাল ব্যাংকে *Cheque* কথাটা ব্যাবহার করে , মূল আরবী শব্দটি কথার কথায় ঠিকে আছে কোনমতে।

Sofa শব্দটি আজ জেন অস্টিন কিংবা রানী ভিক্টোরিয়ার মতই খাঁটি ইংরেজ কিন্তু এসেছে আরবী **'***Suf***'** (অর্থাৎ ওল) থেকে। একই ভাবে *Mattress* এসেছে আরবী *Matrah* (অর্থাৎ শোয়া বা বিশ্রামের জায়গা) থেকে। একই ভাবে এসেছে *Atlas, Damask* এবং অন্যান্য মিহি বস্ত্র , আসবাবের উপকরন নামও। *Lemon, Rice, Sugar, Syrup, Ginger* ইত্যাদিও আরবী শব্দ, নির্দেশ করে- পন্যগুলো হয় আরব দেশ থেকে নয়তো আরবদের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া থেকে ইউরোপে প্রথম পৌঁছে।

বলা যেতে পারে '*tennis,* আগে যেমনটা ধারনা করা হতো ফরাসী *Tenez(*বল সার্ভ করার সময় প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত সাবধান বানী) থেকে নয় বরং *Tinniss* থেকে এসেছে, এ নামের মিশরীয় শহরটি টেনিস বলের মূল উপকরন বিশেষ ধরনের বুনন সামগ্রী তৈরীতে বিখ্যাত।

এরকম আরো অনেক কিছুর মধ্যে এই ব্যুৎপত্তিগত প্রমাণ দেখিয়ে উপসংহারে বলা যায়------ইউরোপ যদিও নিজস্ব উদ্যম ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান তথাপি এককালের পৃথিবীর প্রভূদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থেকে তারা প্রভূত উপকৃত হয়েছে এবং কাজে কাজেই তাদের ভৌগলিক জ্ঞান,আবিষ্কার,বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পূর্বপুরুষ মানা উচিত।

(৩)

ইউরোপের এই সাংস্কৃতিক পূর্বপুরুষেরা নিজেরাই আবার ভূ বিদ্যা সহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে গ্রীকদের ছাত্র ছিলেন । আরবরা প্রথম 'হেলেনিজম' এর সংস্পর্শে আসে দামেস্কে । উমাইয়া বংশের শাসনকালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে গ্রীক কর্মকান্ড সমুহ সরাসরি আরবী কিংবা 'সিরিয়াক' মাধ্যম হয়ে অনুবাদ শুরু হয়। কিন্তু বাগদাদে আব্বাসীয়দের শাসনকালে গ্রীক চিন্তাধারাকে আরবীতে আনয়নের মত দুরূহ কাজ পরিকল্পিত, টেকসইভাবে এবং রাজকীয় আনুকূল্যে চুড়ান্ত সফলতা লাভ করে।

খলিফা আল মামুন (৮১৩-৩৩) সমৃদ্ধ লাইব্রেরী সহ অনুবাদকারীদের একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পন্ডিতদের পারিতোষিক দিতেন। পন্ডিতেরা পরিব্রাজক হয়ে অনুবাদের জন্যে মূল পান্ডুলিপির খোঁজে কন্সটান্টিনোপল পর্য্যন্ত যেতেন। এই সমাজের এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব-এক খ্রীশ্চান ডাক্তার হুনাইন ইবনে ইসহাক(৮০৩-৭৩) পুরো নবম শতক এবং এর সভ্যতা উৎকর্ষের শিরোমণি । তিনি 'গ্যালেন' এবং 'হিপোক্রেটস' এর রচনা আরবীতে অনুবাদ করেন। ভবিষ্যত বংশধরের জন্যে রেখে যাওয়া তাঁর অনুবাদকর্মের মধ্যে রয়েছে 'গ্যালেনে'র শরীরবিদ্যা বিষয়ক সাত খন্ডের রচনা(মূল গ্রীক থেকেও যা এখন হারিয়ে গেছে),প্লেটোর 'রিপাবলিক' সহ এ্যারিস্টটলের অনেক রচনা ।

বাগদাদে এসব অনুবাদকদের পরিশ্রমের ফলেই আরবরা টলেমির রচনা সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং নিজেরাও ভূ-গোল বিষয়ে বৈজ্ঞাণিক চর্চা শুরু করে। খলিফা আল মামুন বাগদাদে দুটো মানমন্দির তৈরী করেন,সিরিয়ার মরুভূমিতে নির্ণীত ভৌগলিক 'ডিগ্রী' এবং সত্তুর জন পন্ডিতব্যক্তির সহায়তায় ভূ-গোলক নির্মাণ করেন। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল খাওয়ারিজমি এঁদেরই একজন এবং ইতোপূর্বেই তিনি টলেমির রচনার সহায়তায় অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা নির্দেশ সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন।

পরবর্তী কয়েক শতকে অনেক আরব জ্যোর্তিবিদ, ভূগোলবিদ আল খাওয়ারিজমিকে অনুসরন করেন, অনেক পরিব্রাজক বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করে নানা তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। সবচে' বিখ্যাত ভূ-বিদ্যা বিশারদ,এবং যাঁর ইতিহাস ইউরোপীয়দের কাছে পরম কৌতুহলের তিনি হচ্ছেন সিসিলির নর্মান রাজা দ্বিতীয় রজারের (১১৩০-৫৪) পারিষদ আল ইদ্রিসি। সিসিলিতে আরব শাসন পতনের পর নরমান রাজ দরবারে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'কিতাব রুজ্জার' (রজারের বই),রাজকীয় বদান্যতার সম্মানে তিনি এই নাম দেন ।

ভূ-বিজ্ঞান এবং ভৌগলিক আবিষ্কারে আধুনিক যুগের পথ প্রদর্শক আরবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে 'পৃথিবী গোলাকার' গ্রীকদের এই ধারনাকে এমন এক সময় ব্যাপী বাঁচিয়ে রাখা যখন ইউরোপের অন্ধকার যুগে খ্রীশ্চান পন্ডিতজনেরা বিপরীত ধারনা পোষন করতো। আরবদের মাধ্যমে বেঁচে থাকা এই গ্রীক ধারনাই কলম্বাসকে বিশাল অভিযান পরিচালনা এবং নুতন পৃথিবী আবিষ্কারে সহায়তা করে।

তবে আরবরা নিজে মধ্যযুগের প্রধান নৌ বিশারদ এবং ব্যাবসায়ীরূপে পুরাতন পৃথিবীতেই সরাসরি হাতে কলমে ভূগোল চর্চা করেছে। তাদের জাহাজ পাল তুলেছে ভূমধ্য সাগরের এমাথা ওমাথা এবং পারস্য উপসাগর ও ভারতের বন্দর থেকে বন্দরে। ইরাকের বিখ্যাত নদী সমূহ ভূমধ্য সাগরের সাথে খোদ বাগদাদের যোগ সাধন করেছে, যেখান থেকে বাণিজ্য বহর ভূমধ্য সাগরীয় বন্দরসমূহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। আরও একটি জলপথ ভারত মহাসাগর থেকে লোহিত সাগরে তথা জেদ্দা বন্দর, ও সুয়েজ পর্য্যন্ত এসেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো দা গামা যখন আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এসে পৌঁছেন ,এক আরব কান্ডারীই তাকে ভারত মহাসাগর হয়ে ভারতে নিয়ে যান। ঐ জলপথ সমূহে আরব নাবিকদের অভিজ্ঞতা নির্ভর কাহিনী 'সিন্দবাদ নাবিকের' সমুদ্র যাত্রার রোমাঞ্চ আজও বিশ্বজুড়ে শিশু কিশোরদের শিহরিত করে।

মধ্য এশিয়ার সাথে বাণিজ্যে শুধু ভারত মহাসাগরই আরবদের একমাত্র হাইওয়ে ছিলনা। 'মরুর জাহাজ' এমনকি ইসলামের আবির্ভাবেরও আগে থেকে আরব উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার মধ্যে যে কারাভাঁ রুট সৃষ্টি করেছে তার সাথে ভারত এবং চীনের দিকে নুতন স্থলপথ খুলে দেয় সমরকন্দমুখী গোল্ডেন রুট। পাশাপাশি জলপথেও বাগদাদের ব্যবসায়ী

রাজপুত্ররা চীনের সিল্ক, ভারতের মশলা আমদানী করছিল। পূর্বঞ্চালীয় রাজধানী থেকে এসব পন্য বাজার খুঁজে পেয়েছে স্পেন এবং ইউরোপের দেশ দেশান্তরে।

বাগদাদ থেকে দক্ষিণ রাশিয়া এবং আফ্রিকার দিকেও কারাভাঁ রূট ছিল। মধ্যযুগে আরব ব্যাবসা বাণিজ্য প্রসারের চিহ্ন স্বরূপ সপ্তম থেকে একাদশ শতকের অসংখ্য আরবমুদ্রা শুধু ভলগা বেসিনে নয় বরং স্কান্ডেনেভিয়ায় , কিছু খোদ বৃটেনেও পাওয়া যায় । আরব বণিকেরা হয়তো নিজেরা ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড অথবা বৃটেনে আসেনি ,কিন্তু গুরুত্বপূর্ন কথা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাদের মুদ্রার এত ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা ছিল যে দূরতম দেশেও তা পৌঁছেছে।

৪

গ্রীক থেকে অনুবাদের যুগ পর্ব শেষে শুরু হয় আরব সৃষ্টিশীল চিন্তা ধারার নুতন পর্ব। চিকিৎসা শাস্ত্রে আরবরা গ্রীকদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারের উপর উল্লেখযোগ্য কিছু যোগ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে তাদের মূল অবদান হচ্ছে 'গ্যালেন',হিপোক্রেটস প্রমুখের রচনা সংরক্ষণ ও তা ইউরোপে পৌঁছানো। অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় তারা নিজেদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলও তাতে সন্নিবেশিত করে। তবে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও গণিতে তারা কিছু প্রথম শ্রেণীর মৌলিক কাজ করেন যা এসমস্ত বিজ্ঞানকে বিশেষতঃ বীজগণিত, জ্যামিতি এবং ত্রি-কোনমিতিকে গ্রীকদের রেখে যাওয়া স্তর থেকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যায়। *'Algebra'* শব্দটা এসেছে আরবী *'Al-jabr'* (অর্থাৎ সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধার) থেকে। উমর খইয়্যাম(আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বে গণিতের চেয়ে কাব্যের জন্যে যার বেশী সুনাম) তাঁর বীজ গণিত চর্চা করেন আরবীতে , যদিও কাব্য রচনা করেন মাতৃভাষা ফারসীতে। তাঁর এবং আরব স্বর্ণযুগের আর সব গণিতজ্ঞবৃন্দের যতো মৌলিক রচনা (যেমন আল খাওয়ারিজমির ত্রি-কোনমিতির উপর আলগোরিজম, এবং ত্রিকোনমিতি ও বীজগণিত উভয় শাস্ত্রে আল বাত্তানীর রচনা) ছাড়া সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিপ্লব অন্ততঃ সে সময়ে সংঘটিত হতে পারতো কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে (কোপার্নিকাস তাঁর বই '*Revolutionibus Orbium Coelesstium* এ আল বাত্তানী এবং, স্পেনীয়-আরব জ্যোতির্বিদ আল জারকালির লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছেন) যেহেতু বিজ্ঞানের এ বিপ্লব এবং এর সাথে অন্যান্য সব উৎকর্ষের সম্মিলিত ফসলকে আমরা রেনেসাঁ অথবা পশ্চিমা সভ্যতা অভিহিত করি, যা আধুনিক মন মানসিকতা তৈরী করেছে , তার জন্ম বৃত্তান্তে আরব যোগসূত্র সবিশেষ গুরুত্বপূর্ন।

"নাজারত" এর যীশুখ্রীস্টের পর প্রাচীন গ্রীসের দুই চিন্তাবিদ প্লেটো এবং এ্যরিস্টটল ইউরোপীয় সাধারণের তথা পশ্চিমা অথবা সঙ্গত ভাবেই বলা যায় সমসাময়িক বিশ্ব সভ্যতার আত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে অন্য যে কারুর চেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছেন । প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রপঞ্চে আমাদের বোঝাপড়া এবং এসব প্রপঞ্চের মর্মার্থ, প্রেক্ষাপট অনুধাবনের চেষ্টা,এমনকি আমাদের যুক্তির নীতি সমূহ, সব পশ্চিমা দর্শন, সব বিজ্ঞান এবং যুক্তি এই দুই গুরু মস্তিষ্কে তার শেকড় খুঁজে পায়। বৃহত্তর পরিসরে আরবরাই প্লেটো এবং এরিস্টটলকে (আফলাতুন এবং এ্যরিস্তো) ইতিহাসে এই স্থান করে দিয়েছে । ইউরোপীয় চিন্তা চেতনার উপর এই কমান্ড পজিশন শুধু অনুবাদ এবং তা দেশ দেশান্তরে পৌঁছে দেবার সুবাদে নয় বরং তার টীকা ভাষ্য, এবং ব্যাখ্যার জন্যেও।

এ দুই মহান চিন্তাবিদ আজও আরবদের ঐতিহ্যে গৌরবের স্থানে অধিষ্ঠিত । তবে আরবরা আল মু'আল্লিম আল আউয়্যাল (আদি গুরু) উপাধিতে এ্যরিস্টটলকে বরং প্লেটোর চেয়ে খ্যাতির উচ্চাসন দিতে অভ্যস্ত , স্পেনে আরবদের এ্যরিস্টটল অনুবাদ,ব্যাখ্যা এবং চর্চার মধ্য দিয়েই এ্যরিস্টটল, ইসলামের পুরো বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতাকে চমৎকারভাবে প্রভাবান্বিত করার পর মধ্য যুগের ইউরোপে জ্ঞানের চূড়ান্ত মীমাংসাকারীর আসনে অধিষ্ঠিত হন।

ইবনে রুশদ মধ্যযুগের ইউরোপে বিকৃত ল্যাটিন *Averroes* নামে যার খ্যাতি, আরব এ্যরিস্টটলীয়ানদের মধ্যে সেরা টীকাকার। বাস্তবিকই তিনি দর্শন, আইন বিজ্ঞান,চিকিৎসা ,গণিত সর্ব বিষয়েই আরব সভ্যতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকে তিনি কর্ডোভায় বসবাস করতেন এবং শিক্ষা দিতেন । সেখান থেকেই তাঁর প্রভাব ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দু এবং খ্রীশ্চান দর্শন ও ধর্মতত্বে প্রবেশ করে। এ্যরিস্টটল বিষয়ে তাঁর টীকাভাষ্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য ছিল।

যদিও দার্শনিক হিসেবে তাঁর কিছু মৌলিক শিক্ষা অনেক ইউরোপীয় পন্ডিতবর্গ ভুল বুঝেছেন,এবং তার নামানুসারে নুতন চিন্তা ধারার নাম দিয়েছেন *Averroism,* তথাপি এ্যরিস্টটলের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গী, এবং বিশ্বাস ও যুক্তি, দর্শন ও দৈববানীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মত অতুল গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এমন দাবী অবশ্যই করা যায় যে,"দর্শনের সত্যের সাথে ঈশ্বরের বানীর বিরোধ নেই" এ্যরিস্টটলের এই দর্শন, মধ্যযুগের বিখ্যাত যুগজিজ্ঞাসা প্রমাণ করতে ইবনে রুশদই মুসলিম, ইহুদী , খ্রীশ্চানদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ্যরিস্টটলের দর্শন ও কোরানের বানীর মধ্যে ঐক্যের যে সিদ্ধান্তে ইবনে রুশদ আসতে চেয়েছেন (ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মের সাথে আপাতঃ বিরোধে তিনি যুক্তিকে অনুসরন করার সাহসও দেখিয়েছেন) তাঁর প্রভাবে মাইমুনাইড ইহুদীরা ওল্ড টেস্টামেন্টের এবং পরবর্তীতে খ্রীশ্চানরাও খ্রীস্টিয় রীতিনীতির সাথে এ্যরিস্টটলের দর্শনের ঐক্য সুত্র সিদ্ধান্তে আসার প্রচেষ্টা চালান।

স্পেনে আরব সভ্যতাপর্ব পর্য্যন্ত ইউরোপীয়দের কাছে এ্যরিস্টটলের একটা অপর্য্যাপ্ত ল্যাটিন সংস্করন (*Boethius*এর রচনা) ছিল। একাদশ শতকে খ্রীশ্চানদের হাতে টলেডোর পতনের পর মাইকেল দ্য স্কট কতৃক আরবী থেকে ল্যাটিনে অনুদিত সংস্করনই মধ্যযুগের এ্যরিস্টটলীয়ানিজমের মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

ইবনে রুশদ যেমন ছিলেন পশ্চিমা দেশ সমূহে (বিশেষতঃ ইউরোপীয় চিন্তাধারার উপর তাঁর প্রভাব বিচারে) আরব সভ্যতার উজ্বলতম নক্ষত্র, তেমনি আভেসিনা তথা ইবনে সিনা (দশম শতকের শেষদিকে বোখারায় জন্ম) ছিলেন পূর্বদেশে আরব সভ্যতার প্রবাদ পুরুষ। ইবনে রুশদ এবং সমকালীন অন্যান্য বিশিষ্ঠ চিন্তাবিদদের মত তিনি ছিলেন জ্ঞানের বিশ্বকোষ, ফ্রান্সিস বেকন তাঁর জন্যেই বলেছেন '*All knowledge for his province"* । তবে প্রধানতঃ তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞানের পান্ডিত্যই ইউরোপকে বেশী আচ্ছন্ন করে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্রের ল্যাটিন অনুবাদ(পনের শতক পর্য্যন্ত অন্ততঃ পনের সংস্করণ বেরিয়েছে) ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যার কেন্দ্রসমূহে মূল পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি আজও আরব দেশ সমূহের নানা জায়গায় কোন কোন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে শেষ রায়ের মতই ইবনে সিনার উদ্ধৃতি দেওয়ার চল রয়েছে।

ইবনে সিনার সমসাময়িক আলবেরুনী (অধিকতর মৌলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রজ্ঞা স্বত্বেও ইউরোপের চিন্তা চেতনা কিংবা ইতিহাসে ততটা বিখ্যাত নন) পদার্থ, রসায়ন,ভূগোল,ইতিহাস, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যায় সমান পারদর্শী। আল কিন্দি (জন্ম ৮৩০খ্রীঃ) দর্শনের সাথে গণিত, রসায়ন, আলোক বিজ্ঞান এবং সূর তত্বকে এক সূত্রে বাঁধেন। ইউক্লিডস নির্ভর তাঁর আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষনা ইউরোপে খ্যাতি অর্জন করে,এমনকি মনীষি রজার বেকন পর্য্যন্ত তাতে প্রভাবান্বিত হন। তাঁর এক শতাব্দী আগে আরবী 'আলকেমি'র জনক জাবের ইবনে হাইয়ান (ইউরোপীয়দের কাছে *Geber*) রসায়ন শাস্ত্রে গবেষনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রভুত আবিষ্কার সাধন করেন । আরবী ভাষায় আজও তাঁর ২২টি রচনা বেঁচে আছে, অনেক অতিরঞ্জন স্বত্বেও ল্যাটিন ভাষায় তাঁর রচনা আরও অনেক বেশী সংখ্যায় ঠিকে আছে, যা একসময় ইউরোপে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ন প্রস্তাবনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

আল রাজী (ইউরোপীয়দের কাছে *Rhazes)* ইবনে সিনার সমসাময়িক তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর চেয়েও সেরা। তিনিও রজার বেকনকে প্রভাবান্বিত করেন।

বোখারা-বাগদাদ থেকে টলেডো-কর্ডোভা পর্য্যন্ত আরব সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে তা ইউরোপে পৌঁছে দিয়েছেন এমন সব মনীষীর দীর্ঘ তালিকা পেশ করার অবকাশ এখানে নেই। তা স্বত্বেও আরও কিছু নাম উল্লেখ না করলেই নয়। স্পেনে ইবনে রূশদ এর ছায়ায় বেড়ে উঠা অথচ তাঁর প্রায় সমকক্ষ তেমনি এক নাম ইবনে বাজ্জা (ল্যাটিন পরিচিতি *Avempace*) মুক্তচিন্তার মানুষ এবং ব্যক্তিগত অমরত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন। একই সময়ে পূর্বাঞ্চলীয় আরব বিশ্বে বেড়ে উঠেছেন (মৃত্যু -১১১১, খোরাসানে) আল গাজালী (ল্যাটিন পরিচয় *Al gazel*)- ইসলামের সবচেয়ে মরমী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা। এ্যরিস্টটল বিষয়ে তাঁর টীকাভাষ্য ইবনে রূশদ, ইবনে সিনার মতই ল্যাটিনে অনুদিত হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। এক শতাব্দী পর আরও এক আরব মরমী রহস্যবাদী ইবন আল আরাবী , যাঁর স্বর্গ নরক বর্ননা দান্তের *'Divine Comedy'* তে এমন হুবহু এসেছে যে তাকে কাকতালীয় না বলে ধার-কর্জ বলাই শ্রেয়।

শেষতঃ অনুপম ব্যক্তিত্ব-চরিত্রের ইবনে খলদুন (১৩৩২ খ্রীঃ তিউনিসে জন্ম হলেও তাঁর পূর্ব পুরুষেরা আরব উপদ্বীপের হাদ্রামতের বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা যায়)। ইবনে খলদুনের বিশেষত্ব এ কারনে যে তাঁর বেছে নেয়া কর্মক্ষেত্রে তিনি পূর্ব কিংবা পশ্চিমের, প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের যে কোন পূর্বপুরুষের চেয়ে বেশী সফলকাম। ইবনে রূশদ, ইবনে সিনা,আল গাজালী প্রমুখ (প্রত্যেকে অধিবিদ্যায় তাকে অতিক্রম করেছেন) মনীষীর চেয়ে তাঁর ভিন্নতা এখানে যে কর্মক্ষেত্রে তিনিই নিজের পথিকৃৎ, পূর্বতন কোন চিন্তাবিদের কাছেই তাঁর কোন ঋন নেই। তাঁর লেখা ইতিহাস গ্রন্থটা মধ্যযুগের সবচেয়ে বিশদ বর্ননা হলেও তেমন কোন অবিস্মরনীয় মেধার স্বাক্ষও নয়। কিন্তু মুখবন্ধটা, বিখ্যাত-*Prolegomenon* সন্দেহাতীতভাবেই অনন্য,অবিস্মরণীয়। এখানে ইবনে খলদুন ইতিহাসের দর্শন তৈরী করেন এবং নিজেকে প্রথম ধারাবাহিকতার সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই কৃতিত্বের জন্যেই অধ্যাপক টয়েনবির মন্তব্য-"নিঃসন্দেহে এটা আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সেরা কৃতিত্ব"। রবার্ট ফ্লিন্ট তাঁর *History of the Philosophy of History*-বইতে মন্তব্য করেন " ইবনে খলদুন একজন সাধারন ঐতিহাসিক হিসেবে বিবেচিত, এমনকি আরবদের মধ্যেও তাঁর চেয়ে সেরা অনেকে ছিলেন কিন্তু ইতিহাসের তাত্বিক হিসেবে স্থান-কাল ভেদে তাঁর কোন জুড়ি নেই। প্লেটো, এ্যরিস্টটল ,অগাস্টিন কেউই তাঁর পাঁর ছিলেননা।" মধ্যযুগের ইউরোপে আরব সভ্যতার দিগপালদের অবস্থান সম্পর্কে ধারনা দিতে গিয়ে এই সংক্ষিপ্ত, দ্রুত বর্ননায় পাঠক অবশ্যই *Averroes, Avicenna, Avempace* ইত্যাদি নামে ল্যাটিন উপসর্গের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করে থাকবেন এবং এই *'Ave'* হচ্ছে আররী 'ইব্ন' (পুত্র)র প্রতিশব্দ।

(৫)

দর্শন -বিজ্ঞানের মত গ্রীক কাব্য -ড্রামা কিন্তু আরবদের আকর্ষণ করেনি। সুতরাং নিজেদের সভ্যতায় তারা তা গ্রহনও করেনি, ইউরোপ কিংবা অন্যত্র পৌঁছায়ওনি। দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রথম দিকের গীতিকবিরা আরবী জনপ্রিয়, গীতধর্মী কবিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ ধারনা বাদে আরব সৌন্দর্য্যপিপাসুদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, প্রাণের সৃষ্টি তাদের কবিতা ইউরোপে ব্যাপক পরিচিতি পায়নি কিংবা সেখানে তা কোন অভিঘাতও তৈরী করেনি। আরবদের পছন্দের ছিল ৪০/৫০ কিংবা ততোধিক পংক্তিতে একই ছন্দ বিশিষ্ট ক্বাসিদা বা

গীতিকবিতা। প্রাক ইসলামী যুগ , মুসলিমরা যাকে বলে জাহিলিয়া তথা অজ্ঞানতার যুগের এইসব কবিতার বিষয়বস্তু- বীরগাঁথা, ভালবাসা, যুদ্ধ, পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসা, শত্রুর কুৎসা, নিজের কিংবা গোত্রের, উট, ঘোড়ার গৌরব ইত্যাদি যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আরব ইতিহাসে ইসলামী যুগের দুই বিখ্যাত কবি, যথাক্রমে আল মুতানাব্বী ও আল মা'আরী খ্রীস্টীয় দশম এবং একাদশ শতকের ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসে আরবদের অবস্থান নির্দেশক অথবা পশ্চিমের উপর আরবদের সৃষ্টিশীল,সাংস্কৃতিক প্রভাবের পরিচয়দানকারী কোনকিছুতেই তাঁদের উপস্থিত থাকতে না পারা এক সবিশেষ গুরুত্বপূর্ন ব্যর্থতা।

এঁদের জানতে হলে আধুনিক আরব সাহিত্যিকদের বিশেষ সাহিত্য কর্মে খোঁজ করতে হয়। মুতানাব্বীর ক্ষেত্রে কারণটা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়। তাঁর কবিতায় দর্শন কিংবা আধ্যাত্ম সার খুবই কম । মানবজীবনের অভিজ্ঞতা এবং গন্তব্য যা ছাড়া কবিতা শুধুই কথামালা , তা তাঁর কবিতায় নেই বললেই চলে। আরবদের কাছে তাঁর অনুভবের প্রায়ই বৈচিত্র্যহীন প্রকাশ "আলমুতানাব্বীর বচন " নামে পরিচিত । আরবী সাহিত্যে তাঁর উঁচু স্থান দখলের মূলে আছে বাক্য গঠন ও আরব কানে তার ছন্দ মাধুর্য্য। অজ্ঞেয়বাদী,দার্শনিক এবং আর্থিক বিষয়ে উদাসীন আল মা'আরীর বিষয়টা অন্যরকম। কবিতায় তিনি নিজেকে জীবন ও ভাগ্যের চিরন্তন বিষয়বস্তুতে আহ্বান করেছেন। লেবানীজ-মার্কিন কবি আমিন রায়হানি (যিনি ১৯২০ সনে তাঁর কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন)র মতে আল মা'আরীর 'লুজুমিয়াত' তাঁর এক শতাব্দী পরে ওমর খৈয়্যামের রুবাইয়াতের উপর গভীর ছায়া ফেলে; পার্থক্য এখানেই যে আল মা'আরী অতিমাত্রায় সংযমী তাই সুরার আশ্রয়ও নেননি। কবির কাব্যদীপ আঁধারে রাখার দায় আরবদেরই । যেহেতু তিনি সংশয়বাদী হিসেবে অবিশ্বাসীর কাছাকাছি তাই গোঁড়া ইসলামী মতামতের কোপে পড়েছিলেন।

সে যাই হোক , ভিন্ন ভাষায় রসাস্বাদনেতো বটেই অনুবাদের মাধ্যমে বশে আনার ক্ষেত্রেও কবিতা খুব কঠিন বিষয়। গ্রীক-ল্যাটিনের মত আরবী ভাষার চর্চা কখনও ইউরোপে হয়নি, সুতরাং আরবকাব্যে হোমারের মহাকাব্য ,এথেনীয় ট্র্যাজেডী (যা তাদের ছিলনা) থেকে থাকলেও তা গ্রীক-ল্যাটিন ধ্রুপদীর মতো ইউরোপীয় চিন্তা -চেতনাকে ভেদ করতে পারতোনা। তবুও আরবদের কাছে নিজেদের কবিতা বারংবার একই সূরে ঝংকৃত ছন্দের সম্মোহনী, কথার যাদু যা আগের মত এখনও বিনোদন, অনুপ্রেরনার উৎস। কাব্যে ইউরোপের অনুভূতি তৈরীতে আরব প্রভাব কম হলেও সঙ্গীতে চিত্র ভিন্ন । তত্ব এবং প্রয়োগে শিল্পকলার আনুসঙ্গিক সরঞ্জামাদির বিষয়ে আরবদের কাছ থেকে ইউরোপীয়রা যথেষ্ট শিখেছে। ক্যাস্টাইল এবং আরাগঁ রাজদরবারে আরব সঙ্গীতশিল্পীদের নাম সংরক্ষিত রয়েছে, স্পেনের সঙ্গীতে আরব সুর ও ছন্দ এখনও স্পষ্ঠ । *Lute* শব্দটিই এসেছে আরবী *Al ud* থেকে, *Guitar* গিটার এসেছে আরবী *Qitara* (মূলে গ্রীক থেকে আসা) থেকে, এবং জফ্রে সসারের উল্লেখিত *Rebec* অথবা *Ribible* এসেছে আরবী শব্দ *Rabab* থেকে।

এসবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে, মনীষীদের অনেকে এমন ধারনাও পোষন করেন যে ইউরোপীয় সঙ্গীত তত্ব আরবদের গ্রীক অনুবাদ এবং একই বিষয়ে তাদের নিজস্ব অবদান দু'ভাবেই প্রভাবিত হয়ে থাকবে। আল ফারাবী(দশম শতক) *Alpharabius* এই নামে ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছেন,এবং তাঁর তত্বও আল কিন্দি, ইবনে বাজ্জা, ইবনে সিনার মতো ইউরোপে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বরলিপির প্রতিটি স্বরের নির্দিষ্ট সময়মাত্রা আছে - ইউরোপীয় সঙ্গীতে এই সূত্রের প্রয়োগ এবং একই সময়ে আরব সংগীত বিশেষজ্ঞদের ল্যাটিনে অনুবাদ হওয়া থেকেই পশ্চিমা সঙ্গীতের এই গুরুত্বপূর্ন অর্জনে আরব পিতৃত্ব প্রতীয়মান

হয়; এবং ত্রয়োদশ শতকের ইউরোপীয় বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের মতামতও এই যে তাঁদের শিল্প আরব গুরুদের কাছে বহুলাংশে ঋনী।

স্থাপত্যবিদ্যায় আরব উৎকর্ষতা কাব্য ও সঙ্গীতের চেয়ে ভিন্ন; অথবা বলা যায় দু'টোরই সমাহার। কাব্যে তারা একটা শিল্পের জন্ম দিয়ে তা নিজেদের কাছেই রেখেছে। কারুর কাছ থেকে ধার যেমন করেনি কাউকে ধারও দেয়নি। পক্ষান্তরে সঙ্গীতে তাদের স্থায়ী সৃষ্টি স্বল্প হলেও তা দিয়ে তত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইউরোপকে শেখাতে পেরেছে ঢের বেশী। স্থাপত্যশিল্পে তারা দু'টো কাজ করেছে: তারা নিজেদের স্মৃতি স্মারক গড়েছে যা শিল্পকলা হিসেবে নিজের দাবীতে এককালের আরব সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে আজও টিকে আছে, এবং এই স্মৃতি স্মারক সমূহের মধ্য দিয়ে তারা ইউরোপীয় স্থাপত্যবিদ্যার অগ্রগতিতেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে।

আরব অথবা মুসলিম স্থপত্যকলার কথা বলতে গেলে মনে রাখা দরকার যে আরব সভ্যতার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত(প্রাক ইসলামী যুগের কবিতা ছাড়া) এটাও আরব উপদ্বীপের নিজস্ব কিছু নয় বরং বিজিত অধিকতর অগ্রসর দেশসমূহ বিশেষতঃ বাইজান্টাইন প্রদেশ সিরিয়া,মিশর এবং পারস্য সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য ইরাকে পাওয়া পদ্ধতি ও কাঠামোর রূপান্তর মাত্র। স্থাপত্য বিষয়ে নিজ ডেরায় আরবদের জ্ঞান গরিমা খুবই সীমিত। তাবুবাসী আরবদের যাযাবর জীবনের প্রাক ইসলামী যুগে যে ক'টি শহর ছিল ওসবের স্থাপত্যরীতিও খুবই সাধারণ; সামান্য ব্যতিক্রম বলতে দক্ষিণ ইয়েমেনের সানায় ৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত একটি ক্যাথিড্রাল।

মোহাম্মদ(দ:) ৬২২ খ্রীঃ মদীনায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন যার আদল পরবর্তীতে সব মসজিদের অনুকরণীয় হয়ে উঠে। সেটাও শিল্পকলা নয় বরং ইশ্বর মাহাত্ম্য প্রচারে , প্রার্থনাকারীদের ব্যবহার উপযোগী সাদামাঠা ডিজাইনের একটা চৌহদ্দি মাত্র। পাথুরে দেয়াল বেষ্টিত একটা খোলা চতর্ব যার একাংশে নবী(দ:) ইমামতি করতেন সেখানে খুব সম্ভব কাদামাটি ও খেজুর পাতার ছাটাই দিয়ে ছাদ দেওয়া ছিল এবং খেজুর গাছের থামের উপর তা দাঁড়িয়ে ছিল। তারপরও শতাব্দী পার হওয়ার আগে জেরুযালেমের 'ডোম অব দ্যা রক' তার সব সৌন্দর্য্য নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

এর কয়েক বছর পর তৈরী হয় দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ। এই স্মারক মসজিদগুলো নির্মাণে নিশ্চয় গ্রীক, সিরিয়ান, আর্মেনিয়ান কারিগরেরা নিয়োজিত ছিলেন; এখানে পূর্ব পশ্চিম দুই স্থাপত্যরীতিই চোখে পড়ে । স্থাপত্য কৌশলে মিশ্রিত উৎস স্বত্বেও এই দুই বিখ্যাত স্থাপনায় বিশেষতঃ দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে স্বকীয় এক নুতোন স্থাপত্যরীতির উদ্ভব ঘটে এবং সেটাই পুরো আরব সাম্রাজ্যের মসজিদ, প্রাসাদ নির্বিশেষে নির্মাণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতমুখী উপাদানে একাত্মতা আরোপের মাধ্যমে ইসলাম এবং মসজিদ প্যাটার্নের ঐতিহ্যগত অগ্রগতি এই শিল্পরীতির জন্ম দেয়। বহুল আলোচিত এ দুই মসজিদ ছাড়াও আরবস্থাপত্য বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যাবে ইরাকের সামারায়,কায়রো তিউনিস,এবং স্পেনে। মসজিদের শহর কায়রো। বিখ্যাত বলতে ইবনে তুল'ন (নবম শতকে নির্মিত) মসজিদ। টিকে থাকা প্রাচীনতম মিনারের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে তিউনিসিয়ার ক্বারাওয়ান মসজিদে (নির্মাণ কাল ৮ম শতক)। স্পেনে সর্বজনবিদিত কর্ডোভার মসজিদ ছাড়াও জাঁকজমকের সাথে সজ্জিত দুই প্রাসাদ--- আল কাসর ও আল হামরা। দশম এবং একাদশ শতকের মাঝে আরবদের নির্মাণ স্পৃহা মসজিদ থেকে দুর্গের দিকে ঝুঁকে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই সারাসিনের (আরবী থেকে উৎপত্তি অর্থাৎ পুর্বদিক) স্থাপত্য রীতি ইউরোপীয় স্থাপত্যশিল্পের অগ্রগতিতে প্রভুত অবদান রেখেছে। মসজিদ থেকে এসেছে গীর্জার আকৃতি, দুর্গ থেকে 'ক্যাসল'।

সবচেয়ে গুরূত্বপূর্ন এবং উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে সুঁচালু খিলান ,যা ছাড়া 'গথিক' তথা জার্মান স্থাপত্য অচিন্ত নীয়। যতদুর ধারণা করা যায় এ'ধরনের খিলান প্রথম ব্যাবহার হয় ইরাকের মসজিদে, সেখান থেকে ইবনে তুল'ন তা এনে ব্যবহার করেন কায়রোর মসজিদে যা তাঁর নাম বহন করছে। সম্ভবতঃ সিরিয়ায়ও অনেকে এ রীতি ব্যবহার করেছে। এই বৈশিষ্ট্যে নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত সব ফরাসী ও ইংলিশ ক্যথিড্রাল । একইভাবে মিনারগুলোকেও ইতালীয় গীর্জাসমুহের পথিকৃৎ মনে করা যায় , যেহেতু সিসিলির আরব স্থাপত্যরীতির প্রভাবে ইতালীয় স্থাপত্যরীতি সরাসরি প্রভাবিত । কাঠামো শৈলী ছেড়ে অঙ্গ সজ্জার দিকে তাকালেও দেখা যাবে 'গথিক' স্থাপত্য রীতিতে অলংকরনের কাড়াকাড়িও ইউরোপে এসেছে কায়রো থেকে; গথিক পরবর্তী অলংকরনে বাঁকানো খোঁদাই , এবং এলিজাবেথের যুগ থেকে শুরু ইংলিশ দেয়ালে ব্যবহৃত নীচু 'রিলিফ'প্যাটার্ন 'এ্যারাবস্ক্যু' , উৎস পরিচিতি নামেই নিহিত। ধারনা করা হয় সুশোভিত কাঁচের জানালা আরব বিশ্ব থেকে ইউরোপে পোঁছেছে।

ক্রুসেড ফেরতাদের মারফত অনেক সামরিক নির্মাণ কৌশলও ইউরোপে এসেছে। যার অন্যতম হচ্ছে দুর্গপ্রাচীরে নির্দিষ্ট উচ্চতায় বন্ধনীতে পাঁচিল নির্মাণ এবং গুপ্ত দরজা , যেখান থেকে সহজে অলক্ষ্যে শত্রুর উপর তীর , গরম তেল কিংবা অন্যান্য প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র নিক্ষেপ করা যায়। ইংল্যান্ডের নরউইচ এবং উইনচেস্টারে এর নমুনা মিলে। কায়রোতে সালাদিনের দুর্গ, এবং আলেপ্পোর দুর্গে সুরক্ষা বিধানে আরবদের আরেক ধরনের সামরিক নির্মাণ কৌশল লক্ষ্যনীয়। দুর্গের প্রবেশপথ সমকোনে অথবা আড়াআড়ি ভাবে তৈরীকরা। এর উদ্দেশ্য – শত্রুসেনারা দুর্গ প্রবেশ পথ দখল করার সাথে সাথে যেন সরাসরি দুর্গাভ্যান্তরে, আঙিনায় আঘাত না হানতে পারে। উনবিংশ শতকের শেষদিক পর্য্যন্ত আরব সেনা ছাউনি নির্মানের এই কৌশল ওমদারমানে খলিফার বাসভবনের (গর্ডন এবং মাহদীর মৃত্যুর পর ১৮৮৫ সনে নির্মিত) নির্মাণশৈলীতে আজও দেখতে পাওয়া যায়।

আরব শিল্পকলায় চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্য্য পাওয়া যাবেনা। এর পুরোপুরি নাহোক অন্ততঃ আংশিক কারন – যে কোন প্রকারে মানব আকৃতি তৈরীতে ধর্মীয় বিধি নিষেধ যা ইতোপুর্বে উল্লেখিত। আংশিক বলা হচ্ছে যেহেতু প্রথমতঃ মুসলিম পারস্য এবং মোঘল সাম্রাজ্যের চিত্রকলায় এ নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করা হয়েছে,এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি কিংবা স্থাপনা অঙ্কনে বিধি নিষেধ না থাকা সত্বেও আরবরা তাতে উন্নতি করেনি। নিশ্চয় প্রতিকৃতি অঙ্কনে নিষেধাজ্ঞা পুরোবিষয়টাকেই নিরুৎসাহিত করেছে, যেহেতু শিল্পকলার ইতিহাসে মানব প্রতিকৃতির পশ্চাদভূমি হিসেবে প্রকৃতি কিংবা স্থাপত্য নিদর্শন পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার ধ্রুপদী ভাস্কর্য্য এবং রেনেসাঁ যুগের চিত্রকলা দুটোরই প্রাথমিক বিষয়বস্তু ধর্মীয় উপাসনা সংক্রান্ত বিষয়------ সুনির্দিষ্টভাবে যে ধারাকে উৎখাত করতেই ইসলামের যাত্রা শুরু। ছোটখাটো অংকনের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ লেখায় বিমুর্ত কারুকাজ, আরবদের মধ্যে উৎকর্ষতার চুড়ান্ত স্তরে পোঁছেছে, এবং তা নানাভাবে ইউরোপীয় কলাবিদ্যায় সহায়ক প্রভাব ফেলেছে।

(৬)

যেমনটি আমরা ইতোপুর্বে দেখেছি স্পেন, সিসিলি এবং সিরিয়া হয়ে আরব সভ্যতা নানাভাবে ইউরোপে প্রবেশ করেছে এবং এই আরব ইউরোপীয় সম্মিলন ঠেকসইও হয়েছে। এই তিন মাধ্যমের মধ্যে স্পেন সবচেয়ে গুরূত্বপূর্ন। এই গুরূত্বের কারন দেশটার নিরবচ্ছিন্নভাবে আট শতাব্দী যাবৎ আরব দখলে থাকা শুধু নয় বরং এদেশেই আরব সভ্যতা পরিপূর্নভাবে বিকশিত হয়েছে। অধিকন্তু স্থান মাহাত্ম্য তথা ভৌগলিক অবস্থানের দাবীও ছিল, ক্রুসেডকাল পর্য্যন্ত,আদি আরব চিন্তাধারা এবং আরবদের গ্রীক অনুবাদ তা সে যেখানেই হয়ে থাক , তা ইউরোপে পৌঁছার সদর দরজা হবে স্পেনই।

আরবদের জন্যে বাইজান্টাইন দরজা ছিল বন্ধ, এমনকি হারুন আল রশীদের সময়ে বাগদাদের জৌলুসও পশ্চিমের পথ তথা স্পেন, সিসিলি হয়ে ইউরোপে পৌঁছেছে। টলেডো এবং কর্ডোভায় আরবরা ইউরোপের দু'টি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে যেখানে গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের পাশাপাশি আরব চিন্তাবিদগনের রচনাও অধ্যায়ন করার জন্যে সমগ্র মহাদেশ থেকে পন্ডিতেরা এসেছেন। তাঁদের মধ্যে জেরার্ড অফ ক্রিমোনা ইতালী থেকে, রবার্ট দ্য ইংলিশম্যান, এবং মাইকেল দ্য স্কট'র নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তজন সিসিলিও ভ্রমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরন করেন। ১০৮৫ সালে সপ্তম আলফনসো কর্তৃক টলেডো পুর্নদখল ইউরোপে আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রসার স্তব্দ করা দুরে থাক বরং আরো গতিশীল করেছে। আলফনসো ছিলেন উদার এবং নিজেকে দুই ধর্মের রাজা অভিহিত করতেন। তাঁর শাসনামলে মুসলিম আরব শিক্ষকেরা অব্যাহতভাবে বিকশিত হতে থাকেন, এবং প্রাচ্যদেশের জ্ঞান অর্জনের জন্যে পিরেনীজ পেরিয়ে খ্রীশ্চান ছাত্রেরা আগের চেয়েও বেশী সংখ্যায় স্পেনে আসতে থাকে।

এক শতাব্দী পর নরম্যানদের হাতে সিসিলির পতন হলে সেখানেও একই ঘটনা ঘটে। রাজা দ্বিতীয় রজার (১১৩০-১১৫৪) (যাঁর নামে আল ইদ্রিসী নিজের ভূগোল গ্রন্থ উৎসর্গ করেন)আরব শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজসভায় তিনি আরব প্রথা, আচরণ অব্যাহত রাখেন। সিংহাসনে আরোহন উপলক্ষ্যে রাজকীয় পোষাকে (তাও আররদেশে তৈরী) তিনি হিজরীসন উৎকীর্ণ করান, রাজ্যে আরবী মুদ্রা প্রচলন অব্যাহত রাখেন। এমনকি তাঁর এক শতাব্দী পরে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের রাজত্বকালেও দ্বীপটি বহুলাংশে আরব ছিল এবং তার প্রভাবও নেপলস বিশ্ববিদ্যালয় (যেখানে সেন্ট থমাস কিছুকাল অধ্যায়ন করেন) ও অন্যান্য জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র মারফত মুল ভুখন্ড ইতালীতে পৌঁছতে থাকে ।

স্পেন এবং সিসিলি উভয় দেশেই আরবরা ভূমি ব্যবস্থায় গুরুত্বপুর্ন পরিবর্তন সাধন করে,সেচের মাধ্যমে আধুনিক কৃষির পত্তন ঘটায়। তারা কমলা ,মালবেরী,ইক্ষু, খেজুর,কার্পাস চাষ একদেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যায়। উভয় দেশের কৃষি বিষয়ক শব্দে অনেক আরবী মুলের শব্দ,এবং আরবী শব্দের বিকৃত নামে পালেরমোতে এখনও অনেক ঝর্ণা বিদ্যমান। এ্যরিস্টটল এবং আরবী সংখ্যামালার পর ইউরোপের জন্যে আরেক গুরুত্বপুর্ণ আরবী উপহার (স্পেন থেকে)সম্ভবতঃ কাগজ। আরবরা কাগজ তৈরী করা শিখেছে চীনাদের কাছ থেকে। সভ্যতার এই নুতোন সামগ্রী , এমনকি ছাপাখানার বদৌলতে পুর্ন সদ্ব্যবহার শুরুরও অনেক আগে আরবদের হাত হয়ে ইউরোপে আসে এবং সেখানে পান্ডুলিপি নকল করার সুবিধার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার অবারিত দ্বার খুলে দেয়।

তৃতীয় সম্মিলন স্থল সিরিয়া। একাদশ শতকের শেষ দিক থেকে তের শতকের শেষ পর্য্যন্ত দুইশত বছরব্যাপী ক্রুসেড ইউরোপীয় এবং আরবদের এক জায়গায় ধরে রাখে। ক্রুসেডের চেয়ে স্পেন, সিসিলি হয়ে ইউরোপে পৌঁছা আরব প্রভাবই ছিল অধিকতর সৃষ্টিশীল এবং সুদুর প্রসারী। এর কারণ স্পেন, সিসিলিতে ইউরোপীয়রা আরবসভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের লগ্নেই এর সংস্পর্শে আসে পক্ষান্তরে ক্রুসেড শুরুর সময়কালে প্রাচ্য দেশে আরব সভ্যতার পতনের যুগ শুরু হয়ে গেছে। তারপরেও এতে কোন সন্দেহ নেই যে , ক্রুসেড ইউরোপের উপর শিক্ষনীয় উদার প্রভাব ফেলেছে; বিশেষতঃ যারা সরাসরি এতে অংশ নিয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে দীর্ঘকাল ব্যাপী সিরিয়ায় আরবদের সাথে থেকেছে তাদের মাধ্যমে। এখানে ইউরোপীয়রা এইচ, এল ফিশার এর ভাষায় "এমন এক সমাজ পেয়েছে যা তাদের নিজেদের সমাজের চেয়ে নানাদিক থেকে অধিকতর সংশোধিত, মর্য্যাদাপূর্ণ," এবং "প্রাচ্যদেশের প্রাণজুড়ানো আবহাওয়ার প্রভাবে ল্যাটিন বসতি স্থাপনকারীদের কাঠিন্য নিজেদের অজান্তেই শীতল হয়ে আসে। সিরীয় রমনী, খাদ্যতালিকা, জীবন পদ্ধতি এই রুক্ষ পশ্চিমা

অভিযাত্রীদের ভাল লাগতে শুরু করে এবং তাদের উন্মাদনা তিথিয়ে আনে"। অনেকেই স্থানীয় পোশাক এবং প্রথা পদ্ধতিতে অভ্যস্থ হয়ে যায়, কেউ কেউ আরব গোত্রপতিদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে, অনেকেই খ্রীশ্চান আরব রমনীদের বিয়ে করে। তারা আরবদের চিকিৎসা ও রসায়ন জ্ঞান শেখে, অন্যান্য শিল্পকলাবিদ্যাও আয়ত্ব করে ইউরোপে ফিরে যায় আরও উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী , খোলামন নিয়ে। আরব বস্ত্র , কাঠ,কাঁচ,ধাতব সামগ্রী সমূহ ইউরোপীয় কারিগরদের নুতন অগ্রগতিতে অনুপ্রাণিত করে। শেষতঃ তারা ফিরে যায় তাদের চরম শত্রু এবং ল্যাটিন সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত ধ্বংসকারী সালাদীনের মহানুভবতা, সম্মানপ্রদান বোধের বিচিত্র সব স্মৃতি নিয়ে। বিশ্ব হৃদয়ে অনপনেয় লেখা সালাদীনের ব্যক্তিত্ব,গুনাবলী পরবর্তীতে ইউরোপীয় প্রতিশোধ পরায়নতার ঐতিহ্যের উপর প্রতিস্থাপিত হয়েছে নিবিড়ভাবে।

(৭)

১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে তুর্কিদের কায়রো দখলের মধ্যদিয়ে চূড়ান্ত পতনের প্রায় পাঁচ শতাব্দী আগে ,পুর্ব পশ্চিমে সমান্তরালভাবে আরব সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। বাগদাদ এবং কর্ডোভার স্বর্ণযুগ প্রায় নবম থেকে একাদশ শতক পর্যান্ত বিস্তৃত। মধ্যযুগ থেকে সরে এসে উনবিংশ শতকের আরব পুনর্জাগরনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আগে এ'দুই শহরের জীবন প্রনালী একটু খতিয়ে দেখা নেহায়েৎ প্রয়োজন। আরব বিশ্বের এই দুই রাজধানী প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ বিশ্ব সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। উভয় শহরের কৃষ্টি সংস্কৃতির মান, তাতে বিদ্যমান পৌর সুবিধাদি, এবং সাধারনের সামাজিক জীবনও অগ্রগতিতে প্রতিপক্ষ খ্রীশ্চান ইউরোপের চেয়ে এগিয়ে ছিল। বাগদাদে হারুন আল রশীদের শাসন কাল পশ্চিমা খ্রীশ্চান জগতে শার্লেমনের সমসাময়িক। দুই সম্রাটের মধ্যে উপহার এবং দুত বিনিময়ও হয়। শার্লেমন হারুনকে প্রাচ্যদেশে বাইজান্টাইন শক্তির বিরুদ্ধে এবং হারুন শার্লেমনকে স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে প্রতি ভারসাম্য বিবেচনা করেছেন। তারপরেও হারুন এবং আরও বিশেষকরে তাঁর পুত্র আল মামুন জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক মাত্র নন , তাঁরা নিজেরাও বিশিষ্ট পন্ডিতজন। পক্ষান্তরে শার্লেমন এবং তাঁর পারিষদ বর্গ অধ্যাপক হিট্টির ভাষায় "তখনও নিজেদের নাম লেখার শিল্পকলা নিয়ে জেরবার হচ্ছিলেন"।

বাগদাদ এবং কর্ডোভা উভয় আমাত্য সভা ছিল ঝাঁকালো ; বিত্তবানদের মধ্যে এক সমৃদ্ধশালী , রুচিবান, বিলাসবহুল জীবনধারার সীলমোহর, যা অন্ততঃ পুর্বঞ্চলীয় রাজধানীতে ভোগ বিলাসী অমিতাচারী জীবনধারার ঝোঁক সৃষ্টি করে। সুরাপানে কোরাণের নিষেধাজ্ঞা (যা ইতোপুর্বে উমাইয়া শাসনামলে দামেস্কে অমান্য হতে শুরু হয়) স্রেফ কথার কথা হয়ে যায়। বাগদাদে খলিফা নিজেই সুরাসক্ত উত্তেজনায় নাচ গানের আসর বসাতেন। হারুন আল রশীদের প্রধান সভাকবি এবং অতি অন্তরঙ্গ বিখ্যাত আবু নাওয়াস গান এবং দ্রাক্ষারসে ওমর খইয়্যামের প্রতি অনুরাগ বাস্তবে ধারন করেছেন । রাজপ্রাসাদে ছিল কবি পন্ডিতের পাশাপাশি ভাঁড়, গায়ক এবং নর্তক-নর্তকীর উপচে পড়া ভীড়।

আনন্দ-উৎসব, শিল্পকলা এবং সামাজিক উৎকর্ষতার অব্যাহত চর্চার সাথে সাথে, মুদ্রার উল্টোপিঠে ক্রীতদাস ,খোজা, হারেমের সংখ্যা বৃদ্ধির দগদগে ক্ষত বেড়ে চলছিল। এতদসত্বেও আরব ঘটনা পঞ্জী লেখকরা ভিন্ন চিত্রের উল্লেখ অগ্রাহ্য করে, খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের অন্তঃপুরে যে ৪ হাজার রক্ষিতার কথা বলেন; তাও গীবন উল্লেখিত রোমান সম্রাটের মত সম্ভোগের জন্যে নয় বরং আড়ম্বর হিসেবেই ছিল। দশম শতাব্দী শেষ হওয়ার আগ পর্যান্ত বাগদাদে মহিলাদের পৃথকীকরণ তথা ভেদ বৈষম্য প্রকট হয়নি। আব্বাসীয় যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষদের পাশাপাশি অনেক আরব মহিলারাও নগরের রাজনৈতিক , সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশ নিতেন। তাদের কেউ কেউ কবিখ্যাতি, পান্ডিত্যেও বিখ্যাত হন।

খলিফার প্রাসাদ,এবং প্রধান মসজিদকে কেন্দ্র করে বাগদাদ তৈরী হয়েছে বৃত্তাকার ধরনে। নগরবাসীর পছন্দের পন্যসম্ভারে বাজার ভরে দিতে সাম্রাজ্যের চার কোনা থেকে চারটি সড়ক এসে শহরে মিলেছে। এই সড়ক সমুহ দিয়ে ,এবং ঘাটে ঘাটে বাণিজ্য তরীর ভীড় লেগে থাকতো। সমাজের উপরের স্তরে বণিক, রাজকর্মচারী, পন্ডিত এবং ক্রমবর্ধমান স্বাধীন পেশার প্রতিনিধিগন। লাইব্রেরী এবং পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন জ্ঞানপীঠে অনুবাদ এবং গবেষনার কাজ চলেছে অনবরত । শহরে ইহুদী খ্রীশ্চানদের, অধ্যাপক হিট্টির ভাষায় সময়ের চোরাকারবারীদের পরিচালনায় পানশালার প্রাচুর্য্য (বলা ভাল মদের প্রদর্শনী)ছিল, প্রকাশ্যে তারা স্বধর্মাবলম্বীদের আমোদ সরবরাহের ভান করলেও তাদের অদৃশ্য পৃষ্ঠপোষক ছিল মুসলিমরা। শহরে মসজিদ এবং হাম্মামখানার সংখ্যাধিক্য ছিল যদিও দ্বিতীয়টির ২৭০০০ সংখ্যা নেহায়েতই ইতোপুর্বে উল্লেখিত খলিফার রতিশক্তির উদাহরনের মত, আরব লিপিকারদের আড়ম্বরের অতিরঞ্জন হজমে অনুপান মাত্র। পাশাপাশি কর্ডোভায় ৩০০ হাম্মামখানার পরিসংখ্যান বিশ্বাসযোগ্যই শোনায়। এসব স্থাপনা এবং নগরবাসীর দৈনন্দিন ব্যবহারের জল সরবরাহে ৮ম শতকের শেষদিকে স্পেনে উমাইয়া যুবরাজ আবদাররাহমান নহর নির্মাণ করান। তবে দশম শতকে তৃতীয় আবদার রাহমানের শাসনামলে কর্ডোভা খ্যাতির শিখরে পৌঁছে এবং পশ্চিম ইউরোপে বিশ্ব রত্ন পরিচিতি পায়।

কর্ডোভার বিখ্যাত গ্রান্ড মসজিদ (যার নির্মাণ কাজ দেড়শত বছর পুর্বে প্রথম আবদাররাহমান শুরু করেন) এবং চারশত কক্ষ বিশিষ্ট খলিফার প্রাসাদ- আল জাহারা অন্যতম সেরা স্থাপত্য। সুদুর কন্সটান্টিনোপল থেকে পর্য্যন্ত এর খিলান, বেসিন ইত্যাদি আনা হয় । স্পেনে উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তৃতীয় আব্দাররাহমানই বাগদাদের খলিফাদের সাথে প্রকাশ্যে বিরোধে খলিফা উপাধি গ্রহন করেন । যে রাজদরবারে বাইজান্টাইন সম্রাট এবং ইউরোপীয় শাসকদের দুতেরা সসম্মানে গৃহীত হতেন তা জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতারও কেন্দ্র ছিল। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অনেক অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। সারা বিশ্ব থেকে সংগ্রহ করা পান্ডুলিপি ও পুস্তক সমৃদ্ধ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার সহ সতেরটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং অনেকগুলো বইয়ের দোকান ছিল বলে জানা যায়।

প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার বসত বাড়ির মধ্যে অসংখ্য মসজিদ ও রাজ প্রাসাদ সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। শহরে মাইলের পর মাইল আলোক সজ্জিত ,দু'ধার বাধানো সড়ক ছিল অথচ এর আট-নয় শত বছর পরেও লন্ডন প্যারিসের রাস্তা থেকে কাদা কিংবা অন্ধকার দুর হয়নি! সমকালীন প্রতিবেশী লিওঁ, নাভারে অথবা বার্সিলোনার খ্রীশ্চান রাজ্যসমুহের সাংস্কৃতিক মান- মর্য্যাদার হত দরিদ্র দশা এতখানিই স্বীকৃত ছিল যে রাজন্যবর্গের কোন গুনী স্থপতি বা চিকিৎসকের দরকার পড়লে আরব রাজধানীতেই তা খুঁজতেন। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়দের সম্পর্কে আরবদের দৃষ্টিভঙ্গী এতটাই খাটো ছিল যে তা টলেডোর এক বিচারপতির মন্তব্য-- 'তাদের মেজাজ শীতল এবং কৌতুক রুক্ষ,দেহের আকার বেড়েছে তবে রং হয়েছে হালকা , চুল দীর্ঘ। তাদের রসবোধে সুক্ষ্মতার এবং জ্ঞানে গভীরতার অভাব,তাদের মধ্যে মুর্খতা ও মুঢ়তা বিরাজমান'।

(৮)

ইতিহাসের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আরবদের অবস্থান। স্পেনে তাদের কীর্তি ঠিকে আছে কিন্তু নিজেরা সমুলে উবে গেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ মরক্কোতে তাদের অধঃস্তনদের শাসন করছে ফরাসী, স্পেনীয়রা। ত্রয়োদশ শতকে বাগদাদ ধ্বংস হয়েছে হালাকুর হাতে, তারই অধঃস্তন তৈমুরের হাতে দামেস্ক ধ্বংস হয়েছে পনের শতকে। তবুও সেখানে, বিশেষতঃ বাগদাদে (যেখানকার প্রাসাদগুলো আশ্চর্য্যরকম ভাবে সময় এবং হিংস্র বিজয়ীদের করুনা নির্ভর) কীর্তি সভ্যতাই শুধু ধ্বংস হয়েছে । জনগন ঠিকে ছিল অটোমনদের শাসনে বেঁচে থাকার জন্যে । মিশরে পাথরে তৈরী কীর্তি সমুহ মঙ্গোল আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেয়েছে, জনগন এবং ইমারত বেঁচে গেছে; যেমনটা হয়েছে জেরুযালেম এবং তিউনিসে। পুর্ণ শক্তিশালী এবং চমৎকার উত্থান-পতন দৃশ্যপটের দ্বৈত উৎস মক্কা, মদীনা দুর্বোধ্য পবিত্রতায় নিমজ্জিত হয়ে রইল বহুদুরে, পুন্যযাত্রার পবিত্র

সৌধ হিসেবে। শহরের যাযাবর বাসিন্দারা শহর দু'টিতে এবং তার চতুপার্শ্বে বসবাস ও বিচরন করতে থাকলো।

অটোমনদের কায়রো দখলের পর আরো তিন শতাব্দীর প্রয়োজন হল আরবজীবনে নুতন উষার আলো পড়তে।

(৩)

আরব রেনেসাঁ

কেউ যদি আরবদের এই দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠার দিন ক্ষণের খোঁজ নিতে যায় তবে সেটা হবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশরে পা রাখার দিন–১৭৯৮ সাল। নুতন উদ্যোগ ও আবিষ্কারের সজীব পথে চিন্তার সামর্থ্য হারিয়ে, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচারে জড়বৎ আরবরা সেইদিন তক মধ্যযুগের বাসিন্দা। সৃষ্টিশীল রচনার স্পৃহা ব্যাকরণের নিয়ম নিয়ে দীর্ঘদিনের মতবিরোধে নিমজ্জিত। ধর্মে বদ্ধমুল সংকীর্নতা ও গোড়ামি জেঁকে বসেছে। চর্বিত চর্বন ই জ্ঞানের চর্চা বিবেচিত হয়েছে। তত্ব, নুতন ধারনার বদলে ফাঁপা বুলির কদর বেড়েছে। ইবনেসিনা, আল ফারাবি, আল গাজালি এবং অন্যান্য চিন্তাবিদদের পঠন পাঠন দীর্ঘ দিন ধরে স্তব্দ। বহুগামীতা, রক্ষিতাপ্রথা এবং লিঙ্গ বৈষম্য সংখ্যাগুরু মুসলিম নারীদের মর্য্যাদাহীন করেছে; ফলে সন্তানদের বেড়ে উঠার পরিবেশ হয়েছে অস্বাস্থ্যকর , পুরুষদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে ভারসাম্যহীন সামাজিক জীবন। বিজিত জনগনের জন্যে তরবারির ডগায় করে হলেও যে সমস্ত আত্মিক উৎকর্ষতা বিজয়ীরা এনে থাকে অটোমন সামরিক রাজনৈতিক প্রতিভা আরবদের জন্যে সেরকম কিছুই আনেনি। অনুরূপভাবে অটোমনরা নিজেরাও আরব ঐতিহ্য থেকে সমৃদ্ধ ,উর্বর হয়নি যেভাবে রোমানরা সমৃদ্ধ হয়েছিল গ্রীসে, জার্মানরা রোমে। অধিকন্তু সপ্তদশ শতকের পর অটোমন শাসন অর্থনৈতিক বিচারে পুরোপুরি নির্য্যাতন ও নিষ্পেষনমুলক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আরব জগৎ চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয়। এই দারিদ্র্যেরই ফসল বদ্ধমুল অজ্ঞতা আর আত্মিক বন্ধ্যাত্ব।

ইতোমধ্যে ইউরোপীয়রা রেনেসাঁ এবং সংস্কার অর্জন করে ফেলেছে,যাদের মধ্যে একদা টলেডোর বিচারপতি দেখেছিলেন "রসবোধে তীক্ষ্নতার অভাব এবং জ্ঞানের গভীরে যেতে পারার ব্যর্থতা"। ভারত এবং নুতন পৃথিবীর দিকে বিখ্যাত জলপথ আবিষ্কার করে ভূগোলকের সর্বত্র তারা রাজকীয় নৌবহর নিয়ে উপস্থিত। সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞান বিপ্লব, অষ্টাদশ শতকের নব জাগরন করায়ত্ব করে যখন তারা শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তারই এক পর্য্যায়ে নেপোলিয়নের মিশরে পদার্পন। নেপোলিয়নের অভিযান সামরিক অভিযানের চেয়েও বেশী গুরুত্বপুর্ন কারন এটা ছিল আরব বিশ্বের অন্তঃপুরে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ। অনুপ্রবেশের এই স্রোতে অনেক পন্ডিত ও বিজ্ঞানী আরবে আসেন; তাঁদের একজন শ্যামপলিঁয় প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন, প্রকৌশলীরা সুয়েজ যোজক ভেদ করে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত করার প্রকল্প যাচাই করেন। এসবের সাথে প্রথম ছাপাখানাও মিশরে এসে পৌঁছে।

নেপোলিয়নের অভিযানের আরও ফল দেখা যায় মোহাম্মদ আলীর উজ্বল কর্মজীবনে। ভবিষ্যতে আধুনিক মিশরের নির্মাতা এবং সিরিয়া, আরব এবং সুদান নিয়ে আধুনিক আরব সাম্রাজ্যের প্রায় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এই অনারব প্রতিভার হাতেই ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিল নুতন আরব যুগের উষা। মোহাম্মদ আলী ছিলেন মিশরে ফরাসী আগ্রাসন ঠেকাতে আসা অটোমন সেনা বাহিনীর এক আলবেনীয় অফিসার। মিশর তখন কয়েক শতাব্দী যাবৎ নাম মাত্র অটোমন সুলতানের কর্তৃত্বে, বাস্তবে স্থানীয় মামলুক সেনা গোষ্ঠী দ্বারা শাসিত।

নেপোলিয়ন বাহিনী আক্রা না পৌঁছা পর্য্যন্ত অটোমন শক্তি কোন কার্য্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি কিন্তু মোহাম্মদ আলী তার সাথে আসা সেনাবাহিনীতে সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত প্রভাব গড়ে তুলছিলেন । তিনি এতে এতটাই সার্থক হন যে ১৮০১ সালে ফরাসীরা শেষ পর্য্যন্ত মিশর ত্যাগ করলে মোহাম্মদ আলী অটোমন সুলতানের প্রতি মৌখিক আনুগত্য বজায় রেখে প্রকৃত শাসক হতে বিলম্ব করেননি। পরবর্তী ৪০ বছর তিনি এবং তাঁর পুত্র ইব্রাহিম পাশা নুতন নুতন অঞ্চল জয় করে,ইউরোপীয় শক্তির সাথে বিবাদ অব্যাহত রেখে (বিশেষ করে পামার স্টোনের বৃটেনের সাথে), অটোমন সুলতানের প্রতি হুমকি হয়ে এবং আরব হৃদয়ে নানা উৎসাহ উত্তেজনা ছড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট জুড়ে থাকেন।

প্রথমতঃ মোহাম্মদ আলী ফরাসীদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতায় অভিভূত হয়ে মিশরে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো তৈরীতে অনেক ফরাসীদের নিয়োগ দেন এবং ইউরোপীয় কলাকৌশল শিক্ষা করতে মিশরীয় ছাত্র দের ফ্রান্সে পাঠান। তাঁর অনেক পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হলেও তিনি ইউরোপের সাথে একটি সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এভাবে আরব পুনরুত্থানের পথে মুল স্রোতধারার পথন ঘটে। আরব বিশ্বে ইউরোপের সৃষ্টিশীল প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় নেপোলিয়নের অভিযান এবং তার ফলস্বরূপ মোহাম্মদ আলীর রাষ্ট্র নীতিতে। পরবর্তীতে তা আরও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় মিশর ও লেভান্ট (ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরের অঞ্চল) এলাকায় ফরাসী , মার্কিন ও বৃটিশ মিশন স্কুল সমুহ , এবং ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি মামলুক শাসনের অবসান ঘটিয়ে তুর্কিদের হাত থেকে মিশরের কার্য্যকর স্বাধীনতা আদায় করে এবং তাকে জাতি-রাষ্ট্রের রূপ দিয়ে পরবর্তীসময়ে মিশরীয় জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের পথ সুগম করেন; যদিও পরবর্তীতে , এবং দৃশ্যপটে বৃটিশদের আবির্ভাবের পুর্বে, মোহাম্মদ আলীর বংশতন্ত্র তথা তুর্কি অভিজাততন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী সরকার এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আরবী ভাষাভাষী মিশরীয় জনগনের প্রতিবাদের মধ্যদিয়েই সেই জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে।

তৃতীয়তঃ মোহাম্মদ আলীর শাসনকালে তাঁর উচ্চাভিলাষী, দুরদর্শী নীতির ফলে অটোমন শাসন থেকে আরবদের স্বাধীনতা এবং তদস্থলে নুতন সাম্রাজ্য কিংবা পূর্বাঞ্চলীয় আরব বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত রাষ্ট্রের ধারনার বীজ প্রথম বপিত হয়। মজার বিষয় এইযে স্বয়ং সুলতানের পরামর্শে মোহাম্মদ আলী যে নীতি প্রয়োগ করেন তাতে বৃটেন এবং রুশ হস্তক্ষেপ (ফ্রান্স তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল) না এলে খুব সম্ভব তিনি খোদ কন্সটান্টিনোপলে বিজয়ী রূপে আরবদের নুতন সম্রাট হতে পারতেন।

আরবে ওয়াহাবি (আদি ইসলামী যুগের কঠোরতায় ফিরে যেতে চায় এমন এক শুদ্ধাচারী গোষ্ঠী) এবং সউদ পরিবারের (বর্তমান রাজ পরিবার) মধ্যেকার জোট উনবিংশ শতকের গোড়াতেই ইরাক, সিরিয়ায় তুর্কি অবস্থানে হুমকি সৃষ্টি করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে। সুলতান তাঁর অনুগত প্রতিনিধি হিসেবে মোহাম্মদ আলীকে চাপ দেন আন্দোলান দমন করতে। সুলতানের কথামত মোহাম্মদ আলী ১৮১১ সালে সেনাবাহিনী পাঠান। দীর্ঘ সাত বছর অভিযান চালানোর পর তাঁর পুত্র ইব্রাহিম ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে চরম সাফল্য অর্জন করে। এর কিছুদিন পর 'মোরিয়া'য় গ্রীক প্রজাদের বিদ্রোহ দমনে সুলতান আবারও মোহাম্মদ আলীর সাহায্য চাইলে মোহাম্মদ আলী আবারও সসৈন্যে ইব্রাহিমকে পাঠান তবে এবার ইব্রাহিম বিজয়ী হলে পুরস্কার হিসেবে মোহাম্মদ আলী সুলতানের কাছে সিরিয়ার কর্তৃত্ব চান। সুলতান তা প্রত্যাখ্যান করলে তিনি সিরিয়া অবরোধ করতে ইব্রাহিমকে পাঠান। অটোমন শাসনে অতিষ্ট খ্রীশ্চান মুসলিম নির্বিশেষে সিরীয় আরবরা অনেক আশা

ভরসা নিয়ে ইব্রাহিমকে স্বাগত জানায় এই বিশ্বাসে যে মোহাম্মদ আলী এবং তাঁর ছেলে তাদের জন্যে স্বাধীনতা আনবেন।

১৮৩৩ সালে বৃটেনের জোরালো হস্তক্ষেপেই কেবল ইব্রাহিমকে কন্সটান্টিনোপলের দ্বার থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করে । তা সত্বেও সাত বছর ধরে ইব্রাহিমকে পিতার পক্ষে সিরিয়ার গভর্ণর থাকতে দেয়া হয় । এরপর আবারও বহিঃশক্তি সমূহের হস্তক্ষেপের ফলে ইব্রাহিম দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলে করভারে জর্জরিত জনগন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ইতোমধ্যে অন্যত্র অধিকতর শক্তিশালী মিশরীয় অবস্থান সৃষ্টি হয়। গজদন্ত, সোনা দানা এবং নুতন রিক্রুটের সন্ধানে ১৮২০ সালে মোহাম্মদ আলী তাঁর আরেক পুত্রকে সুদান জয় করতে পাঠান। সুদান দেশটির উত্তরার্ধ আরব অধ্যুষিত। কয়েক শতাব্দী আগে মিশর থেকে আরবদের আক্রমন এবং তদানুসঙ্গিক স্থানীয়দের সাথে আন্তঃবিবাহের ফলে সেখানে এক মিশ্র জনগোষ্ঠীর জন্ম হয় যারা মাতৃভাষা হিসেবে আরবীতে কথা বলে এবং ইসলাম ধর্ম মেনে চলে অর্থাৎ বলা যায় আংশিক নিগ্রো গঠন এবং গাত্রবর্ণ সত্বেও আরবীকৃত জনগন।

মোহাম্মদ আলীর সেনাদল দেশটি জয় করে উত্তরাঞ্চলীয় আরব এলাকার সাথে নিরক্ষীয় আফ্রিকার এক বিরাট অংশও যুক্ত করে নেয়- যার অতি আদিম অধিবাসীরা নিগ্রো গোত্রের এবং তাদের ভেতর সাংস্কৃতিক কিংবা নৃতাত্বিক কিছুই আরবী নেই। এভাবেই আজকের সুদান রাজনৈতিক বাস্তবতায় পদার্পন করে। সুদানে মোহাম্মদ আলী মিশরীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন; সিরিয়া এবং আরবের মত এখানে তাঁর শাসন অটোমন সুলতান কিংবা ইউরোপীয় বাধার মুখে পড়েনি । দুর্নীতিপরায়ন , জুলুমবাজ হওয়া সত্বেও মোহাম্মদ আলীর বংশধরদের সুদান শাসন ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত টিকে থাকে। ওই বছর ইতিহাস খ্যাত মোহাম্মদ আহাম্মদ আল মাহদীর বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তা শেষ হয় কিন্তু ১৮৯৮ সালে বৃটিশদের সহযোগীতায় (ইতোমধ্যে মিশরেও যারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়) তা আবার পুনরুদ্ধার হয় এবং মিশর সুদান ঐক্যের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে।

মোহাম্মদ আলী শুধু অনারব ছিলেন তা নয়, তিনি আরবী বলতেনওনা। আরব সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় আরব জাতীয়তাবাদ কিংবা স্বাধীনতার বিষয়ে তাঁর কোন মাথাব্যাথা ছিলনা। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল সুলতানের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া। কিন্তু তাঁর এই বিশাল লক্ষ্য অর্জনের প্রধান হাতিয়ার ইব্রাহিমের ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল অন্যরকম। ইব্রাহিম অপ্রাপ্ত বয়সে আরব দেশে আসেন, আরব পরিবেশে বড় হন,আরবী বলতেও পারতেন দ্রুত; অধিকন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে , সিরিয়ার শাসনকর্তা থাকাকালীন স্থানীয় আরব জনসাধারনের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে শাসক হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পিতা মোহাম্মদ আলীর চেয়ে ভিন্নতর হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক এন্টনিয়াসের মতে- তিনি আবেগ এবং নীতির ক্ষেত্রে আরব ঐতিহ্যের সাথে নিজেকে তুলে ধরতে চাইতেন এবং ভাবতে চাইতেন তাঁর স্বপ্নের আরব সাম্রাজ্য আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এভাবে তিনি বাস্তবতার চেয়ে বরং ভবিষ্যৎ স্বপ্নেই বিভোর থাকেন। পক্ষান্তরে জনগন ব্যাপক আনন্দোল্লাসের মধ্য দিয়ে তাঁকে বরন করলেও রাজনৈতিক আন্দোলন উৎসাহিত করার মত আরব গণসচেতনতার উন্মেষ তখনও ঘটেনি, এবং ইতোপূর্বে সিরিয়ায়ও দেখা গেছে প্রাথমিক উচ্ছাস শেষে বিদায় বেলা জনগন তাঁর শাসনকে গাল-মন্দ করেছে। তবে যত অসময়েই হোক ইব্রাহিমের লক্ষ্য এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পিতা মোহাম্মদ আলীর গৃহীত পদক্ষেপ সমুহ পরবর্তীতে আরবদের সম্ভাবনার বীজ বপন করেছে। সাত বছর ধরে অটোমন শাসন থেকে সিরীয় আরবদের স্বাধীন জীবন যাপনের অভিজ্ঞতাই স্বপ্নাতীত সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। মোহাম্মদ আলীর উত্থানই ব্যাখ্যা করে সমকালীন ইউরোপীয় সামরিক শক্তির

বিচারে তো বটেই আভ্যান্তরীন প্রতিবাদ বিদ্রোহের মুখেও অটোমন সাম্রাজ্যের কাঠামো কতোটা ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে।

মোহাম্মদ আলীর বিদ্রোহই অটোমন সাম্রাজ্য কাঠামোয় একমাত্র আঘাত নয়, বরং আরবে ওয়াহাবিদের আক্রমন ছিল 'আরবইজম'র কেন্দ্রবিন্দু থেকে খাঁটি আরবনেতাদেরই আক্রমন; যা মোহাম্মদ আলীর সহায়তায় সুলতান দমন করতে পেরেছেন। অতঃপর এই দুই চ্যালেঞ্জই খুব শিঘ্রই আরব গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এসেছে। যতটা না সেনা শাসকদের শোষনের ফলে তারও বেশী নিজেদের সাংস্কৃতিক পুনরাবিষ্কারের বার্তাই শতাব্দীর শেষার্ধে আরব বিশ্ব জুড়ে জাতীয় চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলতে শুরু করে। ইতোমধ্যে মিশরের আধুনিক রাষ্ট্রে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মিশরীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ , কয়েক দশক সমান্তরালে চলার পর তা আরব জাতীয়তাবাদকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় আবার আরবজাগরনের জোয়ারে দুটোই একত্রে বেড়ে উঠতে থাকে। সুতরাং এক্ষণে মিশরের দিকে দৃষ্টি দেয়া বাঞ্ছনীয় ।

(২)

১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী দখলদারীত্বের প্রতিক্রিয়ায় মিশরীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। পরবর্তী শতকে তা তুর্কি অনুগামী মোহাম্মদ আলী ও তার বংশধরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং শেষাবধি তা বৃটিশ জবর দখল এবং ইউরোপীয় শক্তির খবরদারী (আর্থিক এবং আইনী সুবিধা ভোগের মাধ্যমে)র বিরুদ্ধে ধাবিত হয়। ইউরোপীয় প্রভাবে আধুণিকীকরন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা (সুয়েজ খাল খনন ব্যয়ের অর্ধেক বহন করে মিশর সরকার), এবং অংশতঃ জাঁকালো আড়ম্বরের ফলে মেহাম্মদ আলী পরবর্তী মিশরের শাসকেরা লন্ডন ,প্যারিসের পুঁজিপতিদের কাছে অতিমাত্রায় ঋনী হয়ে পড়লে আভ্যান্তরীন বিষয়ে ইউরোপীয়দের হস্তক্ষেপের দ্বার খুলে যায়। খেদিব ইসমাইলের রাজত্বে (১৮৬৩-৭৯) দেশের অর্থনীতির উপর ঈঙ্গ-ফরাসী দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পায় এবং বিশেষ পন্থায় মিশরীয় বৈদেশিক ঋণের সুদ উশুলের ব্যবস্থা করা হয়। এই অর্থনৈতিক বশ্যতা নুতনরূপ ধারন করে।

ইউরোপীয়দের জন্য এরকম সুবিধাদি ক্রুসেডের সময় প্রথম প্রবর্তিত হয় এবং পরে তা অটোমন সুলতানেরাও সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় নাগারিকদের জন্যে চালু রাখেন। এই ব্যবস্থায় স্ব -স্ব সরকারের অনুমতিক্রমেই শুধু ইউরোপীয় নাগরিকদের উপর করারোপ করা যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারের এক্তিয়ারও 'কন্স্যুলার কোর্টে'র। ইসমাইলের রাজত্বে ইউরোপীয়রা জড়িত এমন সব ফৌজদারী মামলার জন্যে ইউরোপীয় এবং মিশরীয় বিচারকদের সমন্বয়ে 'মিশ্র আদালত' গঠন করা হয়। শেষতঃ ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খনন সমাপ্তির মধ্য দিয়ে মিশরীয় পরিস্থিতিতে নুতন এক উপাদান সংযোজিত হয়। ভারতে যাওয়ার সহজ পথে এই খাল বৃটিশ শক্তির নিয়ন্ত্রনে না থাকলে মিশর বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এ' চিন্তা বৃটেনকে মিশর দখলের সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করে।

১৮৮২ সালে , সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা আরাবী নামের এক সেনা অফিসারের নেতৃত্বে গড়ে উঠা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইসমাইল পুত্র খেদিব তওফিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, শেষাবধি তিনি সুলতান কতৃক বহিস্কৃত হন এবং বহিঃশক্তির চাপে ইতালীতে নির্বাসিত হন। আরাবীর বিদ্রোহ একদিকে ছিল প্রশাসনের সামরিক বেসামরিক উভয় বিভাগে উঁচু পদ সমূহে জেঁকে বসা তুর্কি গোষ্ঠীতন্ত্রের একক আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান রাজনীতি সচেতন মিশরীয়দের আঘাত স্বরূপ। অন্যদিকে এটা ছিল মিশরের আভ্যান্তরীন বিষয়ে যে কোন বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ধারনা করা যেতে পারে বৃটিশ এবং ফরাসী

প্রতিনিধিগণ ইচ্ছাকৃতভাবে এ'আন্দোলনের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন , এমনকি কোন কোন লেখকের মতে তাঁরা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী হিসেবে সঙ্কট বৃদ্ধিতেই সহায়তা করেছেন যাতে আরো খোলামেলাভাবে আরো শক্তিশালী ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

আলেকজান্দ্রিয়ায় বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা এবং প্রাণহাণির পর , দাঙ্গা দমনে বৃটেন নাম মাত্র খেদিবের পক্ষে ফ্রান্স ও ইতালীর সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হলে তাদের অসম্মতিতে একাই বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে আসে। বৃটিশ রণতরী থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্গে বোমা ফেলা হয়, মিশরে বৃটিশ পদাতিক বাহিনী নামে । আরাবি পরাস্ত হন। বৃটিশ দখলদার বাহিনী মিশরে থেকে যায়, যা পরবর্তী আরো অনেক বছর পরে ১৯৫৪ সনের গ্রীষ্মে মিশর এবং বৃটেনের মধ্যেকার সম্পাদিত চুক্তিবলে মিশর ছেড়ে যেতে শুরু করে।

ক্রুসেডের পর পূর্বঞ্চলীয় আরব বিশ্বে বৃটেন কর্তৃক মিশর জবর দখলই হচ্ছে প্রথম জোর পুর্বক এবং দীর্ঘস্থায়ী ইউরোপীয় অভিঘাত (নেপোলিয়নেরটার স্থায়ীত্ব ছিল তিন বছর)। বৃটিশদের মিশর দখলের এক বছর আগে পশ্চিম আরববিশ্বে ফরাসীরা ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া এবং ১৮৮১ সালে তিউনিসিয়া দখল করে। দামেস্ক এবং মাউন্ট লেবাননে সংঘটিত হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে সেখানকার খ্রীশ্চান সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি সমুহের সম্মতিতে ১৮৬০ সালে লেবাননে সেনাবাহিনী পাঠায়। ফরাসী বাহিনী এসে পোঁছার আগে তুর্কি কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেও ফরাসীরা 'লেভান্ট' এলাকায় স্থায়ী ঘাঁটি গাঁড়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। অন্যদিকে বৃটেনের নেতৃত্বে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ – লেবাননের স্বায়ত্বশাসনে সম্মিলিত ইউরোপীয় শক্তির গ্যারান্টিতে সুলতানের সম্মতিক্রমে, সেখান থেকে ফরাসী সেনা প্রত্যাহারে জেদ ধরে।

আরবদেশসমুহের জন্যে এসব ঘটনা মুলতঃ নুতন যুগের অশুভ ইঙ্গিত। এতে আছে অটোমন সাম্রাজ্যের দিন ফুরোবার গল্পের প্রথম অধ্যায়, এবং আরবদের পুর্ন স্বাধীনতা লাভের আগে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে ইউরোপীয় শক্তিসমুহের আরবদেশ শাসনের মধ্যবতী যুগের সুচনা সংকেত। এই মধ্যবতী সময়ে মিশরেই পশ্চিমা শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বজ্রনাদী, দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে। এই আন্দোলনের চরিত্রই এমন যে তা ইউরোপীয় ধ্যান ধারনা থেকেই যথেষ্ট পরিমানে উৎসাহ উদ্দীপনা আহরন করে; যেহেতু পশ্চিমারা মধ্যপ্রাচ্যে সেনাবাহিনীর সাথে সাথে শিক্ষক এবং বই-পত্রও রফতানী করেছে। মোহাম্মদ আলী এবং তাঁর বংশধরদের শাসনকালে মিশরে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনেক স্কুল স্থাপিত হয়। সুতরাং উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা,গণতন্ত্র ইত্যাদি ধারণাগুলো সীমিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যে আগে থেকেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে; প্যারিসে শিক্ষিত খেদিব ইসমাইলের ইউরোপীয়করণ নীতির ফলে তা আরও গতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

(৩)

সমান্তরালে আরেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরনের আন্দোলন শুরু হয়েছে সিরিয়ায়,এবং বিশেষতঃ লেবাননে। ইব্রাহিম পাশা তাঁর শাসনকালে দেশে মার্কিন,ফরাসী মিশন স্কুল খোলার অনুমতি দেন। কয়েক বছরের মধ্যেই বৈরুতে ৩০টিরও বেশী স্কুল এবং অসংখ্য ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬১সালের দিকে এই প্রতিযোগীতা এতবেশী অগ্রসর হয় যে, আমেরিকানরা সিরিয়ান প্রটেস্ট্যান্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করে পরবর্তিতে যা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুত নামে খ্যাতি অর্জন করে। এর কয়েক বছর পর একই শহরে 'জেসুইট'রা প্রতিষ্ঠা করে সেন্ট যোশেফ ইউনিভার্সিটি, ইতোপুর্বে যা তারা লেবাননের অন্যত্র সাধারনভাবে স্থাপন করেছিল। পর্য্যায়ক্রমে ইংলিশ, স্কটিশ,জার্মান এমনকি রাশান স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই

মূল প্রভাব থেকে যায় আমেরিকান এবং ফরাসীদের। মুসলিম,খ্রীশ্চান নির্বিশেষে সব আরবের জন্যেই স্কুলগুলো খোলা থাকলেও স্বভাবতঃই প্রাথমিক ভাবে মূল চাহিদা এসেছে খ্রীশ্চানদের কাছ থেকে।

শুরু থেকেই আরবদের প্রতি মার্কিন এবং ফরাসী শিক্ষাউদ্যোগের মধ্যে লক্ষ্যনীয় ভিন্নতা দেখা যায়। ফরাসী স্কুলগুলোর উদ্দেশ্য মুলতঃ লেবাননের খ্রীশ্চান সম্প্রদায়কে পোষন করা; ফরাসী ভাষা শেখানো, ফরাসী সংস্কৃতির প্রসার এবং আরব 'মেরনাইট' ও ক্যথলিক খ্রীশ্চানদের ফ্রান্সের সাথে যুক্ত করা । ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়েরও একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ খ্রীশ্চান অধ্যুষিত লেবানীজদের জন্যে স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করা এবং শেষাবধি তা তেমনই থেকেছে। শিক্ষার গুণগত মান বিচারে ফরাসীদের অর্জন আমেরিকানদের চেয়ে বেশী। আমেরিকান স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিপরীতে ফরাসীরা শুধু লেবানীজ এবং সিরীয় ছাত্রদের শুধু ফরাসী ভাষা দক্ষতাই (চূড়ান্ত স্তরে যা তাদের ফরাসীদের সাথে পরিপুর্নভাবে সমান মুল্যায়ন করে) দেয়নি অধিকন্তু এখানকার ছাত্ররা তাদের মার্কিন স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের তুলনায় নির্ভেজাল উচ্চতর পান্ডিত্যও অর্জন করে; এবং পশ্চিমের অনুপ্রেরনায় আরব বুদ্ধিবৃত্তির জাগরনে তারা আরবদের পশ্চিমের আত্মার অধিকতর গভীরে নিয়ে যেতে সমর্থ হয় যা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পারেনি।

তবে আরব পুনর্জাগরন বহুলাংশে পশ্চিমা সংস্থাসমূহ মারফত যাত্রা শুরু করলেও পশ্চিমা উৎসই এর একমাত্র ভিত্তি কিংবা প্রেরনার উৎস ছিলনা। আরবদের নিজেদের ভাষা এবং অতীত সংস্কৃতির প্রানবন্ত উত্তরাধিকার যা তাদের চিন্তা চেতনার পুনর্জাগরন ঘটাতে এবং তাদের মধ্যে ইউরোপ,তুর্কির সমানে সমান আত্মসম্মান বোধ জাগাতে সর্বোপরি আরব হিসেবে নিজের পরিচয় দেবার সম্বিত পুনঃ ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। এই ক্ষেত্রেই আমেরিকানরাই আরবদের সেরা সাহায্য করেছে। ধ্রুপদী আরবীর পুনঃপ্রবর্তন এবং তা আধুনিক চাহিদায় প্রয়োগের উপর জোর দিয়ে; আরবী বই পুস্তক প্রকাশ এবং প্রচারের মাধ্যমে তারা আরবদের হারানো অতীত পুনঃ আবিষ্কারে সহায়তা করে। বৈরুতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় পুরো মধ্যপ্রাচ্যের (মিশর বাদে,সেখানে নিজেদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল) মূল শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। কালপ্রবাহে লেবাননতো বটেই ফিলিস্তিন, জর্দান, ইরাক, সিরিয়া থেকেও অধিক সংখ্যায় ছাত্র আসতে থাকে এবং তাদের মধ্যে খ্রীশ্চানদের চেয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বেশী।

কিন্তু এখনও বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরব বুদ্ধিবৃত্তিক রেঁনেসার সব কথা বলা হয়নি। সে সময় লেবানীজ খ্রীশ্চানরা একই ভাষা এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে আরবী শিক্ষা এবং আরব জাতীয় চেতনাবোধের পুনর্জাগরনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বাইরে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছেন। বলা বাহুল্য মিশরে জামালুদ্দিন আফগানীর আন্দোলনের মত ভাষার বদলে ধর্ম আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলে তাতে আরব খ্রীশ্চানদের কোন ভূমিকা থাকতোনা। তাঁদের জন্যে একমাত্র সুযোগ সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উপস্থাপন করা। আরব ঐতিহ্য এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যেকার বর্ননাতীত নিবিড় সম্পর্কের কারনে এটা কঠিন হলেও খ্রীশ্চান সংখ্যালঘুদের জন্যে অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখার ক্ষেত্রে এটাই ছিল উত্তম সুযোগ। তবে এর অর্থ এ নয় যে, আরবী শিক্ষার পুনঃজাগরনের ক্ষেত্রে লেবানীজ খ্রীশ্চানদের আগ্রহ খাদ যুক্ত। বাস্তব বরং ঠিক উল্টো - আরবী ততটাই তাদের ভাষা যতটা মুসলিম আরবদের ।

তাদের আনন্দ ও গর্ব যে ইয়াজিজি ও বোস্তানীর মত (কাকতালীয়ভাবে তাঁরা উভয়েই সংখ্যাগুরু মেরোনাইট খ্রীশ্চান গোত্র ভুক্ত এবং ফ্রান্স কতৃক বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত) যত পন্ডিত , শিক্ষকের নিখাদ শ্রমের বিনিময়ে এর

সাহিত্যের পুনর্জাগরনে এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের শক্তিতে; যেমন নিখাদ তাদের আশা সার্বজনীন আরব পরিচয়ে তাঁরা এবং মুসলিমরা উভয়ের কাছে বিষাক্ত বিস্বাদ অটোমন সাম্রাজ্যের বন্ধন মোচনে বিশেষত: দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের জমানায় উন্নতির পথে জগদ্দল অন্তরায় অপসারনে একটি আন্দোলনের ভিত্তি পাবেন। ১৮৮০র দিকে বৈরুতে খ্রীশ্চান, মুসলিম এবং দ্রোজদের সমন্বয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের মধ্য দিয়ে এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

তারা আরবীকে দাপ্তরীক ভাষা হিসেবে ব্যবহার, প্রকাশনার উপর সেন্সরশীপ বাতিল, সিরিয়া এবং লেবাননে স্বায়ত্ব শাসন প্রদানের দাবীতে বৈরুত এবং অন্যান্য শহরে পর্যায়ক্রমে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে। তিন বছর পর তুর্কি গোয়েন্দা পুলিশের কার্যক্রমে তারা সতর্ক হন এবং এক পর্যায়ে সংগঠন বিলুপ্তকরে নেতৃবৃন্দ মিশরে চলে আসেন । মিশরে সবে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, নুতন এবং অধিকতর খোলামেলা পরিবেশে আরব সাংস্কৃতিক এমনকি জাতিয়তাবাদী কর্মকান্ডের পথও খোলা ।

শুধুমাত্র এই আরব জাতীয়তাবাদীরাই যে মিশরের পথ ধরেন তা নয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সিরিয়া,লেবানন থেকে বর্ধিত সংখ্যায় অভিবাসনকারীরা আমেরিকায় পাড়ি জমাতে শুরু করে। এই অভিবাসনকারীদের মধ্যে খ্রীশ্চানদের সংখ্যা বেশী। যে সব ভাবনা চিন্তা থেকে তারা দেশত্যাগ করেছে কিংবা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে তার অনেকটাই মুসলিম আরবদের কাছে অজানা। মুসলিমদের কাছে অটোমন শাসন, এমনকি তার চরম ক্ষতিকর পর্যায়েও অন্ততঃ ইসলামী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন হিসেবে কিছুটা মুখ রক্ষার ব্যাপার ছিল পক্ষান্তরে আরব খ্রীশ্চানদের কাছে সাধারণ দুর্নীতি, নিষ্পেষন, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের চেয়ে তুর্কিরাও মুসলিম এই বাস্তবতাই তাদের শাসনকে অধিকতর ঘৃণার্হ করেছে। সর্বোপরি এ সব অভিবাসনকারীদের সামনে বাইরের খোলা পৃথিবী খ্রীশ্চান পৃথিবী, মুসলিম আরবদের চেয়ে তাদের কাছে তা স্বাভাবিক ভাবেই অধিকতর আকর্ষনীয়।

বাড়ির কাছেই মিশরে (পরবর্তিতে সুদানেও) বৃটিশ দখলদারীত্ব অটোমন প্রজা সিরীয় এবং লেবানীজ আরবদের জন্যে নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধানে অভিবাসনের জন্যে নুতন এক রাজ্যের দ্বার খুলে দেয় । এখানেও অধিকাংশ অভিবাসী খ্রীশ্চান যেহেতু যে শাসক শক্তির কাছে তারা নিরাপত্তা (এবং চাকুরী) চাইতে এসেছে তারাও খ্রীশ্চান। সিরীয় এবং লেবানীজ আরবদের যে কয়েক প্রজন্ম প্রথমদিকে পশ্চিমা মিশনারীদের সহায়তার সদ্ব্যবহার করে স্বাভাবিকভাবে তারা খ্রীশ্চানই। পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত এই শ্রেণীই মিশর, সুদানে মূল অভিবাসী। তারা বৃটিশ প্রশাসনে অনেক বছর যাবৎ ডাক্তার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসেব রক্ষক, কেরানী তো বটেই প্রথমদিকে বৃটিশ শাসক এবং তার ইংরেজী না জানা প্রজাদের মাঝখানে দোভাষী, মধ্যস্থতাকারীর কাজও করেন।

রাজনীতির মাঠে অন্ততঃ প্রথমদিকে এই খ্রীশ্চান আরব অভিবাসীরা মিশরীয় জাতীয়তাবাদের মূলস্রোতে প্রবেশ করেনি। মুলতঃ সেখানে বৃটিশরা ছিল বলেই তারা মিশরে আসে এবং তাদের মধ্যে বৃটিশ পক্ষে পরিচয় দেয়ার ঝোঁক, দেশ দখলে রাখতে বৃটিশদের সমর্থন জোগানোর প্রবনতা ছিল । অধিকন্তু পরবর্তিতে তাদের কেউ কেউ মিশরীয় জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা আপন করে নিলেও দেখতে পায় যে মিশরীয়রা নাগরিক হিসেবে তাদের ঘৃণার চোখে দেখে। মিশরে প্রতিষ্ঠিত একজন সিরীয় অথবা লেবানীজ মুসলিম এক প্রজন্মেই সামাজিকভাবে মিশে যেতে পারে পক্ষান্তরে তার খ্রীশ্চান প্রতিপক্ষ যদি তার পুর্বপুরুষ মিশরে জন্মগ্রহনও করে থাকে তবুও সে সবসময় বিদেশী বিবেচিত হয়।

সাংস্কৃতিক দিকে অবশ্য সিরীয় (এবং বিশেষতঃ লেবানীজ) খ্রীশ্চানরা মিশরীয় আন্দোলনের মধ্যে মিশে যেতে থাকে, এমনকি তাদের কেউ কেউ তাতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকাও পালন করে। লেবানীজ খ্রীশ্চান আরবেরাই মিশরের প্রথম সংবাদ পত্র এবং ম্যাগাজিন সমুহের (যার অনেক গুলোই মিশরে তো বটেই পুরো আরব প্রকাশনা জগতে আজও শীর্ষ স্থানীয়) মালিক, সম্পাদক ।

দু'টি সবিশেষ গুরুত্বপুর্ন বিষয় আরব বুদ্ধিবৃত্তি এবং সাহিত্যের পুনর্জাগরন সম্ভব করে তোলে : নবী (দ:) র সময়কাল থেকেই পবিত্রতার কারণে অপরিবর্তনীয় হিসেবে কোরাণ সংরক্ষণের ফলে গঠন বিন্যাসে ধ্রুপদী আরবীর কোন পরিবর্তন হয়নি। কথ্য আরবীও মরক্কো থেকে ইরাক, উত্তর সিরিয়া থেকে সুদান কিংবা নজদ পর্য্যন্ত বিভিন্ন আরব জনগোষ্ঠীর মুখে আলাদা ভাষায় রূপ নেয়নি, যেমনটা হয়েছিল ল্যাটিনের উত্তরসূরীদের মধ্যে। বিদেশী অনুপ্রবেশের পরেও ইতিউতি যৎসামান্য স্থানীয় পরিবর্তন স্বত্বেও আরবীকে এখনও পরিস্কারভাবে চেনা যায়। তাই প্রারম্ভিক সামান্য অসুবিধা সত্বেও মিশরীরা লেবানীজকে , সিরীয়রা ইরাকীকে বুঝতে পারে। তা'ছাড়া এই কথ্যবুলি সমুহ কখনও লিখিত হওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করেনি ফলতঃ একই লেখ্য ভাষার সার্বজনীন অধিকারে আরববিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক সংহতি বরাবরই সংরক্ষিত থেকেছে,পরবর্তিতে আবার যার পুনর্জন্ম ঘটে।

তা সত্বেও এই পুনর্জাগরনকে লক্ষ্যনীয়ভাবে নুতন যুগের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়েছে। পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনৈতিক ধারনা দিয়ে শাসিত পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় বিদেশী শব্দ সংযোজন করে অথবা পুরাতন আরবী শব্দে নুতন ধারনা, মর্মার্থ প্রকাশযোগ্য অর্থ আরোপ করে সেকেলে উচ্চারনরীতির বদলে সংক্ষিপ্ত অথচ অধিকতর ভাব প্রকাশযোগ্য, আধুনিক পশ্চিমা বাগরীতি প্রভাবিত এক নুতন বাগধারার উদ্ভব ঘটে। উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিংশ শতকের শুরুতে কায়রো এবং বৈরুতে সমানভাবে এই প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়েছে। নুতোন নুতোন কবি,লেখক, পন্ডিতজনের আবির্ভাব ঘটেছে। অধিক সংখ্যায় গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার হয়েছে যার কিছু পুরোন আরবী ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনঃ প্রকাশ, কিছু ইউরোপীয় রচনাবলীর অনুবাদ আর বাকীটা পুনর্জাগরনের নায়কদের নিজস্ব মৌলিক রচনা।

কবি আহমদ শওকি (মিশরীয়) এবং খলিল মাতরান (লেবানীজ) প্রমুখ ঐতিহ্যবাহী প্রশস্তি গাঁথার বদলে নুতন কিছু লেখার চেষ্টা করেন। প্রথমজন শেক্সপীয়রের অনুপ্রেরনায় এন্টনিও ও ক্লিওপেট্রা সহ বেশ কয়েকটি কাব্য নাটক লেখেন, দ্বিতীয়জন অথেলো , দ্য মারচেন্ট অফ ভেনিস আরবীতে অনুবাদ করেন। জুরজি জেয়দান (মিশরে আরেক লেবানীজ অভিবাসী) ওয়াল্টার স্কটের প্রভাবে আরব ইতিহাস উপজীব্য করে বেশ ক'টা নভেল লিখে আরবী সাহিত্যে নুতন ধারার সৃষ্টি করেন। অনেক বছর পর মিশরীয় অন্ধ পন্ডিত তাহা হোসেইন আজহারে পড়াশোনা শেষে সরবন'এ যান, সেখানে তিনি ফরাসী প্রভাবে আরবী সাহিত্যে পশ্চিমা সমালোচনা রীতির প্রয়োগে নুতন রীতির জন্ম দেন।

পশ্চিমা প্রভাবে উত্ত হয়ে আরব চিন্তা ভাবনার তৃতীয় ঢেউ আসে আটলান্টিকের ওপার থেকে। আমেরিকায় অভিবাসনকারী লেবানীজদের মধ্যে অনেকেই লেখক হিসেবে বিখ্যাত হন , তাঁদের মধ্যে পর্যটক আমিন রায়হানি, আধ্যাত্মিক লেখক ও চিত্রকর খলিল জিব্রান যুগপৎ আরবী এবং ইংরেজীতে লেখেন এবং তাঁদের লেখা কায়রো,বৈরুতে সাহিত্য অগ্রগতির ধারায় প্রভাব ফেলে।

মিশরে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুধু সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মহান সাহসী ধর্মবেত্তা শেখ মোহাম্মদ আবদু , যিনি আল আজহার কেন্দ্রীক উলেমাদের সংরক্ষনবাদী গোড়ামির বিপরীতে মুসলিম ধর্মতত্বের সহজতর এবং যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। তেমনি আরেক সাহসী সমাজ সংস্কারক কাসিম আমিন নারী স্বাধীনতার ডাক দেন।

(৪)

১৯০৭-১৯১১ এই সময়টুকু বাদে ১৮৮২ থেকে ১৯১৯ পর্য্যন্ত পুরো সময়টা মিশরে বৃটিশ নীতি অনেকটা অলিম্পিয়ান পিতৃতান্ত্রিক। ক্রমার এবং কিচেনার একটি দক্ষ, কার্য্যকর সরকার ব্যাবস্থা তৈরী করেন, দেশের অর্থনীতিকে পুনর্বাসিত করেন, সেচ ব্যবস্থার পরিধি বাড়ান এবং শোষন থেকে ফেল্লাহ (কৃষক) দের রক্ষা করেন কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী যুগের মানুষ হিসেবে আরাবির ব্যর্থ বিদ্রোহের পর উদীয়মান নুতন শিক্ষিত,মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী শক্তির সম্যক উপলব্ধি কিংবা তার প্রতি কোন সহানুভূতি তাদের ছিলনা।

মিশরীয় আরবদের সাথে সাথে তুর্কি উপাদান সমূহ নিয়ে বৃটিশ দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফরাসী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অনুপ্রাণিত তরুন আইনজীবি মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে চরম বামপন্থী হিজব আল ওয়াতানি (জাতিয়তাবাদী পার্টি), বিখ্যাত সা'দ জগলুলের (ইতিহাসের পরিহাস এই যে তিনি ১৯০৭ সালে ক্রমারের বিদায়ী ভাষনে ক্রমার কর্তৃক প্রশংসিত ; আবার ১৯১৯ সালে 'ওয়াফাদ' পার্টির নেতা হিসেবে উগ্র মিশরীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি রূপে বিখ্যাত) নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী হিজব আল উম্মাহ(জাতীয় পার্টি)র উন্মেষ ঘটে।

১৮৮২ সালে মিশরের উপর বৃটিশদের একা হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়ার জন্যে ফ্রান্স ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি, তাই সে মিশরীয় জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সমর্থনের মাধ্যমে বৃটিশদের হেনস্থা করতে চাইতেই পারে। কিন্তু ঈঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তি তাদের সেই তিক্ত অধ্যায়ের অবসান ঘটালে মিশরে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আবার চার বছর পর তা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পরম উৎসাহ পায় খোদ অটোমন রাজধানী সিরিয়া থেকে।

১৯০৮ সালে তরুন তুর্কি আন্দোলন সুলতান আব্দুল হামিদকে ১৮৭৬ সালে স্থগিত করা সংবিধান পুনর্বহাল পুর্বক, অটোমন সাম্রাজ্যের সকল জাতি গোষ্ঠীকে সমান অধিকার সম্পন্ন ঘোষনা এবং রাজকীয় মন্ত্রীসভা ও সংসদে আরবদের অংশ গ্রহনের প্রস্তাব দিতে বাধ্য করে। প্রস্তাব গৃহীত হয় । কন্সটান্টিনোপলের যুক্ত সংসদে আসন নেয়া আরব সদস্যদের একজন পরবর্তিতে বিখ্যাত জর্দানের রাজা আবদুল্লাহ।

আরব জাতীয়তাবাদীদের আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে এই বিশ্বাসে কিছুদিন তুর্কি-আরব সম্পর্কের মধুচন্দ্রিমা বেশ ভালই চলে । কিন্তু তরুন তুর্কি আন্দোলন বর্ণবাদী ধারায় অগ্রসর হতে থাকলে তাদের আশাহত হওয়ার পালা শুরু হয়। সাম্রাজ্যে আরবরা তুর্কিদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক অনেক বেশী হলেও নির্বাচনী এলাকা এমনভাবে গঠন করা হয় যাতে তুর্কিরা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে। ১৯০৮সালে কন্সটান্টিনোপলে গঠিত তুর্কি-আরব ভ্রাতৃসংঘ ভেঙ্গে যায় এবং আলাদা সত্বা হিসেবে আরব জাতীয়তাবাদীরা গোপনে সংঘঠিত হতে শুরু করে; যদিও মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয়দের অভিসন্ধি নিয়ে ভয়ের কারনে তুর্কিদের সাথে তাদের পুরোপুরি বিচ্ছেদ আরো খানিকটা , এমনকি ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হয় ।

১৯০৪-১৯১৪ সময়কালে গোপন আরব আন্দোলন কয়েকটা গুপ্ত সংগঠনের জন্ম দেয়। তাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন আল ফাত্তাত (তরুন আরব) এবং আল আহদ(চুক্তি) সেখানে প্রথমবারের মত তুর্কি সেনাবাহিনীর আরব অফিসারেরা আরব জাতীয়তাবাদের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আল ফাত্তাত এর কংগ্রেসে মুসলিম এবং খ্রীশ্চান প্রতিনিধিরা প্রায় সমান সমান সংখ্যায় উপস্থিত থাকেন; তবে ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব বিচারে সিরিয়ার প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল সর্বাধিক যদিও ইরাক থেকে দু'জন, অভিবাসী আরব সম্প্রদায়ের তিন জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন।

পুর্বাঞ্চলীয় আরব বিশ্বেরও নানা জায়গায় এই জাতীয়তাবাদী উত্তেজনা বেড়ে চললেও বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে আন্দোলনের শক্তিসমূহকে এক জায়গায় সংহত করার ক্ষেত্রে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। দামেস্ক থেকে বাগদাদে উটের কারাভাঁ (তখনও দুই শহরের মধ্যে সেটাই একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা)সময় নেয় তিন সপ্তাহ । বৈরুত থেকে বসরায়, পারস্যউপসাগর, লোহিত সাগর, সুয়েজখাল হয়ে বিকল্প নৌ পথে খুব কম সময়েই সরাসরি যাওয়া যায়, এবং অনুকূল সময়েও তা স্থলপথে ভ্রমনের চেয়ে কম সময়সাপেক্ষ নয়। ১৯০৮ পর্য্যন্ত সিরিয়া থেকে আরব উপদ্বীপের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল যেমনি ধীর তেমনি শ্রমসাধ্য। স্থলপথে দামেস্ক থেকে মদীনার দুরত্ব অন্ততঃ ৪০ দিনের, নৌপথে জাহাজ পাওয়া গেলে বৈরুত থেকে জেদ্দা ভ্রমন কম করে হলেও দশ-বারো দিনের ব্যাপার।

যাহোক মানুষের চাতুর্য্যকে মাঝে মাঝে ইতিহাস মস্করা করে, এর উদাহরণ- ১৯০১ সালে সুলতান আব্দুল হামিদ হেযায রেলওয়ে পরিকল্পনা হাতে নেন, যাতে নিয়মিত ট্রেন সার্ভিসের মাধ্যমে দামেস্ক-মদীনার দুরত্ব এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসে। মুলত: দুটো উদ্দেশ্য সামনে রেখে সুলতান আব্দুল হামিদের এ যোগাযোগ উন্নয়ন পরিকল্পনা। প্রথমত ঃ প্রকাশ্যে তিনি ইসলামের সেবায় নিয়োজিত, মিলিয়ন মিলিয়ন হজ্ব যাত্রীদের ভ্রমন সহজসাধ্য করে(রেলওয়ে মক্কা পর্য্যন্ত প্রসারিত হওয়ার কথা ছিল) বিশ্বাসীদের কাছ থেকে খলিফার জন্যে কৃতজ্ঞতা আদায়; দ্বিতীয়তঃ অন্তরালে আরো জাগতিক লক্ষ্যে ,আরব উপদ্বীপের প্রজাদের উপর সুলতানের সামরিক নিয়ন্ত্রণ আরো জোরদার করা । কার্য্যক্ষেত্রে এই রেলওয়ে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশেষতঃ ১৯১৬'র আরব বিদ্রোহে বিশেষ সহায়ক প্রতীয়মান হয় । তবে সে ঘটনায় যাবার আগে আরব বিশ্বের বাকী দেশগুলোর দিকে আরেকবার চোখ বুলোন যাক।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ইতালী সংক্ষিপ্ত এক যুদ্ধে তুর্কিদের পরাস্ত করে ত্রিপোলিতানিয়া দখল করে নেয়। পরের বছর মরক্কো ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। এই মরক্কো কখনও তুর্কি দখলে যায়নি বরং স্পেন থেকে আরবদের পশ্চাদাপসারন পর্য্যন্ত সব সময় স্বাধীন সালতানাত হিসেবে ঠিকে ছিল । এভাবে তিউনিসিয়া,আলজেরিয়া ফ্রান্সের (তিউনিসিয়া আশ্রিত রাজ্য হিসেবে, নিজস্ব সরকারের অধীনে স্বায়ত্ব শাসিত,পক্ষান্তরে আলজেরিয়া প্রদেশ হিসেবে সরাসরি মেট্রোপলিটন ফ্রান্সের অধীনে) শাসনাধীনে চলে যায়, মিশর বৃটিশ শাসনাধীনে ; পুরো আরব উত্তর আফ্রিকা পুরোপুরি ইউরোপীয় উপনিবেশ কিংবা প্রায় উপনিবেশে পরিণত হয়। তুর্কি বৃটেন এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে ১৯১৪ সালে অটোমন সাম্রাজ্যের সাথে এর সর্বশেষ দাপ্তরিক বন্ধন ছিন্ন হয় । এ'সময় মিশরে অটোমন কর্তৃত্ব খারিজ হয়ে তদস্থলে বৃটিশ কর্তৃত্ব আসে। তথাপি অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রশাসক, সৈনিক, শহুরে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশরে যেমন বৃটিশকে পাওয়া যায় তেমনি উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় এবং ফরাসী উপনিবেশায়ন অগ্রসর হয় ভূমি দখল এবং তাতে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে। ১৯১৪'র পুর্বে মিশর এবং উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহে ইউরোপীয় শাসন

আরোপে কার্য্যতঃ যুদ্ধ শুরু হলে আরববিশ্বের এই অংশের রাজনীতি সচেতন জনগনের আবেগ সিরিয়া, ইরাক, এবং আরব উপদ্বীপের জাতীয়তাবাদীদের চেয়ে ভিন্নতর হয়ে দেখা দেয়।

কারন দ্বিতীয়োল্লেখিতরা তখনও অটোমন শাসনাধীনে এবং তারা যুদ্ধে তুর্কির পরাজয়ের ফলে বৃটিশ সহায়তায় স্বাধীনতা আশা করেছে পক্ষান্তরে সুয়েজের পশ্চিমের আরব জাতীয়তাবাদীদের কাছে ওরা নুতন প্রভু অধিকন্তু খ্রীশ্চান অতএব সহানুভূতি তুর্কির পক্ষে। পশ্চিমের মরুভূমিতে লিবিয়ার সেনুসি নেতা মিশরে বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেগে উঠায় নেতৃত্ব দেন। মিশরে সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগন আন্তরীকভাবে সুয়েজের উপর তুর্কি আক্রমণ কামনা করে শেষাবধি পরাজয়ে আশাহত হয়। যুদ্ধ শেষে পুর্বাঞ্চলীয় আরববিশ্ব থেকে তুর্কিরা বিতাড়িত হলে; আরবে স্বাধীনতার বদলে সিরিয়া এবং ইরাকে বৃটিশ অথবা ফরাসী শাসন চাপিয়ে দেয়া এবং প্যালেস্টাইনে বৃটিশ তত্বাবধানে ইহুদীবাদ চাপিয়ে দেবার প্রমত্ত ক্রোধ থেকেই সুয়েজের উভয় তীরে পশ্চিমা দখলদারদের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদ এক স্রোতে মিশে যায়।

খোদ আরব উপদ্বীপে সুলতান আব্দুল হামিদের স্বপ্নের রেলওয়েতে চড়ে অটোমন শক্তির হেযায পৌঁছার উদ্দেশ্য খুব একটা সার্থক হয়নি। অধিকাংশ স্থানে এলাকার শেখ, যুবরাজরা স্বাধীনতা না হলেও অন্তত: স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করেন। তাদের মধ্যে আরবের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তের উপকূল জুড়ে (কুয়েত, কাতার,ওমান প্রভৃতি) নানাভাবে প্ররোচিত হয়ে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ চুক্তির মাধ্যমে বৃটিশ নিরাপত্তা গ্রহন করে নেয়। নজদ'এ ওহাবী আন্দোলন এবং তার সেক্যুলার মিত্র সউদ পরিবার প্রায় এক শতাব্দী আগে ইব্রাহিম পাশার হাতে বিধ্বস্ত হওয়া অবস্থা থেকে পুরোপুরি সেরে উঠে। বিংশ শতকের শুরুতেই আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ (পরবর্তিতে বিখ্যাত সৌদী রাজা) বৃটেনের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের আনুকূল্যে পুরো এলাকার অবিসংবাদিত শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু মক্কার শেরিফ হোসেইন (জর্দানের প্রয়াত রাজা আবদুল্লাহ এবং, ইরাকের রাজা প্রয়াত প্রথম ফয়সলের পিতা) এমন এক পদক্ষেপ নেন যা পরবর্তিতে তাঁকে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং এই আন্দোলনকে তুর্কি প্রভুত্ব ঝেড়ে ফেলার সুযোগ করে দেয়।

নবী(দ:)বংশের অধঃস্তন পুরুষ হোসেইন,প্রায় ষোল বছর কন্সটান্টিনোপলে একরকম রাজনৈতিক বন্দীদশায় কাটান। ১৯০৮ 'একতা ও অগ্রগতি সংসদ' ক্ষমতায় আসে। নুতন তুর্কি শাসকেরা তাঁকে ইসলামের পবিত্র স্থান সমুহের তথা মক্কার অধিকর্তা হওয়ার জন্যে তাঁর মাতৃভূমি আরব উপদ্বীপে পাঠিয়ে দেন। উচ্চাভিলাষী ও তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন হুসেইন পুর্বসূরীদের রেখে যাওয়া সাম্রাণিক পদে সন্তুষ্ট ছিলেননা। উপদ্বীপে রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের জন্যে তিনি হেযাযের বিভিন্ন গোত্র সমুহের নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা চালাতে থাকেন। তাঁর তৎপরতা কন্সটান্টিনোপলে অটোমন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে হুসেইন তুর্কিদের সাথে সম্ভাব্য প্রকাশ্য দ্বন্দে বৃটিশ সমর্থন আশা করতে পারেন কিনা তা জানতে ১৯১৪র ফেব্রুয়ারীতে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে কায়রোতে লর্ড কিচেনারের কাছে পাঠান ।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু এবং তরুন তুর্কিদের নেতৃত্বে দেশকে জার্মানদের পক্ষে নিয়ে যাবার তখনও মাসখানেক বাকী। বৃটেন তখনও তুর্কির ঐতিহ্যবাহী বন্ধু। কিচেনার এবং,বিশেষতঃ তাঁর প্রাচ্যদেশ সম্পর্কিত সেক্রেটারী স্যার রোনাল্ড স্টরস এর সাথে অনেক কথাবার্তার পর আবদুল্লাহ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন।

১৯১৪র নভেম্বরের পরে বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পুর্ন পাল্টে যায়। এখন যে কোন আরব বিদ্রোহ মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কির বিরুদ্ধে বৃটিশ আক্রমণের সহায়ক শক্তি । অধিকন্তু ইসলামের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা (তাঁর বংশ এবং পদ দুই বিচারেই)'র নেতৃত্বে বিদ্রোহ দিয়ে মুসলিমদের প্রতি খলিফার জেহাদের ডাক অথবা বৃটেনের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ আহ্বানের কার্য্যকর প্রতিরোধ করা যায়।

তুর্কিদের সাথে সম্পুর্নভাবে সম্পর্কছেদের আগে ১) অটোমন সাম্রাজ্যের কাঠামোয় আরবদের জাতীয় আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের কোন সম্ভাবনা নেই, এবং ২) আরবরা অবশ্যই পশ্চিমাদের কাছ থেকে প্রকৃত স্বাধীনতা পাবে, স্রেফ এক পরাধীনতা থেকে আরেক পরাধীনতায় গিয়ে পড়বেনা এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ভাবে নিশ্চিত হওয়া এবং, কিছুটা হুসেইনের ছেলে ফয়সলের ভবিষ্যতের প্রশ্নে দ্বিধায় কিছুটা শৈথিল্য সত্বেও আরবদের পক্ষে সিরিয়া, এবং ইরাকের জাতীয়তাবাদীদের সাথে হুসেইনের যোগাযোগ সাধিত হয় ।

একপক্ষে আরব জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র শেরিফ হুসেইন,অন্যপক্ষে মিশরে কিচেনারের স্থলাভিষিক্ত স্যার ম্যাক মোহন ---শুরু হয় ইতিহাস বিখ্যাত হুসেইন-ম্যাকমোহন পত্রালোচনা। এই আলোচনায় আরবদের (হুসেইন কিংবা তাঁর ছেলে অথবা সিরিয়া, ইরাকী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিনিধি গোষ্ঠী সে যেই হোক) সবার চোখে সুয়েজের পুর্ব পাড়ে আরব উপদ্বীপের সাথে সিরিয়া, লেবানন,প্যালেস্টাইন এবং ইরাক যুক্ত করে একটি মাত্র আরব রাজ্যের স্বপ্ন।

এই স্বপ্নের মুলে ছিল অতীত গৌরবের অনুপ্রেরনায় যতটা সম্ভব উমাইয়া অথবা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা । অথচ সময় প্রবাহে বৃটিশেরা পুর্বাঞ্চলীয় আরবভূমিকে খন্ড খন্ড করার পরিকল্পনায় নিবেদিত না হলেও, ১৯১৮ সালের বাস্তবতায় তা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । বিশাল এই এলাকা ,অনুন্নত যোগাযোগ ব্যাবস্থা, আরব জীবনের অস্থির এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে অনভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের পক্ষে দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাবে একত্রে বাঁধা সম্ভব ছিলনা। তদুপরি আরব উপদ্বীপ এবং উত্তরের আরবদেশসমূহের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থ্যক্যও ছিল। মুলতঃ যাযাবর এবং কৃষিভিত্তিক আরব দেশ নবী মোহাম্মদ(দ:)র দিন থেকে খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। পক্ষান্তরে সিরিয়া এবং ইরাকের নাগরিক সভ্যতার অভিজ্ঞতা শতাব্দীর পর শতাব্দী। এমনকি মক্কা-মদীনাও বৈরুত, দামেস্ক, জেরুযালেম,হাইফা, বাগদাদ এবং বসরার চেয়ে অনেক পেছনে। তারা তখনও মধ্যযুগীয়, তত্বমনা, পশ্চিমের প্রভাবমুক্ত।

অথচ এই প্রভাব সিরিয়ায় প্রায় শতাব্দী ব্যাপী কাজ করছিল। সিরীয় জাতীয়তাবাদীরাও স্বভাবতঃ হুসেইনকে প্রস্তাবিত আরব রাজ্যের প্রধান ভাবেনি। হুসেইন কমবেশী অটোমন শক্তির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকাতে বিদ্রোহ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে নিরাপদ অবস্থানে অথচ সিরিয়া, ইরাকে জাতীয়তাবাদী নেতারা তুর্কি শাসনাধীনে এমনকি যুদ্ধকালীন সামরিক শাসনের আওতায়; ধরা পড়ে ফাঁসিতে যাওয়ার বেশী কিছু তাদের করনীয় ছিলনা। কিছু খ্রীশ্চানসহ তাদের অনেকে ফাঁসিতে গিয়েছেনও। সিরীয় জাতীয়তাবাদীরা যা পারেনি হুসেইন তাতে নেতৃত্ব দিতে পারার কারন হচ্ছে সিরিয়ায় আন্দোলন তখনও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যে সীমিত, গনভিত্তি পায়নি পক্ষান্তরে হেযাযে হুসেইন অনেক গোত্রকে প্রভাবিত করেছেন। সর্বপ্রথম হুসেইন যখন যুদ্ধশেষ হওয়া সাপেক্ষে বৃটিশ স্বীকৃতিতে প্রস্তাবিত আরবরাজ্যের সীমানা নির্ধারন করেন, স্যার ম্যাকমোহন বিষয়টাকে এই যুক্তিতে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেন যে যুদ্ধজয়ের আগে এরকম একটা বিষয়ে তর্ক করা অর্থহীন। হুসেইন তাঁর প্রস্তাবে অনড় থাকলে ম্যাকমোহন তাঁকে জানান যে, বাগদাদ প্রদেশে বৃটেনের প্রভাবপূর্ণ ভূমিকা রাখার ইচ্ছে এবং 'লেভান্ট' অঞ্চলে ফ্রান্সের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা শর্ত সাপেক্ষে বৃটিশ সরকার তাঁর প্রস্তাব গ্রহন করছে।

অথচ এর কুড়ি বছর পর ম্যাক মোহনকে বলতে হয়েছে পত্রালাপের সময় প্রস্তাবিত স্বাধীন আরবভূমি বলতে তিনি প্যালেস্টাইনকে বাদ দিয়ে বুঝিয়েছেন, যদিও পত্রসমুহের কোথাও প্যালেস্টাইনের উল্লেখ কিংবা প্যালেস্টাইন হিসেবে ধরে নেয়া যায় এমন কোন স্থানের নাম উল্লেখ ছিলনা। আরবদের মনে নিশ্চিতভাবে এমন কোন সন্দেহ থাকার কারন ছিলনা যে সিরিয়ার অংশবিশেষ এবং ৯০% আরব বাসিন্দা অধ্যুষিত, আরব বিশ্বের অবিচ্ছেধ্য অংশ প্যালেস্টাইন প্রস্তাবিত স্বাধীন আরব রাজ্য থেকে বাদ পড়তে পারে। স্বভাবতঃই

১৯১৭ সালে বাদশা হুসেইন (অসার অহংকারে শেরিফ প্রথমে আরবদের রাজা, এবং পরবর্তীতে খলিফা উপাধি গ্রহন করেন) 'বেলফুর ঘোষনার' বিষয়ে শোনামাত্রই, উদ্বিগ্ন হয়ে বৃটিশ সরকারের কাছে ওই দলিলের ব্যাখ্যা দাবী করেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে এই বলে আশ্বস্থ করেন যে ইহুদীদের বিষয়ে বৃটিশ সরকারের দায়-দায়ীত্বকে কোনভাবেই আরবদের অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় প্রভাব ফেলতে দেয়া হবেনা । তবে এসব পরের কথা। ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে আরবদের সাথে বৃটেনের চুক্তি সম্পাদিত হয়, এবং বছরের শেষ দিকে আরব বিদ্রোহ (যার সাথে অন্ততঃ ইংল্যান্ডে চিরদিন টি ই লরেন্সের নাম জুড়ে থাকবে)সংঘটিত হয় ।

বিরাট সংখ্যক তুর্কি সেনাবাহিনীকে হেযাযের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে বৃটিশ সেনাবাহিনীর সুরক্ষা এবং মুসলিম দেশসমূহে জার্মান অপপ্রচারের মোকাবিলার মাধ্যমে এই বিদ্রোহের গুরুত্বের সাক্ষ্য দেন, অন্যান্যদের মধ্যে লর্ড ওয়াভেল । নানাবিধ কারনে এই বিদ্রোহ প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং ইরাকে মিত্র বাহিনী এগিয়ে আসার সাথে সাথে গণ-অভ্যুত্থান ঘটাতে ব্যর্থ হয়। তুর্কি সেনা একনায়কের বর্বরতা,সীমাহীন অভাব এবং দারিদ্র্যে দৈহিক শক্তি নিঃশ্বেষিত হওয়া, যুদ্ধকালীন সময়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে লেবানন, সিরিয়া, এবং প্যালেস্টাইনে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায় , সর্বোপরি যে কথা আগেই বলা হয়েছে জাতীয় আন্দোলন তখনও সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত, সাধারণের মধ্যে ছড়ায়নি এবং সর্বশেষ হলেও যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে বৃটিশ সরকার (বিশেষতঃ ইন্ডিয়া সরকার) উপনিবেশের লোকজন তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা লাভের আশায় অতিমাত্রায় মরিয়া হইয়া উঠে এই ভয়ে স্থানীয়দের মধ্যে এই বিদ্রোহের খবর প্রচার হতে দেয়নি এবং এতে বৃটেনের নিজের, ফরাসীদের এবং ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সত্য স্বীকারে কুণ্ঠিত ইহুদীদের স্বার্থ বজায় থাকে।

পশ্চিমের সাথে দ্বন্ধ

সুচিন্তিত মতামতের চেয়ে বাক্যে এবং বাস্তবতার বদলে কল্পনায় ভেসে যাওয়া আরব মনের চরিত্র। উচ্চনাদী বক্তৃতায় পেশ করা তুরীয় ধ্যান-ধারনা আরবদের কাছে কঠিন বাস্তবতা বিজয়ী শক্তি বলেই মনে হয়। প্যালেস্টাইন প্রশ্নে আরবদের দৃষ্টিভঙ্গীই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। সেই দ্বন্ধে নিজেদের অবস্থানের যৌক্তিকতা বিচারে তারা এতটাই আবেগপ্রবণ যে প্রতিপক্ষের চর্তুমুখী আক্রমনের শক্তি পরিমাপ করতেও অসমর্থ, এবং পরাজয়ের সামান্যতম আশঙ্কাও করেনা। এই মারাত্মক দুর্বলতার কারনে প্রথম মহাযুদ্ধের পর এশিয়ায় এক স্বাধীন সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জাঁকালো পরিকল্পনা কল্পনাতেই থেকে যায়। একই লক্ষ্যে উৎসারিত আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও- মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপের অভিলাষ এবং তাদের পলিসি প্রতিরোধে কমজোর হয়ে পড়ে। অনেক আরব নেতাই ইউরোপীয় অভিসন্ধিতে অবিশ্বাস করেছেন, এবং নিজেদের বিদ্রোহের মূল্য স্বরূপ স্বাধীনতার 'কার্যকর নিশ্চয়তা আদায়ে' জোর দিয়েছেন তা ইতোপুর্বে আমরা দেখেছি ।

বিজয়ী বৃটিশ, ফরাসী শক্তির কাছ থেকে আদায় করা ওই গ্যারান্টি আরবদের দুর্বলতা সত্বেও অবশ্যই কার্যকরভাবে প্রয়োগ হবে তাদের এই আন্তরীক বিশ্বাসেই বাস্তবতাবোধের অভাবের প্রমাণ। আরবদের এই বিশ্বাস নিজেদের অন্ধ চিন্তা ভাবনার প্রমান ছাড়াও 'গ্রেট বৃটেনে'র কথার উপর সীমাহীন আস্থার বহিঃপ্রকাশ। যুগ যুগ ধরে চলে আসা আরববিশ্বে সৎ ব্যাবসায়িক লেনদেনে বৃটিশরা এমন বিশ্বাস পোক্ত করেছে যে ইংরেজের মুখের কথাই তার হলফনামা। এর উপর্য্যপুরি বিপরীত ফলাফলের পরেও হুসেইন এবং তাঁর ছেলে ফয়সল এই বিশ্বাস ধারন ও প্রতিপালন করেছেন। একের পর এক আশংকাজনক বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়ার পরেও ,বৃটিশ সরকার প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও নিশ্চয়তা সরাসরি শঠতাপূর্ন না হলেও যে মুল্যহীন এই বিশ্বাসে আসতে তাদের অনেক

বছর কেটে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে আরবদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে বৃটেনের পুরোপুরি ব্যর্থতার অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়।

যেমন বৃটেন তার অস্তিত্বের জন্যেই লড়াই করছিল,সে অবস্থায় কোন দেশ সাহায্যলাভের আশায় পারস্পরিক যুক্তি, যোগ্যতা ভালভাবে যাচাই না করে যে কোন ওয়াদা করতেই পারে। তদুপরি বিশ্ব শক্তি হিসেবে বৃটেন নানামুখী জটিল সম্পর্কের কারনে নানারকমের দাবীর মুখে ছিল যার কোনটাই সে অগ্রাহ্য করতে পারেনি তবে যতদুর সম্ভব একটা সাধারণ সামঞ্জস্যপুর্ন মিটমাটের চেষ্টা করেছে। যুদ্ধকালে নানামুখী সমাধান চেষ্টা চালাতে হয় বলে নির্দিষ্ট কোন সমস্যায় প্রয়োজনীয় মনযোগ দিতে রাষ্ট্রনায়কদের ব্যর্থতা ক্ষমা পেতেও পারে বিশেষতঃ যখন কোন একই সমস্যা কিংবা এলাকা নিয়ে একাধিক এজেন্সী কাজ করে। ১৯১৪ এবং ১৯১৮ এর মাঝামাঝি মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিটাই এমন ছিল যে, 'ফরেন অফিস', কায়রোর আরব ব্যুরো,এবং ইন্ডিয়া সরকার প্রায়ই নিজেদের অজান্তে (গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে) একে অন্যের বিপরীত কাজ করে বসতেন। শেষতঃ বৃটিশ সরকার সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাকের সমন্বয়ে সাধারণ আরব আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে হুসেইনের ভূমিকার ব্যাপকতা বুঝতে পারেনি। তাদের ধারনা ছিল এসমস্ত দেশ নিয়ে আরব স্বাধীনতার দাবী বরং বহুলাংশে হুসেইনের নিজস্ব গোষ্ঠীতান্ত্রিক উচ্চাভিলাষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, অতএব যুদ্ধ শেষে তাঁকে আরব উপদ্বীপে একটা স্বাধীন রাজ্য দেয়া হলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং সম্পাদিত চুক্তিতে সংরক্ষিত শর্তাদি যেমন বাগদাদে বিলায়েত, সিরিয়ায় ফ্রান্সের স্বার্থ ব্যাখ্যা এবং একই ভাবে বেলফুর ঘোষনা সম্পর্কে বৃটিশ নীতি তিনি মেনে নেবেন।

কথা থেকে যায় যে,আরবদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের কয়েকমাসের মধ্যেই বৃটেন ফ্রান্সের সাথে এমন এক চুক্তিতে এগিয়ে যায় যার ফলে যুদ্ধশেষে আরব একতা এবং স্বাধীনতা অসম্ভব হয়ে পড়ে । পরের বছর আরও মারাত্মকভাবে সে জায়নবাদী ইহুদীদের কাছে এমন প্রতিশ্রুতি দেয় যা পূরন করতে গেলে আরব অধিকার এবং স্বার্থকে চরম বলি দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকেনা। ফ্রান্সের সাথে আলোচনায় সম্ভবতঃ আরব আশা-আকাঙ্খা পুরনে বৃটেন তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং (তার ধারনামত) 'লেভান্ট' অঞ্চলে খবরদারী করার মত ফরাসী অবস্থানের দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা ছাড়া বেশী কিছু করেনি। ফ্রান্সের এ'আবেগী দাবী ক্রুসেডের সময় থেকে, যে ক্রুসেডে তাদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল , এবং যার ফলে আরব দুনিয়ায় ইউরোপীয় মাত্রেরই পরিচিতি হয়ে উঠে 'ফ্রাঙ্গ'। কিছুটা আত্মিক এবং কিছুটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মাউন্ট লেবাননের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত বিরাট খ্রীশ্চান জনগোষ্ঠী সবসময়ই ফ্রান্সের আকর্ষণের বিষয়। অটোমন রাজশক্তির বিরুদ্ধে এরাই ফ্রান্সকে সহায়তা দিয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে জবর দখলেরও সুযোগ করে দিয়েছে।

ষোড়শ শতকে প্রথম ফ্রান্সিস এর রাজত্বকাল থেকেই ফ্রান্স সিরিয়া এবং লেবাননে নিজেকে ক্যাথলিক খ্রীশ্চানদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় দেখে এসেছে। সে সময় অটোমন সুলতান প্রথমবারের মত ফরাসী নাগরিকদের কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা দেন যা পরবর্তিতে অর্থনৈতিক বন্দীত্ব তথা'ক্যাপিচুলেশন'নামে পরিচিতি পায়। সে সময়কার বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্য দিয়েই ফ্রান্স অটোমন সাম্রাজ্যের সর্বত্র ক্যাথলিকদের জন্যে একই সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে এসেছে। ফরাসী বিপ্লব এবং বোনাপার্টের মিশর আক্রমনের ফলে সাময়িক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা সত্বেও সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লেবাননে প্রথম ফরাসী স্কুল চালু হয়। ইব্রাহিম পাশার রাজত্বকালে আবার ক্যাথলিক মিশন সমূহ আসা শুরু করে এবং পুরো উনবিংশ শতক জুড়ে লেবাননে ফরাসী সাংস্কৃতিক প্রভাব অব্যাহতভাবে বেড়ে চলে।

১৮৬০ সালে খ্রীশ্চান গনহত্যা দেশটাকে প্রায় ফরাসী জবর দখলের মুখে ঠেলে দেয়। শেষতক মাউন্ট লেবানন এলাকায় সম্মিলিত ইউরোপীয় গ্যারান্টির বিনিময়ে ফরাসী সৈন্য প্রত্যাহার করা হলেও সংখ্যাগুরু ক্যাথলিকদের রক্ষাকর্তা হিসেবে ফ্রান্সের দাবী সবিশেষ গুরুত্বলাভ করে। ১৯১২ সাল নাগাদ ফ্রান্স বৃটেন থেকে সিরিয়া এবং লেবাননে 'বিশেষ অবস্থান'এর স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হয়। এই কুটনৈতিক শব্দের অর্থ হচ্ছে ইউরোপের অসুস্থ

মানুষটির মৃত্যুতে তার রাজ্য যখন ভাগ হবে 'লেভান্ট' ফ্রান্সের ভাগে থাকবে। বৃটেন এবং হুসেইনের মধ্যেকার চুক্তিতে এই বিষয়ে কমবেশী 'ধরে নেয়া'র ব্যাপার ছিল, যা হুসেইন গ্রহন না করলেও ফ্রান্সের সাথে সম্পর্কে বৃটেন যাতে লজ্জায় না পড়ে তার জন্যে বিষয়টা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যান্ত ঝুলিয়ে রাখতে সম্মত হন। সুতরাং আরবদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর পরই বৃটেন সব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং স্বীকৃত অধিকার সমূহ নিয়ে যতদুর সম্ভব সামঞ্জস্যপুর্ন ফর্মুলার সন্ধানে ফ্রান্সের সাথে আলোচনা শুরু করবে তাতে আশ্চর্য্যের কিংবা নিন্দার কিছু নেই।

তবে আলোচনার ফলাফলই আশ্চর্য্যের এবং নিন্দার। সাইকস-পিকট নামে পরিচিত চুক্তিতে বৃটেন এবং ফ্রান্স উপ-দ্বীপের উত্তরাংশের আরবদেশগুলো, বলা যায় (প্যালেস্টাইন, জর্দান, লেবানন নিয়ে ভৌগলিক সিরিয়া , এবং ইরাক) নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রভাব বলয় হিসেবে ভাগ করে নিতে একমত হয়। তন্মধ্যে লেবানন এবং সিরিয়া (মসুল এলাকাসহ) হবে ফ্রান্সের । ইরাক (মসুল বাদে) এবং আজকের জর্দান রাজ্য হবে বৃটেনের হিস্যা। প্রথম চুক্তিতে প্যালেস্টাইন (যুদ্ধরত জারের রাশিয়া জেরুযালেমের পবিত্র এলাকার গ্রীক অর্থডক্স অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষ অধিকারের দাবী করেছিল)কে একটা আন্তর্জাতিক প্রশাসনের আওতায় রাখা হয়। 'লেভান্ট' এ সিরিয়া এবং লেবাননের উপকূলীয় এলাকা সরাসরি ফ্রান্স শাসন করবে, বাদ বাকী কম অগ্রসর এবং রাজনীতি সচেতন এলাকায় ফরাসী সুরক্ষায় একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

একইভাবে অধিকতর উন্নত বৃটিশ অংশ বাগদাদ, বসরা তথা আজকের ইরাক বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় আসবে। পুর্বদিকে অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর এলাকায় (কম বেশী ট্রান্স জর্দান) বৃটিশ সুরক্ষায় একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ফ্রান্সের সাথে চুক্তি সম্পাদনকালে বৃটেন মিত্রকে আরবদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির কথা বলেনি কিংবা আরবদেরকেও এই চুক্তির বিষয়ে কোন ধারনা দেয়নি। কেবল যুদ্ধশেষে রাশিয়ায় বলশেভিকরা ক্ষমতায় এসে ঔপনিবেশিক শক্তিকে হাস্যস্পদ করার জন্যে চুক্তির কপি প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিলেই আরব জাতীয়তাবাদীরা জানতে পারে তাদের সামনে কী অপেক্ষা করছে। আরবদের জন্যে এ ভয়ঙ্কর আবিষ্কার, প্রায় একই সময়ে আরও এক অধিকতর ভয়ঙ্কর ধাক্কা নিয়ে আসে ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটিশ সরকার কতৃক জারীকৃত 'বেলফুর ঘোষনা' ।

(২)

আধুনিক ইতিহাসের এক মর্মান্তিক বাস্তবতা হচ্ছে আরববিশেরর অন্যতম এক সংবেদনশীল এলাকায় - প্রায় একই সময়ে শুরু হওয়া ইহুদী জাতীয়তাবাদ এবং আরব জাতীয়তাবাদ, একটির লক্ষ্য অর্জন অন্যটির সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। ইতোমধ্যেই এই দ্বন্ধ যথেষ্ট রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশী ঝরাবে। এই দুই জাতীয়তাবাদই উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে গড়ে উঠেছে এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই ।

৭১ খ্রীস্টাব্দে টাইটাস কতৃক বহিস্কৃত এবং উপাসনালয় ধ্বংস হওয়ার সময় কালে কোনভাবেই সব ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে বসবাস করতোনা। প্যালেস্টাইন রোম সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার পর থেকেই পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইহুদীদের কাজ কারবার ছড়িয়ে পড়ে, ফলতঃ প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে বিরাট সংখ্যক ইহুদী ৭১খ্রীস্টাব্দের অনেক আগে থেকেই প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে । এই ঘটনার পরে এবং বিশেষকরে আরব ও তুর্কি শাসনামলে প্যালেস্টাইনে মোট জনসংখ্যার ৫-১০% ইহুদী জনগন সবসময়ই বসবাস করে এসেছে। তবে সপ্তম শতকে আরব বিজয়ের পর থেকে এখানে মোট জনগনের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আরব (মুসলিম এবং খ্রীশ্চান উভয় সম্প্রদায়); কেউ নৃ তাত্বিক বিচারে আর কেউবা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ধারণায়। এদের অনেকেই ভূমির আদি অধিবাসীদের অধঃস্থন--- বাইবেলে উল্লেখিত 'কেনানীয়' ; যশোয়ার নেতৃত্বে ইহুদী বিজয়ের পরও যারা উপকূলীয় অঞ্চলে দখল বজায় রেখে ঠিকেছিলেন। শেষাবধি মধ্য ও আধুনিক যুগের

আরব হওয়ার জন্যে রোমান,বাইজান্টাইন শাসনাধীনেও বেঁচেছিলেন। এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই মাতৃভাষা হিসেবে আরবী গ্রহন পুর্বক আরব হয়েছে।

জায়নবাদের জন্মের পর প্যালেস্টাইনে বসবাস করতে আসা (ফিরে আসা কথাটা ভুল,এবং ব্যবহৃত হয়নি এ'কারনে যে, এই ইহুদীদের অনেকেই দেশের পুরোন হিব্রু জনগোষ্ঠীর বংশধর নয় বরং ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত ইউরোপীয় পৌত্তলিকদের বংশধর) ইহুদীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-১) ধর্মপ্রাণ মৌলবাদী ইহুদী যারা পবিত্রভূমিতে মরা-বাঁচার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে,২) শরণার্থী- যারা অন্যান্য দেশে নির্য্যাতনের ভয়ে ব্যক্তিগতভাবে আরব অথবা তুর্কি শাসনাধীনে স্বস্তি খুঁজতে এসেছে। ১৮৮০ সালে নুতন এক পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় 'সেমেটিজম' বিরোধীতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে অনেক রুশ ইহুদী ব্যক্তিগতভাবে, কোনরকম রাজনৈতিক দাবী দাওয়া ছাড়া,অটোমন শাসনাধীন প্যালেস্টাইনে এসে খামারবাড়ী গড়ে তোলে এবং নিজেদের জমিতে আরবদের নিয়োগ করে। উল্লেখ্য যে এসব জনবসতির সমৃদ্ধি ১৯১৪ সালের আগে থেকেই তাদের প্রতি আরব জনগনকে সন্দিগ্ধ এবং বিরূপ করে তোলে। ততদিনে প্যালেস্টাইনে রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে জায়নবাদী তথা ইহুদী জাতীয় আন্দোলন যথেষ্ট এগিয়ে যায়।

উচ্চপদে আসীন ইহুদীরা তাদের বক্তব্য উভয় দেশের প্রচার মাধ্যম,পালার্মেন্ট,ধর্মীয় পরিমন্ডল এবং সরকারের গুরুত্বপুর্ন ব্যক্তিদের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। উদারপন্থীদের কাছে ইহুদী 'জাতীয় আবাসনে'র(শুরু থেকেই তাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও এর পরিবর্তে জাতীয় আবাসন কথাটা ব্যবহার করে এসেছে আরবদের ধোঁকা দিতে) কথা তারা এমন মানবিক কর্ম হিসেবে উপস্থাপন করেছে যেন এতে ইহুদীদের তাবৎ সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধান হয়ে যাবে এবং নিকট প্রাচ্যের আধুনিকায়ন ঘটবে। তারা সংরক্ষণবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদদের বুঝিয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের প্রতি এ হবে এক মহামুল্যবান অবদান ; আর ধর্মপ্রাণ খ্রীশ্চানদের বুঝিয়েছে এতে ঈশ্বরের বাণীরই পরিপুর্নতা নিহিত। এসব সাধারণ কাকুতি মিনতিকে আরও জোরদার করেছে লর্ড বেলফুর এবং লয়েড জর্জ এর কাছে ডঃ চাইম ওয়াইজম্যন নামের এক রুশ বৈজ্ঞানিকের সরাসরি ব্যক্তিগত যোগাযোগ। ডঃ ওয়াইজম্যনের রাসায়নিক গবেষণা মিত্রশক্তির রণ সজ্জায় সহায়তা করেছিল। তবে সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন দু'বিষয়ের একটি হচ্ছে মধ্য ইউরোপের ইহুদীদের সমর্থন জার্মানী থেকে ফিরিয়ে নেয়া, এবং দ্বিতীয়টি-- যুদ্ধের পক্ষে আমেরিকান ইহুদীদের সর্বোচ্চ সমর্থন আদায়।

শুধু বেলফুর এবং লয়েড জর্জ নন, উইনস্টন চার্চিল, উড্রো উইলসন, স্মাটস এবং মিত্রশক্তির অন্যান্য নেতৃবৃন্দদেরও ইহুদী স্বার্থের পক্ষে জিতে নেয়া সম্ভব হয়েছে। এই রাষ্টনায়কদের কেউই প্যালেস্টাইনের আরবদের অধিকার এবং অস্তিত্ব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন বলে মনে হয়না। হয় তাঁরা বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন,আরবদের যাযাবর বেদুইন গোত্র ভেবে অনায়াসেই তাদের স্থানান্তর অথবা বাস্তুচ্যুত করে ইহুদীদের জন্যে স্থান সংকুলান সম্ভব (চট করে বলে দেয়ার জন্যে এটাই সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা) ভেবেছেন অথবা তারা এতটাই বিকৃত মস্তিষ্ক যে ইউরোপীয়, আমেরিকানদের বিচারে আরবদের পুর্নাঙ্গ মানুষ ভেবে তাদের অধিকারকে সম্মান দেখাবার কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি। সে যাই হোক চুড়ান্ত পর্য্যায়ে বৃটিশ সরকার নিম্নোক্ত ঘোষনা প্রকাশ করেন-

"মহারাণীর সরকার ইহুদী জনগনের জন্যে প্যালেস্টাইনে জাতীয় আবাসন প্রতিষ্ঠাকে আনুকুল্যের দৃষ্টিতে দেখে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা চালাবে, এখানে পরিস্কার যে প্যালেস্টাইনে অন্যান্য 'অ-ইহুদী জনসাধারন'র নাগরিক এবং ধর্মীয় অধিকার ,অথবা অন্য যে কোন দেশে ইহুদীদের অধিকার এবং রাজনৈতিক মর্য্যাদার পরিপন্থী কোন কিছুই করা হবেনা।" একদিক থেকে এই দলিলের সবচেয়ে ভয়ানক অংশ হচ্ছে দৃশ্যতঃ আরবদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে জুড়ে দেয়া অংশটি। দেশের ৯০% শতাংশ জনগনকে 'অ ইহুদী সম্প্রদায় সমুহ ' অভিহিত করা--- হয় আরবদের সংখ্যা এবং মর্য্যাদা সম্পর্কে দলিল প্রস্তুতকারীদের ক্ষমাহীন অজ্ঞতা কিংবা তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে অসৌজন্যতামুলক সম্বোধনে খাটো করে দেখানোর ইঙ্গিত।

তদুপরি 'নাগরিক এবং ধর্মীয় অধিকার সমূহ' শব্দবন্ধটিও দ্ব্যর্থবোধক। আরবদের কাছে এর মর্মার্থ রাজনৈতিক স্বাধীনতা। পক্ষান্তরে ইহুদী এবং বৃটেন , আমেরিকায় তাদের সহযোগীদের কাছে তার চেয়ে কিছু কম, শেষপর্যন্ত যা ইহুদী রাষ্ট্রগঠনে বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা। বাস্তবেও জেনারেল স্মাট প্যালেস্টাইনের জন্যে ম্যান্ডেট খসড়া করার সময় বিষয়টা পরিস্কার করে দিয়েছিলেন যে বৃটিশ সহায়তায় অভিবাসনের মাধ্যমে ইহুদীরা সংখ্যাগুরু অবস্থানে না পোঁছা পর্যন্ত দেশে কোন স্বায়ত্বশাসন প্রাপ্ত সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হবেনা । ত্রিশ বছর পর পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে আর্নেস্ট বেভিন স্বীকার করেন যে প্যালেস্টাইনে অভিবাসনকারীদের দিয়ে আগ্রাসন অব্যাহত রাখা আবার সেই আগ্রাসনের বিরূপ ফলাফল থেকে স্থানীয় জনগনকে সুরক্ষা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেলফুর ঘোষনায় দুটো পরস্পর বিপরীতমুখী কাজের দায়ীত্ব নেয়া হয়েছিল।

প্যালেস্টাইনের ভেতরে এবং বাইরের আরবেরা বৃটিশ সরকারের এই ঘোষনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রকৃত বিপদ আঁচ করেন। আত্ম-সংরক্ষনের সহজাত অনুভূতি দিয়ে তাঁরা বুঝে নেন স্বত্বাধীকারীদের বাস্তুচ্যুত কিংবা নিশ্চি হ্ন করেই কেবল কোন জাতি গোষ্ঠীর দেশে অন্য জাতি, গোষ্ঠীর 'জাতীয় আবাসন' তৈরী করা যায়। বৃটিশ সরকার প্যালেস্টাইনী আরবদের কাছে যতবেশীদিন সম্ভব বেলফুর ঘোষনার খবর চেপে রাখতে চেষ্টা করেন। শেষাবধি নিশ্চিত শিকারদের কাছে খবর পোঁছে গেলে তারা ১৯১৯ সালে কিং-ক্রেইন কমিশনের কাছে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের ভয় এবং ঘৃণা প্রকাশ করে। প্যারিসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্বাবধানে শান্তি সম্মেলন চলাকালে , উপনিবেশবাদের বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত ব্যবস্থায় (ম্যান্ডেটরী পদ্ধতিতে) নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আরবদের মতামত জানতে সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে এই কমিশন পাঠানোই মিত্রশক্তির একমাত্র উদ্যোগ। প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফার মুলনীতি ছিল- মিত্রশক্তি কোন নুতন উপনিবেশ স্থাপন করবেনা অথবা স্বাধীনকৃত জনগনের কোন দেশ নিজেরা অধিকার করে নেবেনা। এই নীতির সাথে 'সাইকস- পিকট' চুক্তির সামঞ্জস্য বিধানে 'অটোমন সাম্রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু প্রদেশের ক্ষেত্রে ' , যারা যে কোন এক বৃহৎ শক্তির সাময়িক সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্বাধীনতার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট অগ্রসর মনে হবে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক তাদের জন্যে 'ক' শ্রেণীর ম্যান্ডেট তৈরীর কথা বলা হয়। তদুপরি জাতিপুঞ্জের সনদও স্থির করে যে,ম্যান্ডেটরী ক্ষমতা পছন্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের জনগনের ইচ্ছাই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত। উইলসন প্যালেস্টাইন,সিরিয়ায় যৌথ কমিশন পাঠিয়ে সেখানকার জনগনের মতামত যাচাই করার জন্যে লয়েড জর্জ এবং ক্লিম্যন শ' কে আহ্বান জানান। বৃটেন এবং ফরাসী রাষ্ট্র প্রধানেরা এ আমন্ত্রণ গ্রহন করেননি। উইলসন তাতেও না দমে একক আমেরিকান কমিশন পাঠান। আমেরিকান শান্তি প্রতিনিধি দল এবং শান্তি সম্মেলনের ম্যান্ডেট কমিশনের সদস্য দুই নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব ডঃ হেনরী কিং এবং চার্লস ক্রেইন এ'কমিশনের নেতৃত্ব দেন। কমিশন ছয় সপ্তাহ প্যালেস্টাইনে অবস্থান করে অসংখ্য প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত এবং আবেদনপত্র গ্রহন করেন। তাঁরা সেখানে অখন্ড সিরিয়ার (অর্থাৎ লেবানন ও প্যালেস্টাইন মিলিয়ে) পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের মতামত লক্ষ্য করেন ।

তাঁরা সুপারিশ করেন যে, খ্রীশ্চান অধ্যুষিত দেশ হিসেবে লেবাননের স্বায়ত্বশাসনের শর্তে (সিরীয় রাষ্ট্রের আওতায়) যা অটোমন শাসনাধীনেও যথেষ্ট স্বায়ত্বশাসন ভোগ করেছে, ঐক্যের পক্ষে এই প্রবল জনমতকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনই ম্যান্ডেটরি শক্তি হিসেবে আমেরিকাকে (এই বিশ্বাস থেকে যে, এতদঞ্চলে আমেরিকার কোন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা নেই), অন্যথায় বৃটেনকে পছন্দ করে। শুধু মাউন্ট লেবাননের সংখ্যালঘু খ্রীশ্চানরাই ফ্রান্সের পক্ষে মত দেয়। তবে ইহুদীবাদী আশা আকাঙ্খার মুখোমুখি হয়েই কমিশনারদ্বয় অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং ভবিষ্যদ্বানীপুর্ণ এ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন যে, 'তাঁরা তাঁদের জায়নবাদ পর্য্যালোচনা শুরু করেন আগে থেকেই এর পক্ষে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে',আরও এগিয়ে 'প্যালেস্টাইনে বাস্তব পরিস্থিতিতে , সিরীয়দের কাছে গ্রহনযোগ্য এবং মিত্রশক্তির ঘোষিত সাধারণ নীতিমালার মর্মার্থ অনুযায়ী' তাঁরা 'প্যালেস্টাইনকে পরিস্কারভাবে ইহুদীরাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে

প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সীমাহীন অভিবাসনের চরম জায়নবাদী পরিকল্পনার' সংশোধন অতি জরুরী বলে সুপারিশ করেন।

এই শেষবাক্যে কমিশনারদ্বয় ইহুদীবাদী পরিকল্পনার নগ্ন বাস্তবতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিশ্চয়তার মত যুক্ত করেন 'কমিশনের সাথে ইহুদী প্রতিনিধিবৃন্দের আলোচনায় বারংবার এই বাস্তবতা বেরিয়ে আসে যে, জায়নবাদীরা অ-ইহুদী জনগনকে বাস্তবিকই পুরোপুরি বাস্তুহীন করার লক্ষ্যে প্রচলিত নানাবিধ ক্রিয়াকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে'। উপসংহারে কমিশন এক পবিত্র সতর্কবাণী উচ্চারন করেন- "শান্তি সম্মেলন এই বাস্তবতা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারেনা যে, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদীবাদ বিরোধী মনোভাব প্রবল এবং তাকে হাল্কা ভেবে উড়িয়ে দেবার অবকাশ নেই। কমিশনের সাথে আলোচনায় কোন বৃটিশ অফিসার বলেননি যে পেশীশক্তি ছাড়া জায়নবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এতেই প্যালেস্টাইন, সিরিয়ার অ-ইহুদী জনগনের উপর জায়নবাদী পরিকল্পনায় মারাত্মক অবিচারের আশংকা প্রতীয়মাণ হয় । সময়ে সময়ে সেনাবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন হতে পারে,তবে তা কোনভাবেই অন্যায় স্বার্থের পক্ষে নেয়া উচিৎ হবেনা"।

শান্তি সম্মেলনে এই রিপোর্ট পাত্তা পায়নি। বরং ১৯২০ সালে সান রেমোয় অনুষ্ঠিত মিত্রদের চূড়ান্ত সম্মেলনে আরবদের মতামত এবং কিং-ক্রেইন কমিশনের সুপারিশ উভয়কে অগ্রাহ্য করে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। ভৌগলিক সিরিয়াকে প্যালেস্টাইন,লেবানন, এবং ক্ষুদ্রায়ীত সিরিয়া (দামেস্ক, হোমস, হামা, আলেপ্পো শহর গুলোর সাথে ইরাক পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাদের পশ্চাদভূমি নিয়ে, অনেকটা বর্তমান সিরিয়ার আকার)য় বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। লেবানন এবং সিরিয়ায় ফ্রান্সের ম্যান্ডেট পাওয়ার কথাও হয; লেবাননে দখল জারী রেখে সরাসরি শাসনের পাশাপাশি , ফ্রান্সের জিম্মায় দামেস্ক কেন্দ্রীক সিরিয়ায় একটি আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও অনুমোদন দেয়া হয়। বেলফুর ঘোষনায় প্রতিশ্রুত ইহুদীদের জাতীয় আবাসন সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা সহ প্যালেস্টাইনের জন্যে নির্ধারিত হয় বৃটিশ ম্যান্ডেট । চাপের মুখে লয়েড জর্জের কাছে ক্লিম্যনসুর ছাড় দেয়া 'মশুল' প্রদেশ সহ এক অখন্ড ভুখন্ড হিসেবে ইরাকেও সরাসরি শাসনের ম্যান্ডেট থাকবে বৃটেনের।

এসব সিদ্ধান্ত আরবদের মধ্যে মারাত্মক মানসিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। বৃটেন-ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী দাবীর স্বার্থে তাদের আশা-আকাঙ্খাকে বিদ্বেষের সাথে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এমনকি তাদের প্রতি বৃটেনের লিখিত ওয়াদা ভঙ্গ করায় তারা নিজেদের প্রতারিত ভেবেছে। এর প্রতিক্রিয়া এবং দুই মহাযুদ্ধের মধ্যেকার সময়ের নানা ঘটনা পশ্চিমের প্রতি আরবের দৃষ্টিভঙ্গীকে শর্তযুক্ত করেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকের দিন পর্য্যন্ত তার হেরফের হয়নি।

সানরেমো সিদ্ধান্তের পরপরই প্রথম যে ঘটনার মধ্যদিয়ে আরবদের এই প্রতিক্রিয়া টের পাওয়া যায় তা হচ্ছে বাদশা হুসেইনের ছেলে ফয়সল যিনি সিরিয়ায় আগত বৃটিশ সৈন্যদের মিত্ররূপে আরব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তিনি প্রতিশ্রুত স্বাধীন আরবরাষ্ট্র প্রধান হিসেবে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত দামেস্কে অবস্থান নেন। ফরাসীরা এই রাষ্ট্রকে কাগজে কলমে স্বীকৃতি দিতে প্রতিশ্রুত হলেও বাস্তবে বিরুদ্ধাচারন করতে থাকে। তাদের চোখে পুরো আরব আন্দোলনই 'লেভান্ট' অঞ্চলে ফরাসী স্বার্থের বিরোধীতায় বৃটিশ কারসাজি মাত্র। শীঘ্রই লেবাননে ফরাসী এবং দামেস্কে ফয়সলের মধ্যে দ্বন্ধ শুরুর ফলে ফরাসীরা ফয়সলকে চরমপত্র দেয়। বিষয়টা আরব জাতীয় আশা-আকঙ্খা এবং অনুভূতির প্রতি এতটা বিরূপ,এতই অপমানজনক যে, এতে যে কেউ ভাবতে পারে ফরাসীরা হয়তো আশা করছিলো ফয়সল চরম পত্র প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে লেবাননের সাথে সাথে সিরিয়াও দখল করার অজুহাত দেবে। ফয়সলেরও একই ধারনা। দামেস্কে ফরাসী সামরিক জবরদখল ঠেকাতে তিনি অনেক শুভাকাঙ্খীর উপদেশ অগ্রাহ্য করে চরম পত্র মেনে নেন। কিন্তু তাঁর আত্মসমর্পনও কোন কাজে আসেনি। ফরাসী আগ্রাসী বাহিনীর প্রতিরোধে আরব জাতীয়তাবাদীদের বীরত্বপুর্ন তবে ব্যর্থ বাধার মুখে দামেস্ক বেদখল হয়ে যায় এবং ফয়সল দেশত্যাগে বাধ্য হন।

এভাবেই আরবদের সাথে ফরাসী,বৃটিশ এবং জায়নবাদী ইহুদীদের যথাক্রমে সিরিয়া ও লেবানন,এবং ইরাক,প্যালেস্টাইনে দীর্ঘ তিক্ত সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরী হয়। সংঘাতে ফ্রান্সের ভূমিকা ১৯৪৫ সালে সিরিয়া এবং লেবাননের পূর্ন স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। বৃটেনও, বিশেষতঃ প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালে ম্যান্ডেট ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে দ্বন্ধ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। ইরাকের সাথেও তার মত পার্থক্য একরকম শেষ ধরে নেয়া চলে। জর্দানে (১৯২২ সালে প্যালেস্টাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমে আমীর পরবর্তীতে বাদশা আবদুল্লাহর শাসনাধীনে দেয়া হয়) কখনও ইঙ্গ-আরব দ্বন্ধ-সংঘাত হয়নি। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফলতা স্বত্বেও ইহুদীবাদীদের সাথে আরব সংঘাত বাস্তবে কিংবা চূড়ান্ত ভাবে শেষ হয়নি।

তবে এসব দ্বন্ধের গতিধারায় সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি দেবার আগে মিশরের দিকে তাকানো যাক। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে মিশরে জাতীয় পর্য্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের উগ্র এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি লক্ষ্যনীয়। একই সময়ে মিশরীয় এবং আরব জাতিয়তাবাদের স্রোত সমান্তরালে প্রবাহিত হতে শুরু করে। মনস্তাত্বিক দিক থেকে তারা যেন একে অন্যের ধারায় পরিপুষ্ট দু'টি অন্তঃসলীলা নদী ।

(৩)

যুদ্ধ মিশরীয় জাতীয়তাবাদে নানাভাবে গতি সঞ্চার করেছে। অটোমন আধিপত্যের অবসান এবং তদস্থলে বৃটিশ সুরক্ষার (প্রটেক্টরেট) ঘোষনা এতে প্রথম হুল । এরপর আসে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া এবং সুয়েজ এলাকায় পঙ্গপালের মত বিরাট সংখ্যায় বৃটিশ সৈন্যের আগমন, মিশরীয় ফেল্লাহীন (চাষা)দের শ্রমিকবাহিনীতে বাধ্য করা এবং তাদের পশুগুলোকে রসদ সরবরাহের জন্যে রিক্যুইজিশন করা ইত্যাদি। এই ব্যক্তিগত বিষয় সমূহ সাধারণ জনগনের মধ্যে বৃটিশবিরোধী মনোভাব ছড়াতে সহায়তা করে। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদীরা প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ১৪ দফা এবং মিত্রশক্তির গণতান্ত্রিক আদর্শের সাধারণ ঘোষনাতে উৎসাহ পায়।
যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই একটা প্রতিনিধিদল (আরবীতে ওয়াফাদ,এ সুবাদে গড়ে উঠা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের নাম) তাদের বক্তব্য হিসেবে দেশের স্বাধীনতার কথা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বৃটিশ হাই কমিশনারের সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়। এই প্রতিনিধি দলের নেতা সা'দ জগলুল ছাড়া আর কেউ নন।

১৯০৭ সালে বিদায়ী লর্ড ক্রমার এই জগলুলের মধ্যেই উন্নতির প্রতিশ্রুতি দেখেছিলেন। প্রতিনিধি দলের কথায় কান না দিয়ে বৃটিশ সরকার তাদের মাল্টায় নির্বাসন দেন। আগে থেকেই ক্ষুব্ধ কৃষক , জনতা এই ঘটনায় শহুরে জাতীয়তাবাদীদের পাশাপাশি রাস্তায় নেমে এলে প্রবল গণ-জাগরনের সৃষ্টি হয় । যোগাযোগ ব্যবস্থা আক্রান্ত ও ধ্বংস হয়, বৃটিশ সাধারণ ও অফিসার খুন হয়, কিছুদিনের জন্যে কায়রোও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়, এর ধরন ও ব্যাপ্তি তাদের পুরোপুরি বিস্মিত করে। বৃটিশ রাজত্বে একমাত্র চাওয়া সুবিচার এবং নিরাপত্তা পেয়ে গরিষ্ঠ জনগন সুখেই আছে এই রূপকথার গল্পে বিশ্বাস রেখে তারা তখনও জাতীয়তাবাদীদেরকে দেশের সমর্থন বিহীন শহুরে রাজনীতিবিদের গোষ্ঠীই ভেবে এসেছেন। পক্ষান্তরে এই আত্মপ্রসন্ন , এবং বাতিল বিশ্বাসের বিপরীতেই জাতীয় বিপ্লবের নামে কিছু একটা তাদের আক্রমন করে বসেছে। যুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলোতে আরববিশ্বে বৃটেন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অপেক্ষমান সিরিজ বিদ্রোহে এটাই প্রথম; জনপ্রিয় আবেগী শক্তি হিসেবে জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ ঘোষনা; আধুনিক আরব অগ্রগতিতে নুতন যুগের কুলক্ষণ।

এই প্রাদুর্ভাবের সাথে সাথে শুরু হয় মিশরের জাতীয় আশা আকাঙ্খা এবং 'ফরেন অফিস' ও প্রতিরক্ষা প্রধানদের চোখে বৃটিশ রাজকীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে থেমে থেমে এক দীর্ঘ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সমস্যা

সমাধানের শান্তিপূর্ন আলোচনার নিয়মিত বিকল্প হয়ে এসেছে সংঘাত এবং পাল্টা সংঘাত। এতে উভয়পক্ষ উপর্য্যপুরি অনমনীয়তা থেকে আপস এবং আবার আপস থেকে অনমনীয়তায় দোল খেয়েছে। তবে এর চূড়ান্ত ফলাফলে এসেছে মিশরের আশা-আকাঙ্খা তথা স্বাধীনতার বাস্তবায়ন।

প্রথমে এসেছে নির্বাসিত নেতাদের মুক্তি এবং জগলুলের প্যারিস যাত্রা । সেখানে লয়েড জর্জ, ক্লিম্যনস্যু'র নিয়ন্ত্রণে শান্তি সম্মেলনের কেউই জগলুলের দাবী পুর্ন স্বাধীনতার প্রতি কর্ণপাত করেনি বিশেষতঃ ইতোমধ্যেই যেখানে প্রেসিডেন্ট উইলসন বৃটিশ প্রটেক্টরেটকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তদানীন্তন উপনিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারী লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে পরিস্থিতির বিবরণ এবং ভবিষ্যতের জন্যে সুপারিশের উদ্দেশ্যে মিশরে পাঠানো বৃটিশ সরকারের মিশন বরং অধিকতর সফল হয়। মিলনার এবং তার সহকর্মীদের দেখানো পথে শুধু ঈঙ্গা-মিশরীয় নয় বরং ঈঙ্গা-ইরাকী, এমনকি সীমিত পর্য্যায়ে ফ্রাঙ্কো-সিরিয়ান, ফ্রাঙ্কো-লেবানীজ সম্পর্কও যুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে উন্নতি করেছে। ১৯২০ সালে তাঁদের প্রস্তাবে বলা হয় মিশরে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষায় কিছু বৃটিশ অধিকার (মিশরীয় ভূমিতে বৃটিশ সেনা রাখার অধিকার সহ) এর শর্তে মিত্রতা ও সহযোগীতার দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বিনিময়ে বৃটেন মিশরের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেবে। মিলনারের প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার বদলে মিশরীয় জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতা এবং মিশর ও সুদান থেকে পুরোপুরি বৃটিশ সেনা প্রত্যাহারের দাবীতেই বরং অনড় থাকে। সে যা হোক পথ দেখানো হয়েছে; পরবর্তিতে ঈঙ্গা-মিশরীয় বিরোধ নিস্পত্তিতে নেয়া প্রতিটি পদক্ষেপই এই পথ ধরে এগিয়েছে।

১৯২২ সালে বৃটিশ সরকার সুদান প্রশ্ন, বৃটেনের রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা,বিদেশী নাগরিক এবং স্থানীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয় ভবিষ্যতে সমাধানের জন্যে সংরক্ষিত রেখে একতরফা ঘোষনার মধ্যদিয়ে মিশরের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় (মিশরীয়রা তখনও চুক্তির বন্ধনে, এবং পুর্ন স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই মানতে নারাজ) । ১৯১৪ সালে মিশর প্রটেক্টরেট ঘোষিত হলে খেদিবের কার্য্যালয় সুলতানীতে পরিণত হয় এক্ষনে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের স্বার্থে তা আরও একবার মৌখিকভাবে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে মিশর সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ,এবং এর রাষ্ট্রপ্রধান হন রাজা। গনতান্ত্রিক ইউরোপে রাজতন্ত্রের প্রধানদের চেয়ে সাংবিধানিকভাবে তাঁকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হয় । প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষমতা বলতে বুঝানো হয়েছে মন্ত্রীসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও প্রধান মন্ত্রীকে রাজা কর্তৃক বরখাস্ত করার ক্ষমতা, সংখ্যালঘু সরকার অথবা দুর্নীতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ দিয়ে শাসনকার্য্য চালানোর ক্ষমতা। রাজতন্ত্র এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের(ওয়াফাদ) মধ্যে এই নিত্য টানাপড়েনের সরকার ব্যবস্থা প্রায় ত্রিশ বছর ধরে চলে।

অবাধ নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ওয়াফাদ সদস্যরা জিতে আসে আর তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রীকে রাজা (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ফারুখ এবং তাঁর পুত্র ফুয়াদ পুরাতন গোষ্ঠীতান্ত্রীক তুর্কি মানসিকতায় অবজ্ঞাপুর্বক মিশরীয়দের শাসন করতে বেত্রদন্ডই যথেষ্ট মনে করতেন) নিয়মিত বরখাস্ত করেন;মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে দেশ শাসনের জন্যে একজন লৌহমানব নিয়োগ দেন। প্রকাশ্যে রাজপ্রাসাদের লোক কর্তৃক রাজার নিকৃষ্ট স্বার্থ সম্পাদনে পরিচালিত হয়ে কালক্রমে এই একনায়কতন্ত্র গণ-ধিকৃত হয়। বৃটিশদের পরামর্শে কখনওবা প্রবল চাপে শেষতক রাজা যখনই মুক্ত নির্বাচন ঘোষনা দিয়েছেন তখনই আরও একটি ওয়াফাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ নির্বাচিত হয়ে এসেছে। শেষাবধি অন্য আরও অনেক ঘটনা প্রবাহের সাথে, ওয়াফাদ এবং রাজার মধ্যে ১৯৫০ সালে চূড়ান্ত সমঝোতার ফলে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটে। পরিহাসের বিষয় এই যে, এতে সামরিক অভ্যুত্থানেরও পথ সুগম হয়। দীর্ঘকাল রাজনৈতিক গোলকধাঁধাঁয় কাটিয়ে ক্লান্ত, বয়োঃবৃদ্ধ ওয়াফাদ নেতা নাহাস পাশা রাজার সাথে দ্বন্ধ এড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে ফারুখ লাগামহীন শাসনের সুযোগ পেয়ে যায়। জনগনের মুখে মুখে নিন্দা ছড়িয়ে, সামরিক জান্তাদের পথ পরিস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর এই দুঃশাসন অব্যাহত থাকে।

১৯২২ সালের ঘোষনায় মিশরের স্বাধীনতার উপর আরোপিত বিধি-নিষেধের প্রতিবাদে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে নুতন ধরনের সহিংসতা যেমন-গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিতে শুরু করে। ১৯২৪ সালে মিশরীয় সেনাবাহিনীর 'সিরদার' স্যার লী স্টক (সংরক্ষিত প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্বার্থের আওতায় তখনও ঐ পদে ইংরেজরা আসীন হতেন) ,এবং সুদানের গভর্ণর জেনারেল কায়রোতে খুন হলে এক মারাত্মক সঙ্কটের সুত্রপাত হয়। বৃটিশ সরকার মিশরীয় সরকারকে (ওয়াফাদ নেতা জগলুল তখন সরকার প্রধান) সুদান থেকে মিশরীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার (দেশটা পুনর্বিজয় এবং দ্বৈত সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখানে এই সেনাবাহিনীর অবস্থান) এবং ,ক্ষতিপুরণ বাবদ ৫০০,০০০ পাউন্ড দাবী করে চরম পত্র দেয় ; অধিকন্তু এ ভয়ও দেখায় যে, সুদানে নীল নদী থেকে সেচ নির্ভর আবাদী জমির পরিমান মিশরের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসম্মত সীমায় রাখা হবেনা। দাবী মোতাবেক ক্ষতি পূরণ প্রদান, সুদান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেও মিশর ভয়ে কাঁপতে থাকে ; বৃটিশরা বুঝি সুদানে ঘাঁটি গেড়ে নীল নদের জল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আবারও তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে! সুদান প্রশ্নে এ'ভয়ই মিশরকে সবসময় তাড়া করে ফিরেছে। আরও একটি কারনে এ অধ্যায় সবিশেষ গুরুত্বপুর্ন। এসময়েই সুদানে জাতীয়তাবাদের উত্থান, এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে মিশর-সুদান মৈত্রীর সূচনা যা ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য সুদানের প্রথম সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফলে মুখ্য ভূমিকা রাখে।

মিশরীয় শিক্ষক, শরীয়াহ বিচারক, সেনা অফিসার এবং নিম্নস্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রভাবে ১৮৯৮ সাল থেকে সুদানে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমন্ডল গড়ে উঠে। ১৯১৯ সাল থেকে সুদানে মিশরের জাতীয়তাবাদীরা তৎপর, এবং ১৯২৪ এর সংকটকালে মিশরপন্থী সুদানী আন্দোলন খার্তুমে সেনা বিদ্রোহ সহ বেশকিছু বৃটিশবিরোধী ঘটনা ঘটায়। এভাবে আধুনিক রাজনীতির দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় এক নুতন আরব জনগন। ১৯২৪ এর ঘটনায় বৃটিশ চরমপত্রের মুখে মিশরীয় আত্মসমর্পনের পর প্রায় এক দশক যাবৎ সুদানে মিশরীয় প্রভাবের অনুপস্থিতির ফলে সুদানী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মিশরের সাথে যুক্ত হওয়ার বদলে স্বাধীনতার লক্ষ্যে এক নুতন মেরুকরন ঘটে- তাদের নুতন শ্লোগান 'সুদান, সুদানীদের জন্যে'। এই পরিবর্তিত মনোভাব, সুদানীদের পক্ষে বৃটিশ অভিবাকত্বের ছায়ায় সুদানী জাতীয় আশা-আকাঙ্খার অগ্রগতির জন্যে এক হিসেবী পদক্ষেপও বটে; যেহেতু মিশরের সাথে মিত্রতায় সে অগ্রগতি কিছুকালের জন্যে হলেও ব্যাহত হয়েছে।

১৯২৪ সালের পর থেকে বৃটিশ এবং মিশরীয় রাজনীতিবিদগন চারটি সংরক্ষিত বিষয়ে সমঝোতার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক মতবিরোধ দুরীকরণে অসংখ্যবার চেষ্টা চালিয়েছেন কিন্তু সুদান এবং সুয়েজ খাল এ'দুটি জগদ্দল পাথরে এসে বারংবার সব আলোচনা অচল হয়ে পড়তে থাকে। মিশরের দাবী সুদানের উপর সার্বভৌমত্ব এবং সুয়েজ খালের উপর পুর্ন নিয়ন্ত্রণাধিকার, অর্থাৎ উভয়দেশ থেকে বৃটিশ দখলদারীত্বের অবসান তথা-মিশরীয় রাজমুকুটের নীচে দু'দশের রাজনৈতিক একতা। বৃটেন কোনটাই স্বীকার করেনা । দু'পক্ষই স্ব-স্ব অবস্থানে অনড়। এই অচলাবস্থা নিরসনে , ১৯৩৬ সালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মুসোলীনির ক্রমবর্ধমান উচ্চাশা নিশ্চিত একটা অনুঘটকরূপে আবির্ভূত হয়। মিশরীয়দের কাছে নিজেদের মাটিতে বৃটিশ সৈন্যদের অবস্থান যতটা অগ্রহনযোগ্য, ইতালীয় সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশংকাও ততোধিক ঘৃণার। বৃটেনের সাথে আলোচনার জন্যে ওয়াফাদের নেতৃত্বে দেশের সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। এর সফলতা আসে ১৯৩৬'র 'বন্ধুত্ব ও সহযোগীতা'র চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে।

মিশর কোনরকমের রাখঢাক না করেই সুদানের বিষয়টা কিছুকালের জন্যে তুলে রাখে আর বৃটেন একমত প্রকাশ করলো যে উভয় প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য হল সে দেশের জনগনের মঙ্গল সাধন। সব সরকারী চাকুরীতে নিয়োগযোগ্য সুদানীদের অগ্রাধিকার, যদি যোগ্যতাসম্পন্ন সুদানী পাওয়া না যায় তবে বৃটিশ এবং মিশরীয়দের সমান সুবিধা দেয়া হবে। দশ বছরের মধ্যে কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বৃটেন তার সেনা প্রত্যাহার করে নেবে; এবং মিশর তার মিত্রকে সুয়েজ খাল এলাকায় শান্তিকালীন সময়ে ১০,০০০ স্থল সেনা এবং ৪০০ রাজকীয় বায়ুসেনা রাখার জন্যে একটা অঞ্চল ছেড়ে দেবে। যুদ্ধকালীন সময়ে বৃটেন মিশরকে

নিরাপত্তা দেবে , বিনিময়ে মিশর প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য সুবিধাদি প্রদান করবে। শেষতঃ মিশরের কিছু সৈন্য বৃটেন সুদানে ফিরিয়ে নিতে রাজী হয়। চুক্তির মেয়াদ বিশ বছরের তবে দশ বছরের মধ্যে পুনঃবিবেচনাযোগ্য।

বৃটেনের সহায়তায়, 'শর্তসাপেক্ষে আর্থিক বশ্যতা'র অবসানই এ চুক্তিতে মিশরের সবচেয়ে বড় পাওয়া। এযাবৎ যার বলে ইউরোপীয় বসবাসকারীরা মিশরে আর্থিক এবং বিচার বিভাগীয় সুবিধাদি ভোগ করে এসেছে এবং যা মিশরের রাজস্ব ও আভ্যান্তরীন নিরাপত্তার জন্যে ক্রমবর্ধমান ক্ষতি ও অপমানের কারণ হয়ে এসেছে।

(৪)

পশ্চিমা শাসনের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তি সময়ে দ্বিতীয় আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ইরাকে। আরব স্বাধীনতার প্রশ্নে বৃটিশদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে বসরা এবং বাগদাদে বিশেষ প্রশাসনিক সুবিধার কথা সংরক্ষিত ছিল। শেরিফ হুসেইনের দাবী ছিল ইরাক অবশ্যই স্বাধীন আরবভূমির অংশ হবে, তবে দেশের নিম্নাঞ্চল 'পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া'র শর্তে আপাততঃ বৃটিশদের হাতে থাকতে পারে। আরব স্বাধীনতার প্রতি বৃটেন সরকারের সমর্থন সরাসরি অগ্রাহ্য করে ইরাক দখল করার ন্যাক্কারজনক অভিলাষের মাঝখানে বৃটিশ ইন্ডিয়া অফিসে বিষয়টা ঝুলে থাকে।

যুদ্ধকালীন সময়ে খোদ ইরাকে (যদিও গোপন সংগঠন আল আহদ গঠনে ইরাকী আরব অফিসারারই অগ্রনী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন) কোন জাতীয়তাবাদী সাড়া শব্দ ছিলনা। এর প্রতিনিধিরা দেশের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। যখন দেশের সাথে বাকী আরব বিশ্বের যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন তখন তাঁদের অনেকেই আরব বিদ্রোহে এবং স্বাধীনতান্তোর দামেস্কে আরব রাষ্ট্র গঠনে ফয়সলের সাথে ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পরিস্থিতি সম্পুর্ন পাল্টে যায়। দেশের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মোটর গাড়ী আসার ফলে তা বদলেও যায়, নুতোন করে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় ; জাতীয়তাবাদী নেতারা দেশে ফিরতে শুরু করেন। ১৯১৮ সালের ৭ই নভেম্বর আরবদের স্বাধীনতার পুনঃ নিশ্চয়তা, এবং স্থানীয় জনগনের স্বাধীন মত প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট জাতীয় সরকার ও প্রশাসন তৈরীর ইঙ্গ-ফরাসী ঘোষনায় দেশের সচেতন জনগনের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে । এর প্রভাবে ইরাকী জাতীয়তাবাদ দ্রুত পুনর্জন্ম লাভ করে। মরুভুমির অপর প্রান্তে ফয়সলের রাজ্য দামেস্ক থেকে আরব জাতীয়তাবাদী প্রেরনার স্রোতও বাগদাদ, বসরায় এসে লাগে।

বৃটিশরা পড়ে দুই বিপরীতমুখী টানাহেঁচড়ার মাঝখানে। একদিকে তারা ইঙ্গ -ফরাসী ঘোষনার উদার নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অন্যদিকে বৃটেনের প্রতিনিধি এবং ইন্ডিয়া অফিস চায় ইরাকে সরাসরি বৃটিশ শাসন। তন্মধ্যে পরবর্তীদের প্রভাবের কার্য্যকারীতা এতটাই বিস্তৃত হয় যে, লর্ড কার্জনের মত সাম্রাজ্যবাদীকেও তিক্ততাভরে তাদের সৃষ্ট প্রশাসনকে "বৃটিশ পরামর্শকদের সহযোগীতায় আরব সরকার নয় বরং আরব উপাদানে সংক্রামিত বৃটিশ সরকার" আখ্যায়িত করতে হয় । মিশরের মত ইরাকেও বৃটিশ সরকার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে। তারা গুরুত্বহীন সংখ্যালঘুদের অসার আন্দোলন ভেবে জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বুঝতে কিংবা এর শক্তি পরিমাপে ভুল করে। তাদের পুরোন বিশ্বাস ইরাকী জনগনের বৃহত্তর অংশ শুধু নিরাপত্তা ও সুবিচার প্রদায়ী প্রশাসন চায় এবং এই চাওয়ার অনুকূলে তারা জ্ঞাতি জাতীয়তাবাদীদের বিপরীতে বৃটিশ প্রশাসনকেই সমর্থন করে ।

পক্ষান্তরে বাস্তবতা এই যে ইরাকী মুসলিম আরবেরা কর্তৃত্বপরায়ণ শাসক বিদেশী খ্রীশ্চানদের ঘৃণা করেছে। তাদের এই ঘৃণা আরও উস্কে দিয়েছে বলশেভিক উৎস,এবং তুর্কি ও দামেস্ক (তুর্কির সাথে মিত্রশক্তির শান্তি

আলোচনা তখন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বন্ধ । দামেস্কে ইতোমধ্যে 'আল আহদ' সদস্যদের দ্বারা ফয়সলের বড় ভাই আবদুল্লাহ ইরাকের রাজা ঘোষিত) থেকে আসা ইন্ধন।

অসন্তোষের অরাজনৈতিক কারন বলতে মুলতঃ তুর্কি শাসনকালের মত চলতে থাকা অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, কর আদায়ে বৃটিশদের কড়াকড়ি । কিন্তু যে শক্তি সুপ্ত একতা এবং সাধারণ অসন্তোষকে পথ দেখিয়ে শেষাবধি সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত করেছে তা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ; অন্যভাবে বলা যায়–স্বাধীনতার জন্যে শিক্ষিত শ্রেণীর উদগ্র কামনা। সান রেমো ঘোষনায় ইরাকের উপর বৃটিশ ম্যান্ডেট ঘোষনার পরপরই ১৯২০ সালের গ্রীষ্মে প্রায় তিন মাস স্থায়ী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। মুলতঃ রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রচারে প্রভাবিত গোত্র সমূহ এবং ফয়সলের উৎখাতের পর দামেস্ক থেকে ফিরে আসা ইরাকী অফিসারেরা বিদ্রোহে মুল শক্তি যোগায়। বিদ্রোহে প্রায় ৮০০০ ইরাকী নিহত হয়, পক্ষান্তরে বৃটিশ পক্ষে ভারতীয় সেনা সহ মারাত্মক হতাহতের সংখ্যা ৪০০জন, তদুপরি ভারত থেকে ভারী যুদ্ধসরঞ্জামাদি সরবরাহ বাবদ বৃটিশ ব্যয় প্রায় ৪০,০০০,০০০পাউন্ড। স্থাপনা, রেলওয়ে ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ৪০০,০০০ পাউন্ড।

বিদ্রোহের আগে, স্বাধীনতার লক্ষ্যে একটা ইরাকী রাষ্ট্র গঠনের বৃটিশ ঘোষনা ছিল। বিদ্রোহের পর ইরাক বিষয়ে বৃটিশ মনোভাবে ব্যাপক পরিবর্তন আসে তা নি:সন্দেহে বলা যায়। বুঝা গেল প্রতিশ্রুত রাষ্ট্র শুধু তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠাই নয় বরং ইতোপুর্বে যা আশা করা হয়েছে তার চেয়ে আরো বাস্তব দৃশ্যমান গতিতে, পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দিকে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ১৯১৯ সালের মিশরীয় বিদ্রোহের ফলে যেমন হয়েছে মিলনার মিশন এবং ১৯২২ সালে স্বাধীনতার ঘোষনা ঠিক একইভাবে ইরাকী বিদ্রোহের ফলেও হয়েছে ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত কায়রো সম্মেলনে এবং বৃটিশ উপনিবেশ সংক্রান্ত সেক্রেটারী হিসেবে মিলনারের স্থলাভিষিক্ত চার্চিলের সিদ্ধান্ত-- নির্বাচিত সংসদ এবং মন্ত্রী পরিষদ সহ ইরাকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। যদিও কিছুদিনের জন্যে বৃটিশ হাই কমিশনার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখবেন,ইরাকী মন্ত্রীদেরও বৃটিশ উপদেষ্টা থাকবে তথাপি সরকার হবে খাঁটি ইরাকী প্রতিষ্ঠান। তদুপরি 'সান রেমো' কনফারেন্সে পাওয়া ইরাকের উপর বৃটিশ ম্যান্ডেট থাকা সত্বেও বৃটেন প্রস্তাব করে যে, ইরাকী জনগনের বৈধ মতামত বিহীন, উপর থেকে আরোপিত ম্যান্ডেটের বদলে 'বন্ধুত্ব এবং সহযোগীতা'র চুক্তি মোতাবেক তার সাথে নুতন রাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে ।

সিরিয়া থেকে ফরাসীদের হাতে বহিস্কৃত ফয়সলকে ইরাকী সিংহাসনে মনোনয়ন দেয়া হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগন তা মেনেও নেয়। একদিকে বৃটিশ অন্যদিকে চরম জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ভারসাম্য রেখে তিনি দীর্ঘ বারো বছর ইরাক শাসন করেন। জাতীয়তাবাদীদের চোখে বৃটিশ সরকারের সহায়তায় সিংহাসন পাওয়ার অপবাদ সত্বেও তিনি ব্যক্তিগত সততা,বুদ্ধিমত্তা ও আত্মমর্য্যাদার মাধ্যমে হাশেমীয় পরিবারের প্রতি প্রচলিত বিতৃষ্ণা কাটিয়ে নিখাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

তা সত্বেও ১৯২২ সালে বৃটেন এবং ইরাকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি জাতীয়তাবাদী আশা–আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটায়নি। চুক্তি মতে ইরাকের বিদেশ নীতি এবং অর্থনীতিতে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে যায়। দেশের মুল ক্ষমতা ইরাকী মন্ত্রীদের বদলে বৃটিশ উপদেষ্টা, এবং রাজার পরিবর্তে হাই কমিশনারের হাতে থেকে যায়। জাতীয়তাবাদীরা, যাদের দিকে ফয়সলও ঝুঁকেছেন, এই পরিস্থিতি রুখে দাঁড়ায় কিন্তু বৃটিশ হাই কমিশনারের চরম পত্রের কাছে আত্মসমর্পন করে। এসবের মধ্যদিয়ে মোটামুটি স্থির হয় ইরাক অন্ততঃ সম্ভাব্য এক স্বাধীন রাষ্ট্র, যদিও এই প্রথম চুক্তির শর্তাবলী মুলতঃ ম্যান্ডেটেরই শর্তাবলী তবুও এই চুক্তির পরবর্তীতে সংশোধনযোগ্যতা ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দেয় যা ১৯৩৩ এর চুক্তিতে সন্নিবেশিত হয় এবং ইরাক সরকারের উপর থেকে ম্যান্ডেট সহ সর্বপ্রকার বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ খারিজ করা সম্ভব হয়। ১৯৩২ সালে ইরাক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আশ্রিত'র বদলে খোদ বৃটেন কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়ে ,সদস্য পদ লাভ করে । আধুনিক আন্ত

জাতিক রাজনীতির মঞ্চে পশ্চিমা জাতি সমুহতো বটেই ,আরব জাতীয়তাবাদীদের চোখে তখনও সাম্রাজ্যবাদী, বৃটেনেরও সমানে সমান প্রথম আরব রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হয়।

১৯৩০ সালের পর ইরাকের স্বাধীনতায় একমাত্র প্রতিবন্ধকতা ছিল বৃটেনের মিত্র হিসেবে মেনে নেয়া বাধ্য বাধকতা সমুহ । ইরাকের মাটিতে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি রাখা এবং যুদ্ধকালীন সময়ে বৃটেনকে সবরকম সাহায্য সহযোগীতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিই এই বাধ্যবাধকতা। তবুও ইরাকী জাতীয়তাবাদীরা (ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি নিয়ে মিশরীয় জাতীয়তাবাদীদের মত) এই বলে প্রতিবাদ করে এসেছে যে সে সময় তাদের হাতে চুক্তি সহ স্বাধীনতার বিকল্প কিছু ছিলনা। এভাবে চুক্তির পক্ষে মোটামুটি জনমতের ভিত্তিতে নুরী পাশা আল সায়ীদ বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মাধ্যমে সে দেশের জনগনকে আন্তরীক কৃতজ্ঞতা,চুক্তি মেনে চলার আন্তরীক নিশ্চয়তা দিলেও ইরাক জুড়ে বৃটেনের জন্যে ভালবাসা কিংবা মিত্রতার প্রতি খুব একটা আশাবাদ ছিলনা।

আধুনিক রাষ্ট্রে পরিনত হওয়ার উপযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ , অটোমন অর্থনৈতিক, শর্ত দাসত্ব থেকে মুক্তিতে সহায়তা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গ্রহনযোগ্যতা সৃষ্টিতে ইরাকের প্রতি বৃটেনের সবরকমের সহযোগীতা,সাইকস-পিকট চুক্তি, ১৯১৮ সালে তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা দেয়ার বদলে প্রথমেই ম্যান্ডেট আরোপ, অতীত বারো বছরের বৃটিশ শাসনের তিক্ততা সর্বোপরি বৃটিশ সেনা ঘাঁটি রাখার বাধ্যবাধকতা সহ মিত্রতার স্মৃতি এসে ইরাকী জাতীয়তাবাদীদের চোখে সবকিছু ম্লান করে দেয়। এসব কারণ সমুহের সাথে, বৃটিশ প্রশাসনের তত্বাবধানে ফিলিস্তিনি আরবদের উপর ক্রমাগত জায়নবাদ চাপিয়ে দেয়ার নীতি যার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই এরা সহিংস প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে এসেছে; এই বিদ্বেষকে আরো জোরালো করে।

১৯১৪ সালের আরব বিদ্রোহের হোতা পুরোন উদার পন্থীদের নেতৃত্বে রাজনীতি সচেতন জনগনের দাবীর প্রেক্ষিতে, ম্যান্ডেট কালীন ইরাকেও একরকম গণতান্ত্রিক সরকার দেয়া হয়। সমসাময়িক পশ্চিমা গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে এই গনতন্ত্রের ধরন এবং মর্মে আকাশ পাতাল ব্যবধান ছিল ঠিকই কিন্তু তারপরেও বিশাল এক অশিক্ষিত জনগনের দেশে এর কোন বিকল্পও ছিলনা । বাদশা ফয়সলের জীবদ্দশায় তাঁর সম্মান এবং বিজ্ঞতায় দেশের ভঙ্গুর গণতন্ত্র সুস্থ বিকাশের পথে অগ্রসর হওয়ার আশা ছিল। কিন্তু ইরাকের স্বাধীনতা লাভের পরপরই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এই আশার দুয়ারও হতাশাব্যঞ্জকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ সংসদীয় চর্চার মাধ্যমে গড়ে উঠা শিক্ষিত নির্বাচক মন্ডলীর অবর্তমানে, ক্রমবর্ধমান সামাজিক অবক্ষয় এবং পদলোভী রাজনীতিবিদদের পারস্পরিক কুটচালে সরকারের মধ্যে যে শক্তি শুন্যতার সৃষ্টি হয় তা-ই অবশ্যাম্ভাবীরূপে সেনাবাহিনীকে টেনে আনে । দুই প্রতিবেশী পারস্য এবং তুর্কির সফল সেনা একনায়কতন্ত্রের প্রভাবও পড়েছে নিশ্চয়। কিন্তু ইরাকে সেরকম কোন বিখ্যাত সেনা একনায়কের উত্থান হয়নি বরং সেনাবাহিনী রাজনীতিবিদদের পক্ষে একের পর এক চক্রান্তের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। ১৯৩৬-১৯৪১ পর্য্যন্ত সময়টা এরকম একাধিক সেনা অভ্যুত্থানের সরকার হিসেবেই বিবেচিত। এই পাঁচ বছরে, স্থায়ী অস্থিরতার মধ্যে দেশে সাতবার সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। এভাবে ইরাকই প্রথম আরব দেশ যেখানে গণতন্ত্রের দুর্বলতা, এবং প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সংস্কার সাধনে ব্যর্থতা সেনাবাহিনীকে রাজনীতি এনেছে। পরবর্তীতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে সিরিয়া এবং মিশরে ; তবে এক্ষণে আরব জাতীয়তাবাদের সাথে পশ্চিমের আরেক সংঘাতের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ এবং পশ্চিমা শক্তির সাথে তাদের স্ব স্ব সম্পর্কের বিবর্তনের বিচারে সিরিয়া এবং লেবাননের ইতিহাস বস্তুতঃ ইরাকও মিশরের মতই। পার্থক্য শুধু এখানে পশ্চিমা শক্তি বলতে ফ্রান্স। এই কর্তৃত্বপরায়ন বিদেশী শাসন এখানে জাতীয় অনুভূতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি,ফলে অসন্তোষ শেষাবধি সসস্ত্র বিদ্রোহে রূপ নেয়,যা শাসক শক্তিকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। বিদ্রোহ কোনমতে দমন কিংবা চাপা দেয়া সম্ভব হলেও , শাসক গোষ্ঠী মৌলিক উদ্দেশ্যের পুন:বিন্যাস করতে বাধ্য

হয়। ম্যান্ডেটের বদলে ফ্রান্সের কর্তৃত্বে নির্দিষ্ট কিছু সামরিক ঘাঁটি দেয়ার শর্তে 'বন্ধুত্ব এবং সহযোগীতা'র চুক্তিতে ক্রমবর্ধমান জাতীয় আশা আকাঙ্খার স্বীকৃতিই স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যায়।

শুরু থেকেই 'লেভান্টে'র পরিস্থিতিতে ইরাক অথবা মিশরের চেয়ে একটি গুরুত্বপুর্ন পার্থক্য বিদ্যমান। আরবদের মধ্যে প্রচলিত ধারনা যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লেবানীজ আরব খ্রীশ্চানেরাই (বাস্তবে এদের অনেকেই ১৯১৪-১৮ সময়কালে স্বাধীনতার জন্যে তুর্কি সামরিক আইনে প্রান দন্ড ভোগ করেছে) সম্ভাব্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের পরিবর্তে ফরাসী ম্যান্ডেটকেই স্বাগতম জানিয়েছে । এই দলে মুলতঃ ধর্মীয় সম্পর্কে রোমের সাথে আবার ফরাসী মিশনারী স্কুলে শিক্ষার মাধ্যমে ফরাসী আবেগ অনুভুতিতে যুক্ত মেরোনাইট এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভুক্ত খ্রীশ্চানেরা; গ্রীক অর্থডক্স এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের অনেকে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলিম আধিপত্যের ভয়ে খ্রীশ্চান শাসক শ্রেণীকে পছন্দ করেছে। তবে মিশরের 'কপ্ট' কিংবা ইরাকের আসিরিয়ান অথবা কুর্দিদের কেউই লেবানীজদের মত আচরন করেনি। অনেক 'কপ্ট'ই সে সময় মনে মনে বৃটিশ দখলদারীত্বে সন্তুষ্ট থাকলেও প্রকাশ্যে গভীর উৎসাহে জাতীয়তাবাদী ধারনা ধারণ করেছে এমনকি সাদ জগলুলের নেতৃত্বে ওয়াফাদ এ নেতৃস্থানীয় ভুমিকাও পালন করেছে। আসিরিয়ানরা ইরাকের এক অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী , আলাদা দেশ দাবী করার মত জনগন নয়। সংখ্যা বিচারে মুসলিম কুর্দরা আসিরিয়ানদের চাইতে বড় হলেও ,স্বায়ত্ব শাসনের স্বপ্ন লালন করলেও তারা কখনও এমনকি অটোমন সাম্রাজ্যের লেবানীজ খ্রীশ্চানদের মত আলাদা কোন 'ব্লক' সৃষ্টি করেনি ।

সুতরাং লেবাননে স্বেচ্ছায় পরনির্ভর এবং অনুগত মিত্র পাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই ফরাসীরা লেভান্ট অঞ্চলে এসেছে। এবং শুরু থেকেই আরব আন্দোলনের প্রতি সহিংস দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছে। বৃটিশরা ইরাকে কঠোর, আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি তাদের দায়-দায়ীত্ব পালনের গতি পদ্ধতিতে ব্যর্থও হতে পারে কিন্তু মুলতঃ তারা আরব জাতীয়তাবাদের শত্রু ছিলনা । পক্ষান্তরে সিরিয়ায় ফরাসীরা তার বিপরীত। আমরা ইতোপুর্বে দেখেছি কিভাবে ওরা ফয়সলের রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। আরব জাতিয়তাবাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের বিদ্বেষ সেখানেই শেষ হয়নি। ফ্রান্স গোড়া থেকেই আরব আন্দোলনকে প্রথমতঃ বৃটিশ মদদ পুষ্ট আন্দোলন মনে করে এবং দ্বিতীয়তঃ এশিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদীদের যে কোন সাফল্য উত্তর আফ্রিকার আরবদের মধ্যে ফরাসী বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ভয়ে বরাবরই শত্রু ভেবে এসেছে ।

লেভান্টে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করতে ফ্রান্স দু'রকম নীতি অবলম্বন করে। তারা একদিকে খ্রীশ্চান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সাথে সাইডন , ত্রিপোলী সহ মুল ভুখন্ড এবং উপকুলীয় মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো যুক্ত করে সিরীয় আরব জাতীয়তাবাদীদের মাঝখানে ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা খাড়া করে। অন্যদিকে সংকীর্ণ বিভেদ নীতির মাধ্যমে খোদ সিরিয়াকে চারটি প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করে আরব চেতনাকে খুন করার চেষ্টা চালায়। এভাবে দ্রোজ পার্বত্য এলাকায় একটা প্রশাসন,লাতাকিয়ার দিকে 'আলাউই' (বিচ্ছিন্ন শিয়া গোত্র হিসেবে) দের জন্যে একটা প্রশাসন, জনসংখ্যায় তুর্কিদের আধিক্য বিচারে আলেকজান্দ্রাত্তায় আরেক প্রশাসন, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের নিয়ে দামেস্ক কেন্দ্রীক বাকী সিরিয়ায় প্রধান প্রশাসন তৈরী হয়। পৃথিবীর আর কোথাও এমন ভাগ করে শাসন করার নজীর দেখা যায়নি। ধর্মীয়, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভীত সন্ত্রস্ত করার সম্ভাব্য সব আয়োজন করা হয়। বাস্তবে সংখ্যালঘুদের মধ্যে এ ভয়ের যথার্থ কারণ থাকলেও পুরো দেশের স্বার্থে তা দুর করার চেষ্টার পরিবর্তে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দেয়ার ফরাসী অপরাধ খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

ফরাসী স্বেচ্ছাচারী নীতির উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন,১৯২৫ সালে তার বিরুদ্ধে "জেবল দ্রোজ" অঞ্চলে অসন্তোষ দানা বাঁধে; বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সীমিত এলাকায় হলেও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনের অংশ গ্রহনের মধ্য দিয়ে তা জাতীয় চরিত্র ধারন করে। তাদের প্রতিরোধ করতে আসা প্রথম ফরাসী সেনাদল

পরাস্ত হয়। বিদ্রোহীরা দামেস্ক পোঁছে শহর দখল করতে ব্যর্থ হলেও শহরের বাইরে মাস কয়েক সক্রিয় অবস্থান নেয়। তাদের তাড়াতে ফরাসীরা ঘন বসতি এলাকাতেও বিনা নোটিশে বোমা বর্ষন করে। বিদ্রোহে লেবানীজ খ্রীশ্চানদের অংশ গ্রহন না হোক অন্ততঃ সমর্থন পাওয়ার জন্যে দ্রোজ নেতারা শ্লোগান দেন ," ধর্ম আল্লাহর কিন্তু মাতৃভুমি সবার"। কিন্তু লেবানন,সিরিয়ার খ্রীশ্চানরা অন্তর থেকে বিদ্রোহ সমর্থন করেনি। তারা তখনও ১৮৩০ সালের গুণ্ডহত্যার কথা ভুলেনি কিংবা দ্রোজনেতাদের বিশ্বাস করেনি। দখলদার খ্রীশ্চান শক্তির কাছ থেকে ১৮৩০ সাল থেকে পেয়ে আসা নিরাপত্তাই তাদের কাছে বড়। খ্রীশ্চান, দ্রোজ, এবং মুসলিমদের সম্মিলিত জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে ফরাসীদের কাছ থেকে পুর্ন স্বাধীনতা এবং খ্রীশ্চান জনগোষ্ঠীর জন্যে কোন বিদেশী নিরাপত্তা ছাড়াই স্বদেশী সরকার প্রতিষ্ঠায় তাদের আরও অনেক দিন লেগে যায়।

বিদ্রোহ মোকাবিলায় লেবানন সরকারকে অনেক ভারী ও ব্যয়বহুল যুদ্ধাস্ত্র আনতে হয়। বিদ্রোহের ফল স্বরূপ তারা সিরিয়া ও লেবাননে তাদের হাই কমিশনার পরিবর্তন করে এবং আগের কতৃত্বপরায়ন নীতি থেকে সরে আসে । প্রথমে লেবানন এবং পরে সিরিয়ায় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়, সিরিয়া খন্ড খন্ড রূপ থেকে পুনঃ একত্রিত হলেও আলেকজান্দ্রাত্তা হারায় (যুদ্ধের কিছু আগে ফ্রান্স এ'এলাকা বৃটেনের সম্মতিতে, নেক নজর পাওয়ার জন্যে জামানত স্বরূপ তুর্কিদের কাছে সমর্পন করে)। সর্বোপরি ফ্রান্সও বৃটিশদের মত ম্যান্ডেটের বদলে, ইরাক ও মিশরে চুক্তি সম্পর্কের দিকে অগ্রসর হয়।

১৯৩৬ সালে লিয়ঁ ব্লামের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সাথে চুক্তিতে সিরিয়া , লেবাননের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় । সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভে ফ্রান্স তাদের সহায়তা করে। ফ্রান্স সামরিক মৈত্রী হিসেবে সিরিয়া ও লেবাননকে সুরক্ষা ,এবং বিনিময়ে যুদ্ধকালীন সময়ে তারাও ফ্রান্সকে সবরকমের সাহায্য, সুবিধা দিতে রাজী হয়। দুই চুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে সিরিয়ায় ফ্রান্স দু'টি স্থায়ী বিমান ঘাঁটির অধিকার পায়, তবে পাঁচ বছর মেয়াদে নির্দিষ্ট দু'টি এলাকা ছাড়া সিরিয়ার আর কোথাও কোন ফরাসী সৈন্যরাখার সুবিধা থাকেনা । পক্ষান্তরে লেবাননের সাথে চুক্তিতে ফ্রান্স যে কোন স্থানে যত পরিমানে খুশী, অনির্দিষ্টকালের জন্যে নৌ,বিমান, স্থল সেনা রাখার সুবিধা পায়। এই পার্থক্য একদিকে ফ্রান্সের প্রতি খ্রীশ্চান অধ্যুষিত লেবাননের অতি সন্তুষ্টি এবং ফ্রান্সের কাছে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী ঘাঁটি হিসেবে লেবাননের গুরূত্ব প্রমাণ করে। চুক্তি দু'টি সিরিয়া এবং লেবাননের পার্লামেন্টে অনুমোদন পেলেও , ইতোমধ্যে ব্লাম সরকারের পতনের ফলে ফরাসী সিনেটের অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধ পরবর্তী তিন বছরে এই পরিস্থিতি আরও বদলে যায়।

চুক্তিতে সিরিয়ার চেয়ে ফ্রান্সকে (অথবা সমকালীন সময়ে যে কোন মুসলিম আরব রাষ্ট্র কতৃক কোন ইউরোপীয় শক্তিকে ছাড় দেয়ার আগ্রহ) বেশী সুযোগ সুবিধা দেবার পক্ষে লেবানীজ খ্রীশ্চানদের উৎসাহে এসময়ে লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন আসে। একই সাথে পরিবর্তন আসে ১৯১৮ সাল থেকে চলে আসা আরব জাতীয়তাবাদীদের প্রতি তাদের দৃষ্ঠিভঙ্গীতেও। মেরনাইটদের একটা অংশ তখনও তাদের অতি মাত্রায় ফরাসী অনুরাগ ধরে রেখেছে। মুসলিম এবং আরবজাতীয়তাবাদীদের প্রতি অবিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে তারা তখনও লেবাননে চিরদিনের জন্যে ফরাসী প্রটেক্টরেট প্রত্যাশী। এই মেরনাইটরা সাংস্কৃতিক,আত্মিক যোগাযোগে যতনা আরব তারচেয়েও বেশী ফরাসী। তাদের কতেক অতিমাত্রায় তার্কিক ধর্মবেত্তা নিজেদের আরব উত্তরাধিকার অস্বীকার পুর্বক পৌরাণিক ফিনিসীয় তথা অনারব দাবী করে।

তবে অধিকতর জ্ঞানী-গুনী, প্রভাবশালীদের নেতৃত্বে মেরনাইটদের আরেক অংশের ক্রমাগত ফরাসী-মোহমুক্তি **ঘটতে** থাকে; তাঁরা নিশ্চিত লেবানন কোনভাবেই মুসলিম আরব বিশ্ব থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে রাখতে পারেনা। এ' পুনর্বিন্যাসের ফলে, 'লেবানীজ খ্রীশ্চানেরা মুসলিমদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেবে এবং বিনিময়ে মুসলিমরা পশ্চিমা ভাবধারায় পুষ্ট বৃহত্তর খ্রীশ্চান জনগন অধ্যুষিত লেবাননকে এক বিশেষ পরিচয়ের আলাদা আরব রাষ্ট্র হিসেবে মানবে; সিরিয়া কিংবা অন্যকোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদেশের সাথে সংযুক্ত করবেনা' এই সমঝোতায় এক নুতন লেবানীজ আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। বিপর্য্যয়ের ভাগ্য নিয়ে,

একই সময়ে সিরিয়ান পপুলার পার্টির মাধ্যমে আরও এক আন্দোলন গড়ে উঠে। বিভেদ নীতি অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তবে সিরীয় জাতীয়তাবাদ আরব জাতীয়তাবাদের চেয়ে ভিন্নতর বিবেচনায় সিরিয়া লেবাননকে এক করার এই আন্দোলনে লেবানীজ খ্রীশ্চান তরুন-তরুনীরা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখেন। উভয় আন্দোলনেই ফরাসীদের বিরুদ্ধে লেবাননের মুসলিম এবং খ্রীশ্চানরা জোটবদ্ধ, এই ঐক্যের প্রভাব অনুভূত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলোতে ।

(৬)

এতক্ষন আমরা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালে মিশরের, ১৯২০ সালে ইরাকের, ১৯২৫ সালে সিরিয়ার তিন তিনটি আরব বিদ্রোহ আলোচনা, এবং ১৯৩৬ সালে ঈজ্ঞা-মিশরীয়, সিরীয়-লেভান্টস্টেট সমুহের বিরোধের আপাতঃ নিষ্পত্তি লক্ষ্য করেছি। একই বছর অর্থ্যাৎ ১৯৩৬ সালেই সংঘটিত হয়েছে চতুর্থ (আপাতত: মরক্কোর কথা বাদ দিলে) আরব বিদ্রোহ। যুদ্ধমধ্যবর্তী সময়ে আরবদের জাতীয় অধিকারের জন্যে সবচে' তিক্ত, নিরবচ্ছিন্ন এই সশস্ত্র সংঘাতের নাম প্যালেস্টাইন বিদ্রোহ।

প্যালেস্টাইনে বিদ্রোহ বেশ দেরীতে এসেছে মনে হলেও ১৯২০ সাল থেকেই এখানে ছোটখাটো প্রতিরোধ, প্রতিবাদ অব্যাহত থেকেছে। ১৯১৯ সালের শান্তি সম্মেলন এবং সাইকস-পিকট চুক্তি মোতাবেক কৃত্রিম সীমারেখার বিপরীতে শুরু থেকেই আরব জাতীয়তাবাদের জ্বলন্ত ইস্যু হিসেবে প্যালেস্টাইন প্রশ্ন আরবদেশগুলোর সাধারণ দুশ্চিন্তার বিষয়। এর কারন , জায়নবাদীরা যে সেখানে অথবা যে কোন আরবভূমিতে স্বল্পস্থায়ী ইউরোপীয় দখলদারীত্বের চেয়েও মারাত্মক বিধ্বংসী এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিতে লিপ্ত তা বুঝতে আরবরা দেরী করেনি। বৃটিশ সেনাবাহিনীর মিশর ত্যাগ কিংবা সিরিয়া,ইরাকে স্বাধীনতার ঘোষনা অত শীঘ্র না এলেও দীর্ঘমেয়াদে ঘটনার ইতর বিশেষ হতোনা। এ' দেশগুলো বিদেশী বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি, বরং বরাবরই স্ব স্ব জনগনের সম্পত্তি ছিল; দেশ হারানো কিংবা দেশেই সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয় এসব আদিবাসী জনগনের ছিলনা । আগে পরে বৃটিশকে মিশর, ইরাক, এবং ফ্রান্সকে সিরিয়া ছাড়তেই হতো; এবং এভাবে বিষয়টা চুকেবুকেও যেত। কিন্তু প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে বৃটিশরা স্থানীয় জনগনকে ঠেসে ধরেছে (প্যালেস্টাইনে বৃটিশ ম্যান্ডেটের বাস্তব ফলাফল তাই) যাতে পৃথিবীর সর্বত্র থেকে ,যত খুশী সংখ্যায় ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা প্যালেস্টইনে এসে এমন এক ভিন্ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, যেখানে আদিবাসী আরব জনগন হয় দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক হয়ে থাকবে নয়তো একেবারেই দেশ থেকে বহিস্কৃত হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্যালেস্টাইনের আরবদের কাছেই আঘাতটা অত্যন্ত করুনভাবে এবং সরাসরি লেগেছে। প্রতিবেশী আরবদেশগুলোর জনগনদের কাছে এই আঘাত লেগেছে সমব্যথী হিসেবে, মধ্যপ্রাচ্যে জোরপুর্বক ইহুদী জাতীয়তাবাদের আগ্রাসনে সবার একই বিপদ আশংকায়।

জায়নবাদের প্রতি আরবদের এই প্রতিক্রিয়া পাইকারী ইহুদী বিরোধীতার পরিচয় নয়। এই বইয়ের প্রথমদিকেই যেমনটা আমরা দেখেছি বাগদাদ এবং স্পেনে খলিফাদের তত্বাবধানে আরবসভ্যতায় ইহুদীরা পান্ডিত্য , বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সসম্মানে গৃহীত হয়েছেন, মাহাত্ম্যপুর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আরব এবং অটোমন সাম্রাজ্যের পুরো ইতিহাসব্যাপী আরবদেশসমূহে সংখ্যালঘু ইহুদীদের সহ্য করা হয়েছে। ইউরোপে যখনই ইহুদীরা নিয়মিত নিপীড়নের শিকার হয়েছে,মুসলিম শাসনের আওতায় তারা আশ্রয় পেয়ে এসেছে। জায়নবাদীরা যখন ফিলিস্তিনে আসা শুরু করে তখনও সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ বংশপরম্পরায় কয়েক হাজার ইহুদীর বসবাস। জনগনের অংশ হিসেবে তাদের সেখানে অবস্থান; তারা কখনও নিগ্রহের শিকারও হয়নি। নাগরিক জীবনে কোন অসুবিধা ভোগ করে থাকলে তাও মুসলিম সমাজের দ্বিতীয় শ্রেনীর

নাগরিক খ্রীশ্চানদের মত নয়। আরবরা জায়নবাদের মধ্যে ইহুদী ধর্ম কিংবা জাতকে প্রতিরোধ করেনি । তাদের প্রতিরোধ ইহুদী রাষ্ট্রের জন্যে প্যালেস্টাইন দখলকারী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ; এবং তা থেকে সৃষ্ট সংঘাত অবশ্যই একটা দেশের সুপ্রাচীন জনগনকে বাস্তুচ্যুত করার লক্ষ্যে বহিরাগত আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক সংঘাত।

জায়নবাদীদের উদ্দেশ্য শুরু থেকেই পরিস্কার। যে সত্য আবিস্কারে হতভম্ব হওয়া ১৯২০ সালের কিং-ক্রেইন কমিশনের কাছেও তা পরিস্কার ছিল । তুর্কিদের বিতাড়ন এবং ম্যান্ডেটের আওতায় বেসরকারী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার মাঝামাঝি সময়ে বৃটিশ সেনা প্রশাসকের কাছেও তা পরিস্কার ছিল। ১৯২২ সনে হে ক্রাফট কমিশনের (বৃটিশ সরকারের সৃষ্ট এই সমাধান অসম্ভব সমস্যা তথা প্যালেস্টাইনে গোলমাল ও উত্তেজনার হেতু পরীক্ষা এবং সমাধান প্রস্তাবের জন্যে বৃটিশদের পাঠানো অনেক তুচ্ছ কমিশনের প্রথম) কাছে জায়নবাদী সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকেও যা লজ্জাজনক ভাবে পরিস্কার হয়েছিল।

প্যালেস্টাইনে দ্বন্ধের কোন কারণ নেই; যেহেতু জায়নবাদীদের কাছে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি এবং আরবদের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি অসঙ্গতিপুর্ন নয় এবং স্থানীয়দের কোন ক্ষতি না করে ইহুদী জনগনের জন্যে প্যালেস্টাইনে জাতীয় আবাসন সৃষ্টি করা সম্ভব --কুড়ি বছর ধরে বৃটিশ সরকার প্রকাশ্যে এই একগুঁয়ে দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখে এসেছে । তাদের চাওয়া "জাতীয় আবাসন" সরাসরি দেশের জনগনের আইন সম্মত এবং প্রাকৃতিক অধিকারের সাথে বিরোধপুর্ণ জায়নবাদীরা এ সত্য বারংবার পরিস্কার করা সত্বেও ; এবং এমনকি জায়নবাদীদের উচ্চাশা কমানোর আশায় কিংবা আরবদের ভয় দুর করার লক্ষ্যে ১৯২২ এবং ১৯৩০ সালে দুটি নীতি নির্ধারনী বিবৃতি দিতে বাধ্য হওয়া সত্বেও বৃটিশ সরকার নিজেদেরকে ওই বঞ্চনা কিংবা আত্ম প্রবঞ্চনার সাথে সেঁটে রেখেছে। "ইংল্যান্ড যেমন ইংরেজদের তেমনি প্যালেস্টাইন হবে ইহুদীদের" জায়নবাদীদের এই দাবীর প্রত্যুত্তরে চার্চিলের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের প্রথম বিবৃতিতে- প্যালেস্টাইনের আরব জনগনের উৎখাত কিংবা অবদমনের উদ্দেশ্য নাকচ করে নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, পুরো প্যালেস্টাইনকে ইহুদী জাতীয় আবাসনে রূপান্তর নয় বরং ইহুদীদের জন্যে প্যালেস্টাইনে একটি জাতীয় আবাসন তৈরীই তাদের পলিসি। একই সাথে তারা এই নীতিও বিবৃত করে যে, বেলফুর ঘোষনা এবং ম্যান্ডেটকালীন সময়ে আসা বহিরাগত ইহুদীরা মৌন সম্মতিতে নয় বরং নিজেদের অধিকার বলেই দেশে এসেছে এবং দেশের ধারন ক্ষমতানুসারে এ আগমন অব্যাহত থাকবে ; যাতে দেশের মালিক হিসেবে আরবদের নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে সমুলে উচ্ছেদ করার মত এক অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

জায়নবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড উত্তেজনা এবং আরব বিরোধীতার ফলে ১৯২৯ সালে আবারও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। 'ম্যান্ডেটের আওতায় নেয়া ইহুদী জাতীয় আবাসন সৃষ্টির বৃটিশ দায়ীত্ব, প্যালেস্টাইনে অ-ইহুদী জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়ীত্বের অগ্রবর্তী ' জায়নবাদীদের এই দাবীর বিপরীতে ১৯৩০ সালে আসে বৃটিশ পলিসির দ্বিতীয় ঘোষনা (এবার লেবার দলীয় প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড, এবং উপনিবেশ সংক্রান্ত সেক্রেটারী সিডনী ওয়েভের কাছ থেকে)। আরও একবার বাস্তবতার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বৃটিশরা নিশ্চয়তা দেয় যে, উভয় দায়ীত্ব পরস্পর বিরোধী নয় সুতরাং যুগপৎ পুরন করা যাবে। এই রাজকীয় পক্ষপাতহীন ঘোষনার এত তাৎক্ষণিক জায়নবাদী প্রতিক্রিয়ায় (সম্ভবতঃ এমন করে আর কখনও বৃটেনের ইহুদীদের শক্তি কিংবা দুরের আরবদের দুর্বলতা এত প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়নি) রামজে ম্যাকডোনাল্ড এমন এক শ্বেতপত্র প্রকাশে বাধ্য হন , যার শ্বেতসার মুলতঃ প্রধানমন্ত্রীই গলাধঃকরন করেছেন, এবং আরবদের কাছে এর নাম কৃষ্ণ পত্র। এতকিছু সত্বেও জার্মানীতে নাৎসীদের ক্ষমতারোহন এবঙ তাদের ইহুদী বিরোধী বর্বর পলিসি প্রয়োগের আগ পর্য্যন্ত প্যালেস্টাইন সমস্যা এতোটা হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়নি। ইউরোপ থেকে গণহারে পলায়নপর ইহুদীদের ঢল নামে প্যালেস্টাইনের দিকে। ১৯৩৩-১৯৩৬ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকা এই অভিবাসী সংখ্যার বাৎসরীক হার দাঁড়ায় ৬০ হাজারে এবং তাও এমন এক দেশে যার নিজের জনসংখ্যাই* দেড় মিলিয়নের কম।

এই বহিরাগতের প্লাবনে আরবরা ভীত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বৃটেন এবং আমেরিকায় সভ্য সমাজের সামনে বরাবরই সুপরিকল্পিত , উদ্দেশ্যপ্রণোদীত জায়নবাদী ব্যাপক প্রচারনা চলতে থাকে। হিটলারের নির্য্যাতনের শিকারদের জন্যে প্যালেস্টাইনে ইহুদী জাতীয় আবাসনের জায়গা আরও বাড়ানোর মানবিক আবেদন মাঠ পুরোপুরি দখল করে রাখে। জায়নবাদীদের যুক্তি – ইহুদীদের আগমনে আরবদেরই লাভ যেহেতু ইউরোপীয় ইহুদীদের উন্নতমানের প্রকল্প, এবং কলাকৌশল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন মানের উন্নতি ঘটাবে। বাস্তবতা বিবর্জিত এসব বাগাড়ম্বরে অজ্ঞ পশ্চিমা জনমত বিভ্রান্ত হলেও আরবরা দেখতে পেয়েছে প্যালেস্টাইনে তাদের মান-মর্য্যাদাতো বটেই খোদ অস্তিত্বও ধ্বসে যাচ্ছে। বিষয়টা যে নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা জীবন যাত্রার মানের প্রশ্ন নয় বরং পিতৃ পুরুষের ভূমির মালিকানা তথা প্যালেস্টাইন কি আরবদের থাকবে না বিদেশী বিশেষতঃ মধ্যইউরোপীয় ইহুদীদের রাষ্ট্র হবে তা আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই তারা অনুভব করেছে এবং পরবর্তী প্রতিটি বাস্তব ঘটনায় তার প্রমাণ ও পেয়েছে।

অবশেষে ১৯৩৬ এর বিষ্ফোরণ। আরবদের ডাকা সাধারন ধর্মঘট অত্যন্ত সফলতার সাথে দুই মাস ধরে চলে। একই সাথে সিরীয় এবং ইরাকী আরবদের সমন্বয়ে সশস্ত্র গোষ্ঠী সহিংসতা শুরু করে; বৃটিশরা ২০০০০ সেনা মোতায়েন করেও ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্য্যন্ত বিদ্রোহ দমাতে পারেনি। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরপরই প্যালেস্টাইন দ্বন্ধ এবং তার সমাধান খুঁজে দেখতে বৃটেন আরও একটি রাজকীয় প্রতিনিধি দল পাঠায়। এই কমিশন দু'টি উল্লেকযোগ্য কাজ করে। প্রথমতঃ তা বৃটিশ সরকারকে এই তিক্ত সত্যের মুখোমুখি করে যে, ইহুদী জাতীয়তাবাদ এবং আরব জাতীয়তাবাদ পরস্পর সামঞ্জস্যবিধান যোগ্য নয়। বেলফুর ঘোষনা থেকে পরবর্তীতে বৃটিশ অনুসৃত নীতিমালা হতাশাব্যাঞ্জকভাবে পুরোপুরিই বাস্তবায়ন অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ কমিশন উপসংহারে বলে যে, যেহেতু একই রাষ্ট্রে ইহুদী এবং আরবদের দাবীর সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব নয় অতএব, প্যালেস্টাইনকে আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে দুই রাষ্ট্রে ভাগ করাই একমাত্র সমাধান। এভাবেই প্যালেস্টাইনকে দ্বিখন্ডিত করার ধারনা প্রথম উপস্থাপিত হয় । জায়নবাদী প্রচারে মোহাবিষ্ট পশ্চিমা জনগনের কাছে এটা সঠিক এবং উপযুক্ত মনে হলেও আপাতঃ নিরীহ এই ধারনার মধ্যেই নিহিত ছিল শেষাবধি,১৯৪৮ সালে ইহুদীদের পুরো প্যালেস্টাইন দখল করে নেয়ার বীজ।

এই পার্টিশন স্কীমের প্রতি আরবরা চরম ঘৃণা এবং উদ্বেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। এর মধ্যে তারা দেখতে পায় প্যালেস্টাইনের এক বিরাট অংশ জুড়ে তাদের প্রথম এবং ভয়ংকরতম ভীতির বাস্তব রূপ- বেলফুর ঘোষনার সাদামাঠা 'আবাসন' হবে আরবভূমিতে জবরদস্তি প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন , সার্বভৌম বিদেশী রাষ্ট্রের পত্তন। এটা আর গোঁজের চিকন অংশ নয়, বরং পুরো স্থুলকায়ত্ব নিয়ে ঠেসে দেয়ার অপেক্ষায় পুরু অংশ। ইউরোপে নাৎসীদের হাতে ইহুদী নিধন অব্যাহত থাকে এবং তার ফলশ্রুতিতে তাদের হাজারে হাজারে ফিরে আসার ভয়ে কম্পমান প্যালেস্টাইন। প্রস্তাবিত প্যালেস্টাইন পার্টিশনের বিরুদ্ধে সব আরব রাষ্ট্রের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। খোদ প্যালেস্টাইনে ১৯৩৬ সালে শুরু হওয়া সহিংসতা আরও তিক্ত, আরো ভয়ংকর হয়ে উঠে। আরবদের মুল দাবী দু'টি। ইহুদীদের আগমন বন্ধ করতে হবে, এবং প্যালেস্টাইনকে অবিভক্ত (বলা যায় স্থানীয় জনগনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায়) স্বাধীনতা দিতে হবে।

শেষাবধি পার্টিশন প্রস্তাবের প্রতি আরবদের বিরোধীতা পারস্পরিক উপদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে পরিণত হয়। কিন্ত তাতেও এই বাস্তবতার কোন পরিবর্তন হয়না যে, ১৯৩৬-৩৯ সালে প্যালেস্টাইনে সংঘটিত সব দ্বন্ধ সংঘাত মুলতঃ জায়নবাদের বিরুদ্ধে এবং পরে রাজকীয় কমিশনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের বিরুদ্ধে আরবদের সশস্ত্র উত্থান । সহিংস আন্দোলনের অনধিক ২০০০ সক্রিয় সদস্যের সাথে ছিল এক বিরাট আরব জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি, সমর্থন। বিদ্রোহের ক্ষয়ক্ষতি বলতে ৬৯ জন বৃটিশ, ৯২ জন ইহুদী, ৪৮৬ জন আরব বেসামরিক নাগরিক এবং ১১৩৮ জন সশস্ত্র আরব বিদ্রোহীর প্রাণহাণি; সামরিক আদালতের বিচারে অন্ততঃ আরো ১০০ জন আরব বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেয়া হয়।

অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে এলে , বৃটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের কারণে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে আরববিশ্বের বৈরীতায় উদ্বিগ্ন হয়ে , পার্টিশন প্রস্তাব তুলে রেখে নুতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরবদের দিকে এগোয়। উডহেড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে তারা এই সিদ্ধান্তে আসে। পুর্ববর্তী কমিশনগুলোর সাধারণ সুপারিশের পরিবর্তে পার্টিশনের পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের জন্যে প্যালেস্টাইনে এই কমিশন পাঠানো হয়, কমিশন স্পষ্টভাবে বলে যে পার্টিশন সাধ্যাতীত। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৩৯ সালে বৃটিশ সরকার আরব এবং ইহুদীদের উভয়কে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে ডাকেন। আরবদের প্রতি আমন্ত্রনটা কৌতুহলোদ্দীপক কারন এতে প্যালেস্টাইনের ভাগ্যের সাথে ক্রমবর্ধমান সংহতি প্রকাশ করে আসা মিশর, ইরাক সহ প্রতিবেশী আরবদেশ সমুহ থেকেও প্রতিনিধি আমন্ত্রন করা হয়। এই আমন্ত্রণের মধ্যদিয়ে বৃটিশ সরকার স্বীকার করে যে, আরববিশ্বের এই অন্তর্নিহিত ঐক্যকেই সে ১৯১৯ সালের শান্তি সম্মেলনে অস্বীকার করেছে, এবং পরবর্তি সময়ে আরব লীগের ধারনায় প্রদেয় সমর্থনকে সংশায়াচ্ছন্ন করেছে।

গোলটেবিল আলোচনায় কোন সমঝোতা সম্ভব না হওয়ায় বৃটেন ১৯২২ এবং ১৯৩০ সালের মত পলিসি সম্বলিত একক ঘোষনা প্রদান করে। এটাই ১৯৩৯ এর বিখ্যাত শ্বেতপত্র। এতে বৃটিশ সরকার দশবছর সময়ের মধ্যে এমন এক স্বাধীন প্যালেস্টাইন সরকার গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করে যেখানে ইহুদী এবং আরবরা স্ব স্ব গোষ্ঠীর স্বার্থ বজায় রাখতে পারে মত অনুপাতে অংশ নেবে। দেশের জনসংখ্যায় ইহুদী আরব অনুপাত যাতে মোটামুটি ১:৩ হয় তার জন্যে অপেক্ষমান দশ বছরে আরও ১৫০,০০০ ইহুদী অভিবাসনকারী প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করবে। দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে ইহুদীদের জমি কেনা (আরবদের আরও একটা দাবী) নিষিদ্ধ থাকবে।

শ্বেতপত্র প্রকাশের সময় আরব এবং ইহুদী উভয়েই নীতিগতভাবে এর বিরোধীতা করলেও আরবরা আন্ত রীকভাবে এর প্রতি বিরূপ ছিলনা। প্রকৃত প্রস্তাবে ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে তা গ্রহন করেছে এবং অর্জিত অধিকার হিসেবেই তা আঁকড়ে ধরেছে। পরবর্তী দশ বছরে আরো বেশী সংখ্যায় ইহুদী অভিবাসনকারী গ্রহনকরার মত তিক্ত বিষয় সত্বেও তারা বৃটিশ সরকার কতৃক পার্টিশন স্কীম পরিত্যাক্ত হওয়া, প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের বৃটিশ সরকারী ইচ্ছা অস্বীকার করা, সর্বোপরি দশ বছর পরে হলেও স্বাধীনতার ওয়াদায় তৃপ্ত হয়। তাদের সবচে বড় দুশ্চিন্তা- জায়নবাদীদের চাপে আবারওনা বৃটিশ সরকার ঘোষিত পলিসি বদলাতে বাধ্য হয়। বলাবাহুল্য আবারও তাদের দুশ্চিন্তা যথার্থই প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু একটা বিষয়ে আরবরা মারাত্মক ভুল করেছে। শ্বেতপত্রের বিষয়টি বৃটিশ , আরব এবং ইহুদীদের ত্রিভূজ সম্পর্কের মধ্যে এক গুরুত্বপুর্ন পরিবর্তন সূচনা করে। ইহুদীরা শ্বেতপত্রের ইঙ্গিত খুব দ্রুত বুঝে নিয়ে সেমতে ভবিষ্যত মোকাবিলায় তাদের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন করে নেয় । পক্ষান্তরে, ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে সে বিষয়ে আরবদের কোন ধারনা না থাকায় তারা অতীতের মতই আচরন করতে থাকে। জায়নবাদীরা বুঝে নেয়- বৃটিশ শক্তি প্যালেস্টাইনে আরব জনগনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করতে দেবেনা তাই রাষ্ট্র গঠন করতে হলে তাদের নিজেদেরকেই প্রথমে বৃটিশদের বিরুদ্ধে ,পরে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে হবে। পক্ষান্তরে আরবরা প্যালেস্টাইনের জন্যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা গভীর ভাবে ভাবেনি। সেই মুহুর্ত পর্য্যন্ত ইহুদীরা শক্তি ও সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান হওয়া সত্বেও বৃটিশ সেনা সমর্থন ছাড়া দেশটা জনগনের কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার অবস্থায় পৌঁছেনি।

আরবদের সার্বক্ষণিক ভয় বৃটিশরা তাদের উপর ইহুদী রাষ্ট্র চাপিয়ে দেবে, সে উদ্দেশ্যে প্যালেস্টাইনকে বিচ্ছিন্ন করবে,এবং অনবরত অভিবাসনের মাধ্যমে দেশে ইহুদীরা সংখ্যাগুরু না হওয়া পর্যান্ত আরবদের টেনে ধরে রাখবে। অন্যভাবে বলতে গেলে আরবরা সব সময় সমস্যার কথা চিন্তা করেছে তাদের সাথে বৃটিশ এবং ইহুদীদের ত্রিভূজ ঠেলাঠেলির মধ্যে, ওসব থেকে বিরত রাখতে বৃটিশদের উপর চাপ সৃষ্টি করাই আরবদের

মুল পরিকল্পনা। শ্বেত পত্র প্রকাশের পরে আরবদের ভুল বলতে –আলোচনা,কনফারেন্স, রাজনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখা এবং যখন প্রয়োজন সামান্য সহিংসতার মাধ্যমে বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা জিতে নেবার পরিকল্পনা আঁকড়ে ধরা। ইহুদীরা শক্তিশালী হয়ে বৃটিশদের হটিয়ে দিয়ে নিজেরাই প্যালেস্টাইন জবরদখল করতে পারে তা কখনও আরবরা ভাবেনি। অন্য যে কোন ভুলের চেয়ে সম্ভবতঃ এ ভুলের খেসারত হিসেবেই আরবরা প্যালেস্টাইন হারিয়েছে। যদিও এমন যুক্তির অবকাশ থেকেই যায় যে, সত্যিকারের বিপদ আঁচ করতে পারলেও শেষাবধি আরবদের সহজাত দুর্বলতা,বিচ্ছিন্নতা তাদের একই পরাজয়ের দিকেই নিয়ে যেত।

(৭)

যুদ্ধমধ্যবর্তী সময়ে সৌদী আরব রাজ্য, এবং ট্রান্স জর্দান রাজ্য বা পরবর্তী কালে জর্দানের হাশেমীয় রাজ্য নামে আরো দু'টো আরব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। উভয় রাষ্ট্রই রাজনৈতিক, সামাজিক গঠনে প্রায় একই প্রকৃতির কিন্তু ইতোপুর্বে আলোচিত বৈশিষ্ঠ্য এবং সাংস্কৃতিক মানদন্ডে ভিন্নতর। সৌদী আরবের জন্মটাই হচ্ছে সম্পুর্ন বাদশা আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের একার কৃতিত্ব। ইনি সেই আরব গোষ্ঠীর সাহসী সন্তান যারা নজদের শাসক এবং মৌলবাদী ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের মিত্র হিসেবে ইতোপুর্বে আলোচিত হয়েছেন। এই বর্ণনায় প্রথম যখন আমরা ইবনে সউদের সাক্ষাৎ পাই তখন তিনি নজদ এলাকায় প্রভুত্ব স্থাপন করেছেন, এবং বৃটেনের প্রায় সামন্ত মিত্র। বৃটিশ সরকার এবং ইরাকের জাতীয়তাবাদীরা উভয়েই ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে তুর্কির বিরুদ্ধ আরব বিদ্রোহে তাঁর সমর্থন আদায়ের চেস্টা করলেও দু'টি কারনে তিনি শুধু নৈতিক সমর্থন দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। প্রথমতঃ নজদের উত্তরে "জেবল শাম্মার " এর আমীর ইবনে রশীদ ছিলেন তাঁর পুরোন শত্রু । তুর্কি সমর্থক ইবনে রশীদ তাঁকে মোকাবিলা করার মত পর্য্যাপ্ত শক্তিশালী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ইবনে সউদের সাথে মক্কার শেরিফ হুসাইনেরও (যিনি আরব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন) সম্পর্ক ভাল ছিলনা। ওয়াহাবী রীতি–নীতির ধারক ইবনে সউদ সমকালীন মক্কা–মদীনার অবস্থাকে মনে করতেন ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী, পৌত্তলিক পুজা–অর্চনা কেন্দ্রের চেয়ে সামান্য উন্নত; আর হুসাইন তাঁর তুর্কি রুচি সংস্কৃতি নিয়ে ইবনে সউদকে ভাবতেন আদিম গোত্রপতি, এবং প্রকাশ্যেই তাঁর সমালোচনা করতেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে হুসেইন আরবদের রাজা এবং তারও আট বছর পর খলিফা উপাধি গ্রহন করলে এই পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যায়।

ইবনে সউদ এবং হাশেমীয়দের সাথে প্রথম সংঘাত সংঘটিত হয় ১৯১৯ সালে। এ'সময় হুসেইনের ছেলে আমীর আবদুল্লাহ নজদ আক্রমণ করে ইবনে সউদের হাতে বেশ ভালভাবেই পরাস্ত হন। ইবনে সউদ হেজাজ আক্রমণে বিরত থাকেন শুধু বৃটিশদের কারণে, যারা তখনও হুসেইনের রক্ষাকর্তা। যুদ্ধের পরিণতি যখন তুর্কিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এলে শাম্মার এর আমীরকে তার সহায়ক শক্তির সমর্থনচ্যুত করে, ফলত: ইবনে সউদ তাকে পরাজিত করে তার এলাকা নজদের সাথে যুক্ত করে নিতে সক্ষম হন। ১৯২৫এর দিকে হুসেইন প্যালেস্টাইন প্রশ্নে বৃটিশদের সাথে ঝগড়া করে তাদের সুরক্ষা হারান। একই সময়ে তিনি হজ্ব সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে মিশরের সাথেও বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।

তাঁর খিলাফত গ্রহনও আরব এবং মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে ঈর্ষা–বিদ্বেষ জাগায়। এভাবে তাঁর আন্তর্জাতিক নিঃসঙ্গতা ইবনে সউদকে সুযোগ এনে দেয়। নজদী যুবরাজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবেশীদের সাথে হুসেইনের কাঁচা ষড়যন্ত্র আপাতঃ উপলক্ষ্যটাও এনে দেয়। ইবনে সউদ হেজাজ আক্রমণ পুর্বক হুসেইনকে সিংহাসন ও দেশত্যাগে বাধ্য করেন। এই নুতন বিজয় ইবনে সউদের সাম্রাজ্যের সাথে ইসলামের দুই পবিত্র শহর মক্কা ও মদীনা যুক্ত করে, জন্ম হয় সৌদী আরব রাজ্যের। বিজয়ের পরপরই পুর্ণ সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে নুতন রাজার সাথে বৃটেন চুক্তি সম্পাদন করে। বিনিময়ে ইবনে সউদ আরবের সীমান্ত ঘেঁষে চর্তুদিকের উপকূলবর্তী বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন আরব শেখতন্ত্রের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে সম্মত হন । ইতোমধ্যে বৃটেনের

স্বীকৃতি প্রাপ্ত হুসেইনের দুই ছেলে ফয়সল এবং আবদুল্লাহ শাসিত দুই দেশ যথাক্রমে ইরাক এবং ট্রান্স জর্দানের সাথে সৌদী আরব রাজ্যের সীমানাও ভবিষ্যতে বৃটেন নির্ধারন করে দেবে এতেও তিনি সম্মত হন।

ইবনে সউদ একজন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব। মার্কিন কোম্পানীগুলোকে তেল সুবিধা দিয়ে,যাতায়াত ব্যবস্থায় উটের বদলে মোটর গাড়ীর প্রচলন করা সত্বেও পুরোন গোত্রীয় ঐতিহ্যে তিনি এবং তাঁর রাজ্য মুলতঃ মধ্যযুগীয় থেকে যায়। দেশের জনগনের বিরাট অংশ যাযাবর। রাজা নিজেও মরুর আরব, এবং পশ্চিমা সভ্যতার স্পর্শরহিত, আধুনিক যুগের নামমাত্র ছোঁয়া প্রাপ্ত এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম শাসক। মিউনিখ সঙ্কটশালে তাঁর চেকোশ্লাভাকিয়া উচ্চারণের প্রানান্তকর চেষ্টা শেষে ব্যর্থতা, সেসময় তাঁর সাথে কাজ করা বৃটিশ কুটনীতিবিদদের কৌতুকের বিষয় হয়েছে। তা সত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সহজাত বিচক্ষণতার প্রতি তাঁদের অবশ্যই যথেষ্ট সম্মান ছিল।

পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের ক্ষেত্রে তিনি ৮ম-৯ম শতকের খলিফা হতে পারতেন অনায়াসে; যেমনি বড় তাঁর হারেম তেমনি বিশাল সন্তান সন্ততির সংখ্যা। রাজ্যে তিনি শান্তি শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। পুরোন আরব রীতিতে প্রজা সাধারণ যে কোন অভাব অভিযোগ নিয়ে, 'আব্দুল আজিজ' সম্বোধনে তাঁর মুখোমুখি হতে পারতেন। রাজ্যে তিনি কঠোর হাতে ফৌজদারী দন্ডবিধিতে শরীয়াহ আইন প্রচলন করেন; এবং এতে চুরির শাস্তি চোরের হাত কেটে ফেলা। রাজ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকলেও রাষ্ট্রযন্ত্র আদিম এবং নড়বড়ে, শেষ সহায় হিসেবে রাজার হাতেই সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত থেকে যায়। শিক্ষিত , রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবর্তমানে , এমনকি ইবনে সউদ অনুমোদন দিতে চাইলেও কোন সংসদীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠা সম্ভব ছিলনা। রাজার সাথে প্রথমে বৃটেনের এবং পরে তেলের সুত্রে আমেরিকার সম্পর্ক পরম হৃদ্যতার; এ'ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে রাজা এবং তাঁর রাজ্য পুরোপুরিই স্বাধীন। সৌদী আরবের মাটিতে কোন বিদেশী সৈন্য কিংবা শাসন যন্ত্রের উপর চাপ প্রয়োগ করতে কোন বিদেশী হাই কমিশনার, উপদেষ্টা ছিলনা। এর ফলে, এবং অংশতঃ রাজ্যের কৃষিভিত্তিক অনুন্নত চরিত্রের জন্যে সৌদী আরবে কোন পশ্চিমা বিরোধী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেনি।

জর্দান নদীর পুর্ব পাড়ে ট্রান্স জর্দান মুলতঃ ভৌগলিক সিরিয়ার অংশ যা সাইক-পিকট চুক্তি অনুসারে বৃটিশ হিস্যায় পড়েছে। এলাকাটা প্রধানতঃ মরুময় এবং দরিদ্র; জনসংখ্যা প্রায়* ৪ লাখ,অধিকাংশই যাযাবর। ফরাসীদের হাতে ১৯২০ সালে ফয়সলের রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর পরই বৃটেন ট্রান্স জর্দানের ক্ষুদ্র শহুরে জনগোষ্ঠীকে জানিয়ে দেয় যে এখানে তারা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের মাধ্যমে আপাতঃ স্বাধীনতা দিতে চায়। এর কিছু পরে ফয়সলের বড়ভাই আমীর আবদুল্লাহ , যিনি ১৯১৩ সাল থেকেই আরব আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি ট্রান্স জর্দানে এসে সিরিয়ায় ফরাসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বৃটেন তাঁকে এই উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে আনে ।

বৃটিশ সুরক্ষা গ্রহণ, এবং একটি আধুনিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার শর্তে ট্রান্স জর্দানের কাউন্সিলের সম্মতিতে বৃটেন তাঁকে দেশের আমীর হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহ দেখায়। আবদুল্লাহ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর পরপরই প্যালেস্টাইনে ইহুদী অভিবাসন,ভূমি ক্রয়ের অনুমোদন সংক্রান্ত ম্যান্ডেটের উপধারা সমুহ থেকে ট্রান্সজর্দানকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে বৃটিশ সরকার সম্মিলিত জাতীপুঞ্জের অনুমোদন লাভ করে। এভাবে বৃটেন সরকার একদিকে পশ্চিম প্যালেস্টাইনে ইহুদী অভিবাসন উৎসাহিত করার জন্যে এবং অন্যদিকে ফরাসীদের দামেস্ক থেকে ফয়সলকে বহিষ্কার করতে দেয়ার জন্যে আরবদের কিছুটা ক্ষতিপুরন দিতে চায়।

আবদুল্লাহও ইবনে সউদের মত কর্তৃত্বপরায়ণ শাসক ছিলেন তবে কন্সটান্টিনোপলের পরিবেশে লালিত হওয়ায় তাঁর মধ্যে শ্রেয়তর রুচিবোধ, সংস্কারমুক্ত ইসলামী সার্বজনীনতা এবং একই সাথে তিনি সাধারণভাবে আরববিশ্ব সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। রাজ্যে যদিও তিনি প্রকৃত গণতন্ত্র বিশেষতঃ নির্বাচিত

কাউন্সিলের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির মত গণতন্ত্র অনুমোদনের পক্ষে ছিলেননা তবুও তাঁর বৃটিশ উপদেষ্টারা একটি মোটামুটি আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং ছোট হলেও দক্ষ এক আধুনিক সেনাবাহিনী বিখ্যাত "আরব লিজিয়ন" তৈরী করে। সৌদী আরবের মত ট্রান্স জর্দানেরও এই যাত্রা শুরুর পর্যায়ে পশ্চিমের সাথে কোন বিরোধ নেই।

আবদুল্লাহ নিজেও প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং ইরাকে জাতীয়তাবাদীদের কাছে জনপ্রিয়তা হারান। তিনি বৃটিশদের সাক্ষী গোপাল বিবেচিত হন; এমনও সন্দেহ করা হয় যে, ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি পুরোপুরি সম্মত নন কিংবা প্যালেস্টাইনের অংশবিশেষ ট্রান্সজর্দানের সাথে যুক্ত করে দিলে বাকী অংশে ইহুদীদের স্বায়ত্বশাসনের বিষয়েও তিনি আপস করতে রাজী। বাস্তবিকই সে ধরনের সমাধান প্রকল্প নিয়ে তিনি একসময় এগিয়েও ছিলেন; পরবর্তীতে প্যালেস্টাইন ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর তিনি এই যুক্তিতে নিজের পদক্ষেপকে সমর্থন করেন যে, তাতে অন্ততঃ পুরো প্যালেস্টাইনকে তাদের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়ার বদলে ইহুদী সম্প্রসারনকে একটা সীমা বেঁধে দেয়া যেতো। সে যাই হোক, সংঘবদ্ধ এবং পর্যাপ্ত আরব সমর শক্তি (প্রয়োজনের মুহূর্তে যা পাওয়ার ছিলনা) ছাড়া প্যালেস্টাইনের কোন ক্ষুদ্রতর অংশে ইহদী জাতীয়তাবাদকে বেঁধে রাখা কিংবা আরবদেরকেও স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে আর কিছুতে সন্তুষ্ট করা যেতো কিনা তা বরাবরই সন্দেহের বিষয়।

আরব উপদ্বীপে শক্তিধর হিসেবে ইবনে সউদের উত্থান এবং উত্তরে ইরাক ও ট্রান্সজর্দানের সাথে সমানতালে তাঁর রাজ্যের মার্চ করার বিষয় আরববিশ্বে বিভেদ এবং উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবদুল্লাহ এবং ফয়সলকে স্বীকৃতি দিলেও ইবনে সউদ কখনও ভুলতে পারেননি যে এঁরা তাঁর শত্রু হুসেইনের ছেলে এবং যে কোন সময় হেজাজ কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে । বলাবাহুল্য এ'ভয়ই তাঁর সব পলিসির ভিত্তিভূমি। পরবর্তীতে এই পরিস্থিতিকেই , অন্যান্য উপসর্গ সহযোগে আরব লীগের ভেতরে হাশেমীয় বিরোধী অক্ষ তৈরী করতে দেখা যাবে।

সৌদী আরবের কথা বাদ দিলে আরব উপ-দ্বীপে অবশিষ্ট থাকে ইয়েমেন, এডেন প্রটেক্টরেট, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা শেখতন্ত্র সমূহ। ইয়েমেন আধুনিক বিশ্ব থেকে সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন ,বদ্ধমূল সংস্কার বিরোধী এক ইমাম শাসিত,মধ্যযুগীয় ধর্মরাজ্য। এডেন বৃটিশ উপনিবেশ। তেল আবিষ্কারের পুর্ব পর্য্যন্ত কুয়েত, বাহরায়েন, কাতার প্রভৃতি দরিদ্র শেখতন্ত্র সমূহ বৃটেনের সাথে চুক্তি সম্পর্কে আবদ্ধ। বৃটেন তাদের সুরক্ষা দিলেও আদিম গোত্রীয় প্রশাসনে ততটা হস্তক্ষেপ করেনা। গুরুত্বহীন এবং একমাত্র ব্যতিক্রম এডেন বাদে এ'দেশগুলোর কোনটাই তখন পর্য্যন্ত বিংশ শতকের স্রোতে ঢুকেনি;আরব পুনরুত্থানেও অংশ নেয়নি যদিও গোত্র বিচারে তারা প্রায় খাঁটি আরব (তাদের মধ্যে ভারতীয় এবং ইহুদী জনগোষ্ঠীরও অস্তিত্ব ছিল) এবং তাদের আরব পরিচয় কখনও ভুলেওনি।

(৮)

এতক্ষণ আমরা বিশেষকরে মিশর থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চলীয় আরব বিশ্বের কথা বলেছি। মিশরের পশ্চিমে আছে লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, এবং "আল মাগরিব আল আকসা" তথা সুদুর পশ্চিম নামে খ্যাত মরক্কোকে নিয়ে আটলান্টিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমাঞ্চলীয় আরব বিশ্ব। উত্তর আফ্রিকায় শাসন প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন ধরে ফরাসীরা তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কোর জনগনের আরব পরিচয়ের চেয়ে মুসলিম পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে যাতে তাদের নৃতাত্বিক 'বার্বার'উৎস দিয়ে সম্ভাব্য আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান ঠেকিয়ে রাখা যায় অথবা এদের সাথে যেন পূর্বাঞ্চলীয় আরব বিশ্বের কোন আত্মিক সম্পর্ক গড়ে না উঠে। বিশেষকরে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের এই মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে।

এ'সময় তুর্কির বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ, এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে অংশতঃ বৃটিশ সম্মতি ও মদদে আরব জাতীয়তাবাদের পাইকারী উত্থান ঘটে যা তার এবং সিরিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। অবশ্যই সত্য বটে, নৃতাত্বিক বিচারে উত্তর আফ্রিকা 'বার্বার' অধ্যুষিত। এটাও সত্য যে, আরব উপদ্বীপের বাইরের সব দেশের জনগনও নৃতাত্বিক উৎস বিচারে অনারব। উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো পুর্ব আরব দুনিয়ার মতই মুসলিম আরব বিজয়ের ফলে আরবীয় হয়। সেখানকার 'বার্বার' জনগনের মধ্যে কতেক পরিমাণে আরব রক্তের সংমিশ্রন ঘটেছে, তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ন যে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে আরবী ভাষাকে তাদের সংস্কৃতি,সরকার এবং প্রচলিত শহুরে জীবনের ভাষা হিসেবে গ্রহন করেছে যদিও উপকূলের বাইরের উপজাতীয় এলাকায় বার্বার ভাষা ব্যবহার অব্যাহত থাকে। সমকালে তিউনিসিয়া এবং মরক্কোতে বার্বার ভাষাভাষীর সংখ্যা মোট জনগনের প্রায় *২থেকে ৪ শতাংশ।

আলজেরিয়া এবং তিউনিসিয়া তাদের পুর্বদিকের আর সব আরবদেশ সমূহের মত দীর্ঘ সময় ধরে অটোমন সাম্রাজ্যভুক্ত, যদিও সে বন্ধন সব সময় দৃঢ় ছিলনা। কার্যাক্ষেত্রে বলতে গেলে তারা কখনও তেমন করে পরাধীন হয়নি। হাজার বছর ধরে মরক্কো মুলতঃ সুলতান শাসিত এক মধ্যযুগীয় আরবদেশ, হালকা চালে ইংরেজীতে যার পরিচয় "মুর সাম্রাজ্য" হিসেবে। স্পেনে খ্রীশ্চান বিজয়ের ফলে সেখান থেকে বহিস্কৃত এক বিরাট সংখ্যার আরব অথবা আরবীয় মুসলিমকে মরক্কো ধারণ করে। এমনও জানা যায় এই অভিবাসনকারীদের সন্তান সন্ততিদের অনেকের কাছে জিব্রাল্টার প্রনালীর ওপারে বাধ্য হয়ে ফেলে আসা বাড়ী ঘরের চাবি এখনও সঞ্চিত আছে। মধ্যযুগীয় প্রাতিষ্ঠানিক আওতায় দীর্ঘ স্বাধীন এবং পুরোপুরি নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব মরক্কোকে তার উত্তর আফ্রিকা অথবা মধ্যপ্রাচ্যের যে কোন সহোদরার চেয়ে অতি আকর্ষণীয়া আরব করে রেখেছে এবং একইভাবে আধুনিক সংস্কারমুক্ত সার্বজনীনতার প্রাথমিক বিষয়াদি অর্জনে বাধাগ্রস্থ করেছে, যা নানাভাবে ইউরোপীয় সংশ্রবের ফলে অটোমন সাম্রাজ্য ধারন করেছে। ফরাসীদের আগমনের পুর্বমুহুর্ত পর্য্যন্ত মরক্কোর জনগন (যদিও তাদের সাথে ইউরোপের সামান্য বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল) আরববিশ্বের অপর প্রান্তের ইয়েমেন, নজদের মত পশ্চিমা প্রভাব রহিত।

প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসীদের দখলকৃত এবং বসতিস্থাপনের ধারায় প্রথম ফরাসী উপনিবেশ আলজেরিয়া। আধাতুর্কি 'দে'কে আলজিয়ার্স থেকে বহিষ্কার এবং নির্বাসন দেওয়া ফরাসীদের পক্ষে যত সহজই হোক আমীর আব্দুল কাদেরের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগনের প্রতিরোধ মোকাবিলা করে দেশটাকে পরিপূর্ণভাবে ফরাসী নিয়ন্ত্রণে নিতে যথেষ্ট সময় লেগে যায়। ফরাসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আলজেরীয় জনগনের এই প্রতিরোধই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম আরব বিশ্বের প্রথম প্রতিক্রিয়া। এটাকে আরব জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ বলা যায়না যেহেতু আধুনিক পৃথিবীতে আরব ধারনাটাই তখনও গড়ে উঠেনি, তবে এটা নিজেদের স্বাধীনতা এবং ভূমি রক্ষায় বিধর্মী ,বিজাতীয় আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে এক আরব জনগোষ্ঠীর রুখে দাঁড়ানো। যখন পশ্চিম আরবে এই স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে তখন কাকতালীয়ভাবে সিরিয়ায় ইব্রাহিম পাশা আরব সাম্রাজ্য তৈরীর চেষ্টা করছেন।

তিউনিসিয়ার সমস্যা শুরুতে মিশরীয় সমস্যার মত; ইউরোপের কাছে ঋনগ্রস্থতা ১৮৬৯ সালে দেউলিয়াত্বের রূপ নেয় এবং পরিণতিতে বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালীর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিউনিসিয়ায় ইউরোপীয় অভিবাসনকারীরা আসতে থাকে। প্রথম দিকে ইতালীয় অভিবাসীরা ছিল সংখ্যাগুরু। এর সাথে আলজেরিয়ার উপর ইতালীর আরও প্রভুত্বের নানাবিধ পরিকল্পনা আলজেরিয়ার প্রতিবেশী দেশে ফরাসীদের ঈর্ষা উস্কে দেয়। ফরাসীরা বৃটিশদের সাথে এক গোপন সমঝোতায় পৌঁছে এবং ১৮৮১ সালে সামরিক অভিযান চালায়। আলজেরিয়া থেকে সেনাদল সীমান্ত অতিক্রম পুর্বক তিউনিসিয়ার 'বে' (মিশরের খেদিব সমতুল্য)কে ফরাসী প্রটেক্টরেট মেনে নিতে বাধ্য করে। কিন্তু এখানেও দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে ,ভবিষ্যত আরব জাতীয়তাবাদের আরেক প্রতীক,স্থানীয় জনগনের প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে হয়। ফ্রান্সের মরক্কো দখলে আর্থিক প্রয়োজনও ভূমিকা রাখে। আলজেরিয়ায় ঘাঁটি গাঁড়ার পরপরই ফরাসীদের লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে সাম্রাজ্যের দুর পশ্চিমে,

যেখানে পশ্চাদপদতা, দুর্বলতা, এবং অদক্ষ প্রশাসন স্বৈরতন্ত্র ও দেউলিয়াপনা তৈরীর মধ্য দিয়ে বিদেশী হস্ত ক্ষেপের পথ খুলে রেখেছে।

সাম্রাজ্যটাও কোন সমগোত্রীয় সংযুক্ত রাষ্ট্র নয় বরং বার্বার উপজাতি,শক্তিশালী সামন্ত অভিজাত এবং আরব শহরের মধ্যে কোনরকম সম্মিলন মাত্র। বৃটিশ প্রভাব এবং প্রতিযোগীতা সত্বেও কুটনীতি,সামরিক উদ্যোগ এবং সুলতানকে কর্জ দেয়ার মাধ্যমে ফরাসীরা উনবিংশ শতাব্দী শেষের আগেই দেশটাতে শক্ত অবস্থান করে বসে। অনেকটা সাইকস-পিকট চুক্তির পুর্বলক্ষনের মত,১৯০৪ এর '*উহঃবহঃব ঈড়ৎফরধষব*'র মাধ্যমে মিশরকে পুরোপুরি বৃটিশ হাতে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে ফরাসীরা মরক্কোতে একাধিপত্য অর্জন করে। তাঞ্জিয়ারকে আন্তর্জাতিক এলাকা এবং উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলের 'রিফ' নামে পরিচিত একাংশ স্পেনকে ছেড়ে দিতে সম্মত হয় ফ্রান্স। ১৯১২ সালে সুলতান ফরাসী প্রটেক্টরেট গ্রহন করেন।

স্পেনীয় এলাকায় খলিফা তথা সহকারীর মাধ্যমে ,এবং আন্তর্জাতিক এলাকা তাঞ্জিয়ারে 'মনদুব' তথা প্রতিনিধির মাধ্যমে সুলতানের তাত্বিক সার্বভৌমত্ব মোটামুটি বহাল থাকে। সুলতানের প্রটেক্টরেট গ্রহন 'ফেজ' এ সহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংবর্ধিত হয়,এবং১৯৩৪ সাল নাগাদ পুরোদেশ পূর্ণ ফরাসী নিয়ন্ত্রণে আসার আগ পর্যান্ত দীর্ঘ সময় উপজাতীয় গোত্র সমুহের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। মরক্কোতে ফ্রান্সের দ্বৈত শাসনের নীতি; আলজেরিয়ার মত যতবেশী সম্ভব পুরো দেশকে ফরাসী করে তোলার চেষ্টা তথা সাধারণভাবে মিলেমিশে যাবার নীতির মত নয় । পুরোন আরব শহরসমুহ এবং সুলতানের প্রথাগত সরকার 'মাখজেন'কে একদিকে রেখে (অবশ্যই ফরাসী নিয়ন্ত্রণে) ফরাসীরা একাধিক নুতন শহর এবং তাতে কাজ করার জন্যে নুতন প্রশাসন তৈরী করেছে ।

ফরাসীরা পুরো মরক্কোতে স্থিতাবস্থা আনতে না আনতেই স্পেনীয় এলাকায় নুতন মাত্রায় গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে। এখানে ১৯২৩ সালে আমীর আব্দুল করিম বিদেশী উপনিবেশ স্থাপনকারীদের উপর এমন প্রচন্ড এবং স্থায়ী আক্রমন শুরু করেন যা 'রীফ' যুদ্ধ নামেই পরিচিতি পায়। স্পেনীয়দের পরাস্ত করে আব্দুল করিম ফরাসীদের দিকে নজর দেন ১৯২৫ সালে----যখন জেবল দ্রোজে এবং দামেস্কের চারিদিকে সিরীয় বিদ্রোহ চলছে। জাতিগতভাবে 'বার্বার' হয়েও আব্দুল করিম পরবর্তীতে আরব জাতীয়তাবাদের এক বড় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ১৯২৬ সালে যৌথ শক্তির হাতে পরাজিত এবং কৌতুককর *জবহঁরড়হ* নামের দ্বীপে নির্বাসিত হওয়ার আগ পর্যান্ত তিনি স্পেন ও ফরাসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে তিনবছরের যুদ্ধে তাদের পভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্যারিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার শর্তে ফরাসী সরকার তাকে মুক্তি দেয় কিন্তু তাঁকে বহনকারী জাহাজ পোর্ট সৈদে পৌঁছলে জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে মিশরে আশ্রয় নিতে রাজী করান। মিশরীয় এবং অন্যান্য আরব নেতারা তাঁকে তাদের একজন হিসেবে গ্রহন করেন; এখানে তিনি পশ্চিম আরব দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটানো এবং যতদুর সম্ভব পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলীয় জাতীয় আন্দোলন সমুহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কায়রোর 'মাগরেব অফিস' স্থাপনে ভুমিকা রাখেন।

তিউনিসিয়ায় হতাশ হয়ে ইতালী নজর দেয় লিবিয়ার দিকে। মরক্কোতে ফরাসী আশা-আকাঙ্খার স্বীকৃতি দিয়ে যেভাবে বৃটিশরা মিশরে একচ্ছত্র আধিপত্য পায় তেমনি ইতালীও ফ্রান্সের সাথে এক সমঝোতায় আসে। এভাবে ফ্রান্সের পরোক্ষ সম্মতি নিয়ে সে লিবিয়া জয়ে নামে। ইতালীয়ান আক্রমনের বিরুদ্ধে লিবীয়দের পক্ষে মিশরীয় এবং তিউনিসীয় জাতীয়তাবাদীদের একত্রে যুদ্ধ করার মধ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে আরব জাতীয়তাবাদী প্রেরনার উত্থান লক্ষ্য করা যায়। ১৯১২ সালে তূর্কি কর্তৃপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয় । আরব প্রতিরোধ ,বিশেষতঃ সাইরেনাইকায় ১৯২৮ সাল পর্যান্ত চলতে থাকে এ'সময় মুসোলিনির প্রতিনিধি মার্শাল গ্রাজিয়ানি শেষাবধি পুরো লিবিয়া পদানত করে। মার্শাল গ্রাজিয়ানির ভাষায় 'একর একর করে 'লিবিয়া দখল করতে দশ বছর লাগে, ততদিনে পাইকারী মৃত্যুদন্ড এবং অন্যান্য উপায়ে গণহত্যায় সাইরেনাইকার জনসংখ্যার অর্ধেক নিখোঁজ হয়ে যায়।'

ইতোমধ্যে পুরো যুদ্ধমধ্যবর্তী সময়ে তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া এবং মরক্কোতে মধ্যবিত্ত শহুরে আন্দোলন হিসেবে জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তিউনিসিয়ায় এর সমৃদ্ধি সবচে' উদ্দীপ্ত, সুসংগঠিত। এখানে নিজস্ব পত্রিকা সহ প্রথম জাতীয়তাবাদী সংগঠনের জন্ম হয় ১৯০৪ সালে। এই সংগঠনের নেতা তা'আলবি ১৯১১ সালে প্যারিসে নির্বাসিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে তিনি প্রেসিডেন্ট উইলসনের ঘোষনায় অনুপ্রাণিত এবং পুর্বাঞ্চলীয় আরববিশ্বে স্বাধীনতা আন্দোলন সমূহে আন্দোলিত হয়ে স্বাধীনতার দাবীতে শান্তি সম্মেলনে স্মারক পেশ করেন। খোদ তিউনিসিয়ায় গন্যমান্য নাগরিকদের এক প্রতিনিধিদল (মিশরের ওয়াফাদের মত) ফরাসী রেসিডেন্টের কাছে দেশের জন্যে সংবিধান দাবী করেন। সংবিধানের আরবী প্রতিশব্দ 'দস্তুর' থেকে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কিংবা ১৯৩৪ সালে পুনর্গঠনের পর এর পরিবর্তিত নাম 'নিউ দস্তুর'। এর অধিকাংশ সভ্য ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্নাতক। স্বাধীনতা মূল লক্ষ্য হলেও তাঁরা উদ্দেশ্যের প্রতি ফরাসীদের সততা, আন্তরীকতা সাপেক্ষে ধীরে সুস্থে এগোনর পক্ষপাতি এমনকি ফরাসীদের সহায়তা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। পক্ষান্তরে ফরাসী মনোভাব একটি পরীক্ষামুলক উদারনীতি এবং বসতি স্থাপনকারীদের সমর্থনপুষ্ট প্যারিসের সাম্রাজ্যবাদী সমাজের প্রভাবের মাঝখানে দোদুল্যমান। প্রায়শঃই তারা জাতীয়তাবাদী নেতাদের কারারুদ্ধ করা কিংবা তাড়িয়ে দেয়ার মত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করতো।

মরক্কোয় আব্দুল করিমের পরাজয়ের মাত্র চার বছর পর উপজাতি বিদ্রোহ রাজনীতি সচেতন শহুরে বুদ্ধিজীবিদের স্তরে উন্নীত হয়। ১৯৩০সালে (সুলতানের শাসন আওতা থেকে বিপুল সংখ্যক বার্বারভাষী জনগনকে স্থানান্তরের প্রকাশ্য উদ্যোগের পর) 'এ্যাকশন মরোক্কান ' নামে প্রথম রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। এর বিশিষ্ট তিন শিক্ষাবিদ নেতা যথাক্রমে সরবোন, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ঐতিহ্যবাহী আরব মসজিদ কেন্দ্রীক বিশ্ববিদ্যালয় ক্বোয়েরেয়ান থেকে উচ্চ শিক্ষিত। তাঁদের দাবী স্বাধীনতা নয় বরং সরাসরি ফরাসী প্রশাসনের অবসান, মরোক্কান এবং ফরাসীদের মধ্যে সমতা বিধান,নির্বাচিত পৌর প্রশাসন এবং প্রশাসনে স্থানীয়দের অধিকতর অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী। পরে এসবের সাথে তাঁরা আরও যোগ করেন–সরকারীভাবে উপনিবেশবাদ রহিত করার দাবী। ১৯৩৬–৩৭ সালে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, পুলিশী কার্য্যক্রমে মরক্কোর বেশ লোকজন নিহত হয়। রাজনৈতিক দল 'এ্যকশন মরোক্কান' ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং তিন নেতার একজন আলাল ফা'সিকে নির্বাসন দেয়া হয়। ফরাসী শাসনের প্রতি এ'সব জাতীয়তাবাদী বিরোধীতার মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে আর সব কিছুর চেয়ে দু'টি বিষয় মরক্কোবাসীকে বেশী যন্ত্রণা দিয়েছে– ১)উচ্চ মর্য্যাদা ভোগী, ক্রমবর্ধমান ফরাসী বসতি স্থাপনকারীদের অধিকতর হারে জমি ক্রয় এবং এই নীতির উপর ফরাসী কর্মকর্তাদের পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ, ২) একই সাথে মরক্কোর কর্মকর্তাদের প্রশাসনের নিন্মস্তরে দাবিয়ে রাখা।

কিছু গুরুত্বপুর্ন বিষয়ে মরক্কো অথবা তিউনিসিয়ার চেয়ে আলজেরিয়ার অবস্থা ভিন্নতর । প্রথমতঃ কখনও সে পশ্চিম কিংবা পূর্বের সহোদরা রাষ্ট্রসমুহের মত আলাদা স্বয়ংসম্পুর্ন অথবা রাষ্ট্র কেন্দ্র ছিলনা বরং বরাবরই মরক্কো, তিউনিসিয়া কেন্দ্রীক সাম্রাজ্যের অথবা তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ। তাই এখানে প্রতিবেশীদের মত সমানতালে আরব কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রত্ব ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ আলজেরিয়ার সাথে ফ্রান্সের সাংবিধানিক সম্পর্ক,তার ধারা এবং প্রশাসনিক পদ্ধতি সবকিছুই মরক্কো, তিউনিসিয়ার চেয়ে আলাদা। ওই দুই রাষ্ট্রের স্থানীয় শাসকদের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে সেখানে ফরাসী অবস্থান মোটামুটি প্রটেক্টরেটের মত। পক্ষান্তরে আলজেরিয়া সরাসরি বিজিত হয়ে ফরাসী চেম্বার এবং সিনেটে প্রতিনিধিত্বসহ মেট্রোপলিটন ফ্রান্সের প্রদেশভুক্ত হয়।

সর্বোপরি দেশটা তিউনিসিয়ার চেয়ে ৫০ এবং মরক্কোর চেয়ে ৮০বছর আগে ফরাসী দখলদারীত্বে যাওয়ার ফলে যুদ্ধমধ্যবর্তী যে সময়ে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠার কথা ততদিনে ফরাসী প্রভাব এবং সংমিশ্রন মরক্কো, তিউনিসিয়ার চেয়ে অনেক গভীরে চলে যায়। তাই মধ্যত্রিশে আলজেরীয় জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রথম

প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় পুরোদস্তুর ফরাসী নেতা ফারহাত আব্বাসের মধ্যে,যার আন্দোলনের লক্ষ্য – ব্যক্তিগতভাবে আলজেরীয়ানদের মুসলিম পরিচয় অক্ষুন্ন রেখে ফ্রান্সের সাথে পুরোপুরি সম্মিলন। কৌতুকের বিষয় এইযে ,ফরাসী উপনিবেশবাদীরা বিশ্বখ্যাত ফরাসী যুক্তিজ্ঞানের বিপরীতে ফেরহাত আব্বাসের আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী অভিধায় ধিক্কার দেয়; ফলতঃ তিনি আলজেরীয়ান রাষ্ট্রের ফরাসী ইউনিয়নে মিশে যাওয়ার ধারনা ত্যাগ করেন।

আলজেরিয়ান অন্যান্য মুসলিম নেতারা প্রথম থেকেই ফ্রান্সের সাথে একত্রীভূত হওয়ার ধারনা বিরোধীতা পুর্বক, মুসলিম আলজেরীয়া রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতা মেসালি হাজ্জীর নেতৃত্বে অধিকতর জনপ্রিয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আলজেরীয় উলেমাদের নেতৃত্বে একই সময়ে রাজনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও আন্দোলনের তৃতীয়ধারা গড়ে উঠে। শতাব্দী ব্যাপী ফরাসী শাসনে শাসকদের উৎসাহ, প্ররোচনায় আন্তঃসংমিশ্রনের ফলে আরবী ভাষা এবং মুসলিমদের ধর্ম ডুবে যায় তারা ফরাসী সবকিছুতে উৎসাহ দেয় । এই আন্দোলন আলজেরিয়ায় স্কুল প্রতিষ্টা, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং বইপত্রের (যার সঙ্কট ছিল সবচেয়ে বেশী) ব্যবস্থায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে । এক্ষেত্রে আন্দোলনের সাথে মিশরের ইসলামিক ব্রাদারহুডের কিছুটা মিল দেখা যায় যেমন উভয়েরই লক্ষ্য আভ্যান্তরীন সংস্কার এবং মুসলিম সমাজের মানোন্নয়ন। তবে মুসলিম ব্রাদারহুড রাজনৈতিক লক্ষ্যে জনপ্রিয় আন্দোলন , আর আলজেরীয় আন্দোলন প্রাসঙ্গিক সময়ে শুধু অরাজনৈতিকই নয় বরং সব সময়ই রাজনৈতিক নেতাদের বলয়ে উচ্চনাদী কার্য্যক্রমের বদলে শিক্ষাবিদদের স্তরে তাদের কার্য্যক্রম চালিয়ে এসেছে।

লাভ- ক্ষতির খতিয়ান

(১)

প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেকার গত হয়ে যাওয়া ,সবমিলিয়ে এই পঁচিশ বছর আরব বিশ্বের প্রভূত পরিবর্তন আর অগ্রগতির সাক্ষী। একক বিষয় হিসেবে সবচে' গুরুত্বপুর্ন হচ্ছে বিশ্ব সমাজের অংশীদার রূপে আরবদের বিশ্বজোড়া পরিচয় পুনঃআবিস্কার যার আওতায় সিরীয়, মিশরীয়, ইরাকী, তিউনিসীয় প্রভৃতি স্থানীয় গ্রুপ তাদের স্ব-স্ব জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পুর্ন করার জন্যে উন্মুখ হয়েছে এবং এর অনেক ক্ষেত্রেই তারা প্রভুত সাফল্য অর্জন করেছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ন অর্জন বলতে এ'সময়ে নানা মৌলিক ক্ষেত্রে আরব সমাজের আধুনিক যুগে প্রবেশ; এখানে ওখানে আমেরিকা-ইউরোপীয় বিশ্বের সাথে আরব বিশ্বের মেলামেশা। এই প্রক্রিয়া আমরা শুরু হতে দেখেছি ১৯১৪ সালের আগে, মিশরীয় প্রশাসনে মোহাম্মদ আলী কর্তৃক ফরাসীদের নিয়োগ দানের মধ্য দিয়ে। লেবাননে পশ্চিমা মিশন সমূহ কর্তৃক স্কুল ,ছাপাখানা প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমে, এবং উচ্চ শিক্ষার্থে তরুন আরবদের ইউরোপ ,আমেরিকা গমনের মধ্য দিয়ে। তবে এর সবই ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত এবং স্থানীয় যোগাযোগ। বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কের বৃহত্তর পরিসরে আরববিশ্ব পর্দার আড়ালের মুসলিম রমনীর মতই থেকে গিয়েছিল। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়েই কেবল এই অন্তঃপুরবাসিনী তার ঘোমটা খুলে কসমোপলিটান সমাজের খোলা পরিসরে পা রাখে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়াটা প্রসারিত হয়েছে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে --বেতার, সিনেমা,বিমান ভ্রমন ইত্যাদি প্রচন্ড প্রতিবন্ধকতা বিধ্বংসী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা এবং আরবী প্রকাশনা জগতের ব্যাপক প্রসার আত্মম্ভরী ভাব, অতিচাটুকারীতা জাতীয়দোষ সত্বেও আরব দেশসমূহকে বিশ্ব সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। বিশেষকরে নারী শিক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। সুদুর সুদানে পর্যন্ত ছেলেদের সাথে সাথে আরব মুসলিম মেয়েরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আসা শুরু করেছে, তাদের অনেকেই মুক্ত পেশার লক্ষ্যে

পড়াশোনা করেন। মিশর,প্যালেস্টাইন, লেবানন এবং ইরাকের মত উন্নততর শহর সমূহে শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের জীবন ধারা পশ্চিমা ধাঁচ অনুসরন করতে শুরু করেছে। এই শ্রেণী থেকে বহুগামীতা একরকম বিদায় নিয়েছে। অনেক মহিলারাই পর্দা ছেড়েছেন (প্রকাশ্যে পুরোপুরি না হলেও অন্ততঃ সামাজিক উৎসব, উপলক্ষ্যে); তাঁরা স্বামীর সাথে বাইরে আসতে এবং স্বাভাবিক কসমোপলিটন সামাজিক জীবন যাপন করতে শুরু করেন।

স্ব-স্ব জাতীয় সংগ্রাম আরবদেশ সমূহকে আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিস্থাপন করে। উভয় তরফে প্রতিনিধিদল সমূহের আসা-যাওয়া দ্বিমুখী যোগাযোগের দ্বার খুলে দেয়। এভাবে ইরাকের মত দেশও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রবেশাধিকার নিয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক মঞ্চে বসার সুযোগ পায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরূত্বপুর্ন অগ্রগতি বলতে ইরাক ,সৌদী আরব,কুয়েত এবং আরব উপদ্বীপের অন্যান্য অংশে এমনকি মিশরেও তেল সম্পদ আবিষ্কার এবং (ইউরোপীয় ,আমেরিকান কোম্পানী সমূহের আরবদেশগুলো থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় পুর্বক) তেল উত্তোলনের জন্যে বিশাল শিল্প স্থাপনার ভিত্তি স্থাপন এবং তা মরুভূমির বুক চিরে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশ্ববাজারের জন্যে পরিশোধন ও জাহাজীকরনের জন্যে ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরসমূহে পরিবহন ইত্যাদি। কিছু কিছু আরবদেশে অকল্পনীয় প্রাচুর্য্য আনার পর্য্যায়ে এই শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সম্ভব না হলেও আরবদেশসমূহে নুতন আঙ্গিকে পশ্চিমা প্রভাবের সুচনায় এবং গোটা পৃথিবীতে আরব বিশ্বকে নুতন অর্থনৈতিক গুরূত্ব প্রদানের মধ্যদিয়ে এর শুরুটা ছিল ১৯৩৯রও বেশ আগে থেকে।

উল্লেখিত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি তখনও মুলতঃ সমাজে ভূসম্পত্তির মালিক, ব্যবসায়ী, পেশাজীবি, আমলা ইত্যাকার উচ্চ এবং মধ্যবিত্তের হাতে বন্দী। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা কৃষক,শহুরে শ্রমিক,মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পী কিংবা ক্রম অগ্রসরমান হাল্কাশিল্পের কারিগরেরা তখনও অত্যন্ত দারিদ্র্য, অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। অধিকাংশ জমি (বিশেষতঃ সিরিয়া ও মিশরে) এস্টেট হিসেবে কিছু বড় বড় পরিবারের মালিকানায় যারা একধরনের সামন্তবাদী আভিজাত্য তৈরী করে নিয়েছে (এই শ্রেণীর মধ্যে শরীয়াহর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান জমি বন্টনে আইনগত দ্বন্ধে বাধাগ্রস্থ হয়ে তাদের হাতে জমি কুক্ষিগত করার সুযোগ করে দিত যেন তা সম্পদ নয় বরং দান খয়রাতের ধর্মীয় বরাদ্দ)। কৃষকের আয় এবং মজুরের বেতন তখনও খুব সামান্য। তাদের রাজনৈতিক প্রভাব, গুরূত্বের তুলনায় তাদের জন্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা বড্ড অপ্রতুল। মিশর ,প্যালেস্টাইন, লেবানন, সিরিয়া এবং ইরাকে তখন ট্রেড ইউনিয়নিজম উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। সেখানে তখন ইউরোপীয় ফ্যাসিস্ট, সোসালিস্ট বা কম্যুনিস্ট ভাবধারার নুতন রাজনৈতিক দলসমূহ আর্থ-সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচী সামনে নিয়ে আসছে। তবে বিদেশী দখলদারীত্ব এবং উপনিবেশবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে চ্যাম্পিয়নে পরিণত হওয়া পুরোন রাজনৈতিক দল যেমন মিশরে ওয়াফাদ, সিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী মাঠ জুড়ে থেকেছে। তাদের লক্ষ্য সামাজিক সংস্কারের পরিবর্তে স্বাধীনতা। তাদের আবেগী জাতীয়তাবাদী শ্লোগান সঙ্কটকালে ভূ-মালিক,ব্যাবসায়ী, পেশাজীবি, কৃষক, শ্রমিককে উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করেছে। বাস্তবিকই স্বাধীনতার ইস্যু এবং আবেগী জাতীয়তাবাদের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণেই ক্ষমতাবান ধনিক শ্রেণী প্রায়ই তাদের বিরুদ্ধে কৃষক , শ্রমিকের অসন্তোষকে ফরাসী, বৃটিশদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়েছে।

১৯৩০ এর ঈঙ্গ-ইরাকী চুক্তি, ১৯৩৬সালের ঈঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি সত্বেও ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হলে জনমত পশ্চিমের বিশেষতঃ বৃটেনের বিরুদ্ধে যায়। এই সুর বাঁধা হয়েছিল ১৯১৯ সালে শান্তি সমঝোতার মাধ্যমে যাকে আরবরা বরাবরই বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। ১৯১৯-১৯৩৯ দীর্ঘ কুড়ি বছরের বিরাট অংশ জুড়ে, আরবদেশ ও পশ্চিমা দেশসমূহের মধ্যেকার নানা দ্বন্ধ সংঘাত চরম উত্তেজনাকর সময় শেষেও কুটনৈতিক ভাবে টানা হেঁচড়ার ফলে আরো পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে । এই সময়ের শেষদিকে বৃটেন, ফ্রান্সের সাথে প্রতিটি দেন-দরবারে পাওয়া আরব ব্যথা বঞ্চনাকে বড় করে দেখিয়ে অক্ষ

শক্তির প্রচারনা খুবই সক্রিয় হয়ে উঠে। এই শোক তাপের একটি : প্যালেস্টাইন প্রশ্ন যা বাড়িয়ে বলার অবকাশ নেই বললেই চলে। আরবদের মনে হয়েছে, বৃটেন কুড়ি বছর ধরে পুর্বাঞ্চলীয় আরববিশ্বের হৃৎপিন্ড এবং ইসলামের পবিত্রতম কতিপয় স্থান দখলে বিদেশী লোকদের সহায়তা করে এসেছে।

এই একটানা দীর্ঘায়ীত পলিসির তিক্ত প্রতিক্রিয়া অনেক বিলম্বিত ১৯৩৯র শ্বেতপত্রে মুছে যাওয়ার ছিলনা। শ্বেতপত্রে যদিও ইহুদী জাতীয় আবাসন সম্প্রসারনের সীমা বেঁধে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে ,পরবর্তী আরও দশ বছরে সেই সীমা নির্ধারন সম্ভব হয়নি; সময় এলে বৃটেন সত্যিই এ সীমা সংরক্ষন সমর্থন করতো কিনা তাতেও আরবরা সন্দিহান। অধিকন্তু বৃটেন যে জনগোষ্ঠীকে আরববিশ্বের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে সেই জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই নাৎসীরা অবিরাম যুদ্ধ ঘোষনা করেছে। অতএব, যুদ্ধ শুরু হলে আরব ও জার্মানদের পারস্পরিক সহানুভূতি অবশ্যাম্ভাবী ছিল। খুব কম আরবই তলিয়ে দেখেছে যে, হিটলারের ইহুদী নিধন পলিসি না এলে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের চাপ এত মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিতনা। আরবদেশ সমূহের সাধারণ জনগন বুঝে নিয়েছে তাদের এবং জার্মানদের শত্রু এক ও অভিন্ন । একই শত্রু বৃটেন-ফ্রান্সও যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হওয়ার সুবাদে দেশ দখল করেছে; স্বাধীনতা দাবী করলে গুলি করতে সৈন্য পাঠিয়েছে এবং পদে পদে তাদের জাত্যাভিমান খর্ব করেছে।

সুতরাং ১৯৩৯ সালে আরবদের অনেকের মনে বাস্তবতা বর্জিত হলেও সন্তুষ্টি হিসেবে জার্মানীর যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন থাকা বিচিত্র ছিলনা । যুদ্ধের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র - মিত্র শক্তির এই দাবী আরব কানে নিছক তামাশার মত শুনিয়েছে। মিত্ররা বিশ্বের সেরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি; অথচ আরবরা কখনও জার্মানদের শাসক রূপে দেখেনি সুতরাং তারা সম্ভাব্য মুক্তিদাতা হতেও পারতো। সিদ্ধান্ত নেবার অপয়া সময় এলে শুধু একটিমাত্র আরবদেশ, অথবা বলা যায় একটি বিশেষ চক্র তাদের বৈধ সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করে তথা তাদের সমর উদ্যোগ প্রতিহত করতে সম্ভাব্য সবকিছু করে। সেই দেশের নাম ইরাক।

(২)

ইরাকের আভ্যান্তরীন বিদ্রোহ এবং ১৯৪২ সালে বৃটেনের বিরুদ্ধে স্বল্পস্থায়ী বিদ্রোহের অনেক কারন দর্শানো যায়। প্যালেস্টাইনে বৃটিশ নীতির চরম বিরোধীতাকারী আরবদেশগুলোর অন্যতম ইরাক। ১৯৩০ সালে নিজস্ব জাতীয় আশা আকাঙ্খার ক্ষেত্রে বেশ সন্তুষ্টি অর্জন করলেও, ইহুদীবাদ প্রশ্নে ইরাক ১৯৩৯ সাল নাগাদ বৃটেনের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপর জেরুযালেমের মুফতি হাজী আমিন আল হুসেইনীর বাগদাদ আগমনে এই বিরোধীতা সক্রিয় ইন্ধন পায়। যুদ্ধ শুরুর আগে মুফতি প্যালেস্টাইন ছাড়তে বাধ্য হয়ে (১৯৩৬-৩৯ সালে আরব বিদ্রোহে ভুমিকা রাখার দায়ে) প্রথমে লেবাননে আশ্রয় চান, ফরাসীরা আশ্রয় দেয় কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে তা বাতিল করে। ফলে লেবানন ছেড়ে মুফতি ইরাকে আসেন, এখানে তাঁর প্রভাব মিত্রদের উদ্দেশ্য এবং বৃটিশ মৈত্রীতে চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক বিষয়ে ঘন ঘন সামরিক হস্তক্ষেপ এবং একের পর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ইরাকের সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থা বলতে গেলে একরকম ধ্বংস হয়ে যায়। ইরাক অসময়ে শুধু যে প্রথম রাজা বিজ্ঞ এবং প্রভাবশালী প্রথম ফয়সলকে হারিয়েছে তা নয়, পরবর্তীতে তাঁর ছেলে সিংহাসনে আরোহনের পরপরই মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন, ফলতঃ নাবালক রাজার চাচা আমীর আব্দুল ইলাহ্‌র অভিবাকত্বে(রিজেন্ট)ইরাক রাজকীয় অপ্রাওবয়স্কতার কঠিন সময়ের মধ্যে পড়ে যায়। শেষতঃ যুদ্ধ শুরুর আগে আগে জার্মান মন্ত্রী ডঃ গ্রোবার এর নেতৃত্বে অক্ষশক্তির প্রচারনাও খুব জোরদার ছিল। এতে

জার্মান উদ্দেশ্য আদর্শ বেশকিছু ইরাকী রাজনীতিবিদ, অফিসারের মন জিতে নেয় । ১৯৪০-৪১ সালের জার্মান বিজয় তথা ধ্বংস যজ্ঞসমুহে ইরাকী গোষ্ঠী ধরে নেয় যুদ্ধে নিশ্চিত চুড়ান্ত বিজয় জার্মানদের।

সোনালী চর্তুভূজ নামে পরিচিত চার কর্ণেল এবং রাজনীতিবিদ রশীদ আলী আল গেলানীর যোগসাযশে আরও একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, যার উদ্দেশ্য ইরাককে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া। রিজেন্ট আব্দুল ইলাহ্কে গৃহবন্দী করা হয়; পরে তিনি নূরী পাশা আল সাঈদ (সমকালীন ইরাকী রাজনীতিতে প্রধান ব্যক্তিত্ব এবং আজীবন বৃটেনের সাথে মৈত্রীর সম্পর্কে বিশ্বাসী) সহ ঈঙ্গা-ইরাকী চুক্তিতে বিশ্বস্থ আরও কিছু নেতাকে নিয়ে বাগদাদ থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। আব্দুল ইলাহ্ বসরায় বৃটিশ যুদ্ধজাহাজে আশ্রয় নেন এবং বৃটিশ সৈনিকদের হাতে এই ত্রিশদিনের বৃটিশবিরোধী যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেশের বাইরে অবস্থান করেন।

বাগদাদের বেসামরিক রাজনীতিবিদদের অনেকেই আন্তরীকভাবে রিজেন্ট'র অনুগত হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা পুরোপুরি চলে যায় সোনালী চতুর্ভূজের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর হাতে; যারা সিরিয়া হয়ে আকাশ পথে তাৎক্ষণিক পর্য্যাপ্ত জার্মান সাহায্যের সম্ভাব্য ভরসায় ইরাকে বৃটিশ সেনা ও বিমান ঘাঁটি সমুহ আক্রমন করে। বৃটিশ সামরিক শক্তি সংখ্যায় কম এবং গুটি কতেক স্থানে খোলা অবস্থানে থাকলেও কোনমতে ঠিকে যায়। বসরায় দ্রুত সেনা সরবরাহ এসে পৌঁছার ফলে পাল্টা আক্রমনে তারা অধিকতর সফল হয়। ওদিকে জার্মানীর কাছ থেকে কাঙ্খিত সাহায্য আসেনি। ইরাকী সেনা ও বিমান বাহিনী বৃটিশ বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়। বসরার বেসামরিক জনগন নুতন করে সেনা আমদানীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালেও ক্রমান্বয়ে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসতে থাকায় তা মেনে নেয়। পুরো ব্যাপারটাতে মাসখানেক সময় লাগে। পরাজয়ের লক্ষণ পরিস্কার হয়ে উঠলে বিদ্রোহ পরিচালনাকারী অফিসার,রাজনীতিবিদগন মুফতির নেতৃত্বে পারস্য অথবা সৌদিয়ার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি দেশত্যাগ করেন। 'রিজেন্ট' এবং নূরী পাশাও দেশে ফেরেন। বৈধ সরকারের নেতৃত্বে ইরাক দৃঢ় আনুগত্যে বৃটেনের সাথে মৈত্রী চুক্তির শর্তসমুহ পালনে এবং বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধানে এগিয়ে যায়। মহাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে মধ্যপ্রাচ্য কর্মকান্ডকে সবরকম সাহায্য দেয়া হয়, এবং ইরাক থেকে একটি সেনা কলাম সিরিয়ায় ভিশি ফ্রান্সকে আক্রমনে যেতেও সমর্থ হয়। পরে ইরাক জাতীসংঘ ঘোষনায় স্বাক্ষর করে এবং ১৯৪৩ এর জানুয়ারীতে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে।

'জাতীয় মুক্তির জন্যে' লড়াইয়ে তাদের চরম লজ্জাজনক পরাজয় সত্বেও বৃটেনের প্রতি বিদ্বেষ, বৃটিশ দখলদারীত্বের শেষটুকুও মুছে ফেলতে ইরাকী জাতীয়তাবাদের কামনা কখনও লুপ্ত হয়নি। জাতীয়তাবাদীদের একটা সংখ্যালঘু চরমপন্থী শাখা বৃটেনের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদের দাবীতে অটল থাকে। কিন্তু যুদ্ধশেষে- স্টিফেন লংরিজের ভাষ্যে--"সব রাজনীতিবিদদের দাবী হচ্ছে- তাদের স্বাধীনতা ও মুক্ত ইচ্ছার মাঝে সবরকমের বাধা অপসারন, দেশকে জুনিয়র পার্টনার বুঝায় এরকম সব কার্য্যক্রমের অবসান, জনগনের মান মর্য্যাদা, গৌরবের ক্ষতিকর সব বিধি-বিধান রহিত করন, ইরাকের হৃৎপিন্ডস্বরূপ 'হাব্বানিয়া'এবং 'সুআইবা'থেকে বৃটিশ সেনানিবাস তুলে নেয়া।"

বৃটেনের সাথে অধিকতর কার্য্যকর সমতার ভিত্তিতে মৈত্রী টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ১৯৩০ সালে সম্পাদিত চুক্তি পুনর্বিন্যাসের আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। বৃটিশ সরকার ছিল অনুকূলে, এবং অগ্রগতিও এত দ্রুতগতিতে হয় যে, সে বছরের ডিসেম্বরে নূরী পাশা আল সাঈদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল লন্ডন যান, ইরাকী প্রতিনিধিদল এবং বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেস্ট বেভিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ পোর্টসমাউথে এই চুক্তি সাক্ষর করেন। চুক্তিতে যুদ্ধকালীন সময়ে তাৎক্ষনিক পারস্পরিক সাহায্যের বিধান, ইরাকে বৃটিশ ঘাঁটি দু'টি ইরাকের কাছে হস্তান্তর, সেখানে বৃটিশ খরচে কিন্তু ইরাকী নিয়ন্ত্রণে সীমিত সংখ্যায় বৃটিশ সৈন্য রাখা,যুদ্ধ বাধলে ঘাঁটি দু'টি পুন:রায় বৃটিশ নিয়ন্ত্রনে অর্পন, বৃটিশ সামরিক মিশনের (১৯৩০ সালের চুক্তির স্মারক) পরিবর্তে সম্মিলিত কাউন্সিল গুরুত্বপুর্ন সামরিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করবে ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়।

অধিকাংশ ইরাকী নেতাই কোন না কোনভাবে বৃটেনের সাথে মৈত্রী অথবা সুরক্ষার সম্পর্ক চেয়েছে ধরে নিলে পোর্টসমাউথ চুক্তি তাদের আশার সাথে সঙ্গতিপুর্ন। কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়েছে চুক্তিটি জনসমক্ষে প্রকাশ করার সময়। প্রথমতঃ প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সহকর্মীরা ইংল্যন্ড থেকে বাগদাদ পৌঁছার আগেই চুক্তি প্রকাশের অনুমতি দেন; ফলে চুক্তি প্রকাশ হলে তা সমর্থন ও ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে কোন উঁচু পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা তখন বাগদাদে নেই। দ্বিতীয়তঃ চুক্তির আরবী কপি বাগদাদে বেরোনর আগেই ইংল্যান্ডে ইংরেজী কপি প্রকাশিত হলে ইরাকীদের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগে, বিরূপ জল্পনা কল্পনার জন্ম দেয়। সরকার বিরোধীরা শুধু চুক্তি বর্জনই নয় বরং অন্য অনেক কারণ মিলিয়ে সরকারের অপসারনও চায়।

বাগদাদের অবস্থা চরম আকার ধারন করে এবং দেশ আবারও বিদ্রোহের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। 'রিজেন্ট' প্রথমে চুক্তির সমর্থন , এবং সম্পন্ন হওয়ায় বৃটেন সরকারের সাথে টেলিগ্রাম শুভেচ্ছা বিনিময় করেও পরিবর্তিত ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতে ---"গভীর পরীক্ষার পর জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রতীয়মান না হওয়ায় " তা বাতিল করতে বাধ্য হন। পোর্টসমাউথ চুক্তির মৃত্যু হয় এবং বিষয়টা সেখানেই ঝুলে থাকে। আন্তর্জাতিক আইন এবং বাস্তবে ইরাকে বৃটিশ অবস্থান ১৯৩০ সালের চুক্তি অনুসারেই জারী রইল, যা জাতীয়তাবাদীদের চোখে পোর্টসমাউথ চুক্তির চেয়ে ভাল কিছু নয়। তবুও ইরাকী জাতীয়তাবাদীদের কাছে অর্জিত অবস্থানের প্রতি নীরব সমর্থন দেয়া সহজ মনে হল, যে অবস্থান তারা বদলাতে প্যারছিলনা অথচ ইরাকে অব্যাহত বৃটিশ মৈত্রীর বাধ্য বাধকতা,ইরাকের মাটিতে বৃটিশ সৈন্য সহ যৌথ সেনাঘাঁটি রাখার নুতন চুক্তিতে সই দেয়ার চেয়ে তা সহজেই মুখের কথাতেই বাতিল করা সম্ভব ছিল। ১৯৫৫ সালের প্রথমার্ধে সম্পাদিত ইরাক-তুর্কি চুক্তিতে বৃটেনের সংশ্লিষ্টতাবলে বৃটেন ইরাক সমঝোতার মাধ্যমে ১৯৩০ এর চুক্তি বাতিল হয় এবং এমনকি যুদ্ধকালীন সময়ে পারস্পরিক সহযোগীতার জন্যে নুতন ব্যবস্থাও হয়।

(৩)

ফ্রান্স এবং 'লেভান্ট' দেশসমুহের মধ্যে ১৯৩৬ সালে সম্পাদিত চুক্তিসমুহ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়েও ফরাসী সিনেটে অনুমোদিত হয়নি। অধিকন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আগে ফরাসী সরকার সিরিয়ার সংবিধান স্থগিত করে সেখানকার শাসনভার হাইকমিশনারের নেতৃত্বে কাউন্সিল অফ ডাইরেক্টরের হাতে ন্যস্ত করে। এতে আবারও দেশের সংহতি নষ্ট হয়, জেবেল দ্রোজ এবং লাতাকিয়া অঞ্চলে (আলেকজান্দ্রাত্তা অঞ্চল আগেই তুর্কিদের হাতে ছেড়ে দেয়ার ফলে সিরিয়ায় তুর্কি এবং ফ্রান্স বিরোধী মনোভাব বাড়ে) পুনঃরায় আলাদা প্রশাসন সৃষ্টি করা হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই লেবাননের সংবিধান স্থগিত করা হয় এবং এখানেও সিরিয়ার মত সরাসরি প্রশাসন চালু করা হয়।

১৯৪০ সালে ইউরোপে ফ্রান্সের পতনের পরপরই সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী অবস্থান ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। ফ্রান্সের ভিসি প্রশাসন এখানে আপাতঃদৃষ্টিতে বজ্রমুষ্টি অব্যাহত রাখলেও মার খাওয়া, পরাজিত জাতী হিসেবে ফ্রান্সের নৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। সিরিয়া এবং লেবানন নিশ্চিত অনুধাবন করে যে যুদ্ধে যে পক্ষই জিতুক ফরাসী শাসনের দিন শেষ। লেবাননে মুসলিমদের সাথে মেরোনাইটদের বড় এক অংশ এবং অন্যান্য গোত্র সমুহের সম্মিলিত জোট ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্টতায় স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেয়। বৈরুত , দামেস্ক দু'জায়গাতেই জাতীয়তাবাদীরা সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে।

১৯৪১ সালে বৃটিশ এবং স্বাধীন ফরাসী কন্টিনজেন্টের যৌথ বাহিনী সিরিয়া, লেবাননে ভিশি শক্তিকে আক্রমন করলে সে সুযোগ অথবা তার প্রথম সুচনা ঘটে । আক্রমনের পূর্বমুহূর্তে সিরিয়া এবং লেবাননে ম্যান্ডেটরি প্রশাসন বাতিল, ভবিষ্যতে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্টা সহ সেই স্বাধীনতার গ্যারান্টি সম্বলিত চুক্তি

সম্পাদনে ফ্রান্সের অভিপ্রায়ের নিশ্চয়তা দিয়ে জেনারেল দ্যগলের পক্ষে জেনারেল ক্যাথোজ এক ঘোষনা দেন। এই ঘোষনাকে বৃটিশ সরকার প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেয়, এবং পরবর্তীতে সিরিয়া, লেবাননের স্বাধীনতার গ্যারান্টর নিযুক্ত হয়। দুই দেশের জনগন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ঈঙ্গা-ফরাসী প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতায় নুতন নিশ্চয়তা গ্রহনে দ্বিগুন দ্বিধান্বিত। তদুপরি নিঃশর্ত স্বাধীনতার স্বপ্নে ভবিষ্যতে সম্পাদিতব্য চুক্তিতে শর্তাবলীর মধ্যে আরোপিত সীমাবদ্ধতা আরোপের আশংকায় তাদের সন্দেহ অমূলকও নয়।

মূল শক্তি বিবেচনা পুর্বক শুরু থেকেই সিরীয় , লেবানীজরা বাস্তব পরিস্থিতি বিচারে তাদের সুখ-দুঃখ এবং ভবিষ্যৎ চাওয়া পাওয়ার কথা বৃটিশদের জানিয়ে এসেছে। পক্ষান্তরে বৃটিশরা তাদের মুক্ত ফরাসী মিত্র এবং সিরীয় , লেবানীজ জাতীয়তাবাদী যাদের স্বাধীনতার তারা গ্যারান্টর দুয়ের মাঝখানে নিজেদের অত্যন্ত নাজুক অবস্থানে আবিষ্কার করলো। সদ্য স্বাধীন জনগন তাদের স্বাধীনতার রকমফেরে অসন্তুষ্ট হয়ে সমরায়োজনে বিপত্তি ঘটাক এটা যেমন তারা চায়না তেমনি তারা ভাল করেই জানে ফ্রান্সের চিরদিনের বিশেষ স্বার্থের লেভান্ট এলাকায় সদ্য স্থাপিত ত্রিভূজ সম্পর্কে বৃটেনের পদার্পন, ফ্রান্স অবস্থানগত দুর্বলতা স্বত্বেও সবসময় বাঁকা চোখে দেখবে। অতএব প্রথমদিকে বৃটেনের মনোভাব ছিল সিরিয়া, লেবাননে মুক্ত ফ্রান্সকে পরাজিত ভিশি ফ্রান্সের সবরকম ক্ষমতা ভোগ করতে দেয়া এবং এ এলাকার জনগনকে গ্যারান্টিযুক্ত স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা, একই সাথে,লেভান্ট অঞ্চলে তাদের আগমন যে শুধুমাত্র যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং তা কোনভাবেই ফ্রান্সকে ঠেক্কা দেওয়া নয় তা পরিস্কার করা।

বৃটেনের এই মনোভাব , যুদ্ধকালীন বিধি নিষেধ এবং অভাব অভিযোগের সংমিশ্রনে সিরিয়া , লেবাননের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে হতাশা এবং ক্ষোভের জন্ম দেয় ; অসন্তোষ বাড়তে থাকে। নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংবিধান পুনঃচালু করার দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়। ফরাসীরা প্রথমে তা প্রতিহত করে তবে পরে বৃটেনের পরামর্শে ১৯৪৩ সালে নির্বাচন দিতে সম্মত হয়।

নির্বাচনে লেবাননকে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে ফ্রান্সের সাথে যুক্ত রাখতে আগ্রহী দলের বিরূদ্ধে বৃহত্তর আরব আন্দোলনে যুক্ত করতে আগ্রহী দলের বিপুল বিজয় ফ্রান্সের জন্যে প্রথম আঘাত হয়ে আসে। আরো আঘাত তখনও বাকী। নুতন সংসদের অধিবেশন এবং সরকার গঠন হওয়া মাত্রই দুইদেশের জাতীয়তাবাদীরা ম্যান্ডেটের আওতায় ফ্রান্সের যত বিশেষ ক্ষমতা তথা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপর বিধি-নিষেধ আরোপকারী সব আইন কানুন বাতিলের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে দুইদেশে ভবিষ্যতে যুদ্ধশেষে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে পুর্ণ স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতিতে ফ্রান্স সিরিয়ান অথবা লেবানীজদের একক কোন ঘোষনা দেবার অধিকার অস্বীকার করে। যুদ্ধশেষে বৃহৎশক্তির মধ্যে অবস্থান ফিরে পেয়ে ফ্রান্স তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে এ'কথা লেবানীজ, সিরিয়ানরা বিশ্বাস করেনি। ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে এবং বৃটেন কর্তৃক স্বাধীনতায় নিশ্চয়তা প্রদানের সুবাদে প্রয়োজনে তার সাহায্য পাওয়া যাবে ভরসায় বৃটিশ শক্তি লেভান্ট অঞ্চলে থাকা অবস্থাতেই তারা তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা চেয়েছে। কিছুকাল কুটনৈতিক টানাপড়েনের পর লেবানীজ সংসদ দেশের স্বাধীনতা বিরোধী সমস্ত বিধি নিষেধ বাতিলের আইন পাশ করে ফরাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

ফরাসীরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এবং অধিকাংশ মন্ত্রীদের গ্রেফতার, সংবিধান স্থগিত , সংসদ বাতিল এবং তাতে ইতোপুর্বে পাশকৃত আইন অবৈধ ঘোষনা করে প্রতিশোধ নেয়। এই গভীর সঙ্কটের মধ্যেই লেবাননের মুসলিম-খ্রীশ্চান সংহতি অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বাস্তবতার অধিক গভীরে গিয়ে পৌঁছে। দেশ জুড়ে সপ্তাহব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম দুই মন্ত্রী পাহাড়ী এলাকা থেকে সরকারের পক্ষে নির্দেশনামা জারী করতে থাকেন। পক্ষান্তরে ফরাসীরা কট্টর ফ্রান্স সমর্থক এক নেতাকে সরকার গঠন করতে আহ্বান করেন, তিনি তাতে অসমর্থ হয়ে বরং আমলাদের নিয়ে এক কাউন্সিল গঠন করে সন্তুষ্ট থাকেন। চারিদিকের আরবদেশসমূহ বিশেষ করে মিশর থেকে সমর্থন ও সমবেদনা আসা অব্যাহত

থাকে। এ'সময় মিশরীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ওয়াফাদ নেতা নাহাশ পাশা আরবলীগ গঠন আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। যেহেতু সিরিয়া, লেবাননকে বাদ দিয়ে আরবলীগ গঠন অসম্ভব এবং দেশ দু'টির স্বাধীন মর্য্যাদা ছাড়া তাদের অন্তর্ভুক্তিও অবান্তর তাই লেবাননের প্রতি সবার সমর্থন। বাড়তি বলতে ফ্রান্সের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ পুর্বক খ্রীশ্চান অধ্যুষিত লেবাননের আরববিশ্বে স্বাধীন পরিচয় দেবার সিদ্ধান্তে মিশর,ইরাকের মত মুসলিম অধ্যুষিত আরব দেশসমুহের মাত্রাতিরিক্ত কৃতজ্ঞতা।

মুসলিম দেশসমুহে নিজের সুনাম অক্ষুন্নরাখা কিংবা ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে লেভান্ট অঞ্চলে যে কোন বিরোধ যেন যুদ্ধের উপর বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে ভাবনায় বৃটেন ফ্রান্সকে গতি পরিবর্তনের জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। চতুর্মুখী বিরোধীতার ফলে ফ্রান্স অবশ্যাম্ভাবীতার প্রতি সমর্পিত হয়ে গ্রেফতারকৃত প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রীদের মুক্তি দেয়; লেবাননের সংবিধান এবং জাতীয় সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে স্বাধীনতার পক্ষে লেবানীজদের (কিছু পরে সিরিয়দেরও) একতরফা গৃহীত পদক্ষেপসমুহ স্বীকৃত হয়।

উভয় দেশের পুর্ণ স্বাধীনতা তথা সবরকমের ফরাসী দখলদারীত্ব থেকে মুক্তি পেতে তখনও এক রাউন্ড যুদ্ধ বাকী। ১৯৪৫ সালে ইউরোপে যখন যুদ্ধ শেষ পর্য্যায়ে ,ফরাসীরা দ্য গলকে প্যারিসে অস্থায়ী সরকার প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত করে সিরিয়া ও লেবাননে তাদের পুরাতন ঘাঁটি ধরে রাখার প্রতি জোর দেয়। বৈরুতে নুতন করে সৈন্য বোঝাই জাহাজ আসতে থাকে। এতে সিরীয়, লেবানীজরা পুরাতন জোর জবরদস্তিমুলক পলিসির নবায়ন আশঙ্কা করে। উত্তেজনা বাড়তে থাকে, সিরিয়ার প্রধান শহরসমুহে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে ফরাসীরা কুড়ি বছর আগের মত আবারও গোলাগুলি,বোমাবর্ষন করে।

জাপানের সাথে চলমান যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তার বিষয়টা তখনও বৃটেনের উদ্বেগের বিষয় তাই সে সহিংসতা বন্ধ করতে এগিয়ে আসে। পরবর্তী বছর নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়া এবং লেবানন জাতি সংঘের সদস্য হিসেবে তাদের ভূমি থেকে সকল বৃটিশ , ফরাসী সৈন্য প্রত্যাহারের আবেদন জানায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ মার্কিন প্রস্তাব অনুমোদন করে। এভাবে বৃটেনের প্রতি ইরাক, মিশরের চুক্তিভিত্তিক দায়াবদ্ধতার মত ফ্রান্সের প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা কিংবা নিজেদের ভূমিতে বিদেশী সৈন্য অথবা ঘাঁটি রাখার দায় দায়ীত্ব ছাড়া সিরিয়া এবং লেবানন এক একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে যুদ্ধ থেকে উঠে আসে। তাদের এই নুতন মর্য্যাদা লাভ সম্ভব হয় অংশতঃ যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় এবং অংশতঃ বৃটেনের সক্রিয় সহযোগীতা ,গ্যারান্টির ফলে। যার জন্যে ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাদের বহিষ্কারে ক্রমাগত ইন্ধন জোগানোর দায়ে মিত্র বৃটেনকে দীর্ঘকাল যাবৎ ক্ষমা করতে পারেনি।

(৪)

যুদ্ধকালীন সময়ে মিশরে(এবং ইরাকেও) বৃটেনের নিজেরও সমস্যার কমতি ছিলনা। সেবারও বিরোধ চরমে উঠলে ফারুখ ওয়াফাদকে বাদ দিয়ে সংখ্যালঘু সরকার দিয়ে দেশ শাসন শুরু করেন। জানা যায় তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে ইতালী প্রীতি(যিনি ইতালীতে মানুষ হন) প্রাপ্ত হন, পিতার রেখে যাওয়া পারিষদদের মধ্যেও তার অস্তিত্ব ছিল। পক্ষান্তরে তাঁর মন্ত্রী এবং ব্যক্তিগত উপদেষ্টাদের অনেকেই বিশেষতঃ ১৯৪০ সালের দিকে জার্মানীর প্রাথমিক বিজয় সমুহে বিশ্বাস করতে থাকেন যে যুদ্ধে অক্ষশক্তির বিজয় নিশ্চিত। রাজা সেভাবেই বৃটেনের সাথে চুক্তির অংশ বিশেষ মাত্র পালন করার পরামর্শ পেতে থাকেন । এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মিশর জার্মানীর সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করলেও ইতালীর সাথে তা অব্যাহত রাখে।

বৃটেন এই কর্মের জন্যে দায়ী মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করিয়ে নুতন মন্ত্রীসভার কাছে পুর্ন সহযোগীতা লাভে সমর্থ হলেও সরকারের দৃঢ় গণ-ভিত্তির অভাবে মিশরের পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে। ১৯৪২ সালের কালো অধ্যায়ে , পশ্চিমের মরুভূমি থেকে দ্বিতীয় বারের মত বৃটিশ সেনাদল পশ্চাদপসারন করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কায়রোর রাস্তায় রাস্তায় ছাত্ররা "আমরা সবাই রোমেলের সৈন্য" শ্লোগান দিতে থাকে। সমস্ত দ্বিধা, দুর্বলতা , বিরোধীতা স্বত্বেও ওয়াফাদ নেতা নাহাশ পাশা যথাযথ ভাবে চুক্তি অনুসরন ও বাস্তবায়নে দৃঢ় অবস্থানে থাকেন। কিন্তু ফারুখ তখনও তাকে বহাল করতে অস্বীকার করেন। বৃটিশরা রাজার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়।

আবেদীন প্রাসাদ ট্যাংক দিয়ে ঘেরাও করে রাজাকে নাহাশ পাশার পুর্নবহাল অথবা দেশত্যাগের চরমপত্র দেয়া হয়। রাজা নতি স্বীকার করেন। ফলে ১৯৪২ সালে আলামেন সঙ্কটকালে, রোমেল যখন আলেকজান্দ্রিয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তখন মিশরের শক্তিশালী সরকার শক্তহাতে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রন করছে, বৃটিশ সৈন্যদের প্রয়োজন সবরকম সাহায্য সহযোগীতা দিয়ে যাচ্ছে। চরম মুহূর্তেও মিশরীয় জনগন সক্রিয় সহায়তা কিংবা নীরবতার মধ্যদিয়ে প্রমাণ করে যে তারা অক্ষশক্তির পরিবর্তে বৃটেনের পাশেই আছে। গ্রীষ্মের সেই সঙ্কটপুর্ন সপ্তাহকালে মিশরে কোন বৃটিশবিরোধী চোরাগোপ্তা হামলা কিংবা আন্দোলন, বিরোধীতা হয়নি। নাহাশ পাশা এবং তাঁর সরকার কায়রো পরিত্যাগ না করতে দৃঢ় থাকেন; তাদের দৃঢ়তা এবং শান্তভাব বজায় রাখতে পারা বৃটিশ সেনাবাহিনীকে প্রথমে অক্ষশক্তির আক্রমণ মোকাবিলা এবং পরে আল আলামেইনে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনে সহায়তা করে।

এতকিছু সত্বেও সেনাশক্তির মাধ্যমে জোরপুর্বক রাজাকে বাধ্য করানোর ঘটনায় মিশরীয় জাত্যাভিমানে লাগা আঘাত, মিশরীয় জাতীয়তাবাদের বিলাপের সাথে এসে যুক্ত হয় এবং তা রাজার প্রতি খুব একটা ভালবাসা নেই এমন সব জনগনের মধ্যেও সংক্রামিত হয়।
যুদ্ধ শেষে শুধু সুয়েজখাল এলাকা নয় বরং আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো ব্যাপী পুরো মিশরটাই এক বিশাল মিত্র সেনাঘাঁটিতে পরিণত হয়। অথচ ১৯৩৬এর চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক সময়ে বৃটেন মিশরে ১০,০০০ সৈন্য রাখতে পারে তাও সুয়েজ খাল এলাকায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসায় প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

প্রধান প্রধান শহরসমূহ থেকে সৈন্য অপসারন এবং একই সাথে মিশরে সেনাসংখ্যা কমানোয় বৃটিশদের বিলম্ব করা মারাত্মক ভুল প্রমাণিত হয়। দেশব্যাপী বিপুল সংখ্যক বৃটিশ সেনা উপস্থিতি জাতীয়তাবাদী চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করে, তারা সুয়েজ খাল এলাকা সহ পুরো মিশর থেকেই সেনা প্রত্যাহারের দাবী করতে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে সিরিয়া, লেবাননে কোন রকমের ফরাসী উপস্থিতির শর্ত ছাড়াই স্বাধীনতা লাভের সার্থকতা তাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আরবলীগের নেতা হিসেবে মিশরে বৃটিশ সেনা উপস্থিতি এবং ইত্যাকার খবরদারী আরব দেশ সমূহে এবং বর্হিবিশ্বে মান সম্মানের বিচারে মিশর অধিকতর বিচলিত বোধ করে। শুধু সিরিয়া, লেবানন নয় আরবলীগের আরও দু'টি দেশ ইয়েমেন, সৌদি আরব ধন সম্পদ, সাংস্কৃতিক অর্জন এবং আন্তর্জাতিক মর্য্যাদায় মিশরের চেয়ে অনেক পেছনে হলেও তারা তুর্কি থেকে স্বাধীনতা লাভের পর আর কথনও ইউরোপীয় জবরদখলে পড়েনি। অধিকন্তু অক্ষশক্তির বিনাশে এবং ১৯৪৫ সালে সাধারণভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মিশরে বৃটিশ ঘাঁটি রাখার একমাত্র যৌক্তিকতাও অপসারিত। ১৯৩৬ সালের চুক্তি নিজে থেকেই দশ বছর পর যে কোন পক্ষের অনুরোধে সংশোধন করার বিধান দেয়, মিশর এক্ষণে সেই পর্য্যালোচনার অনুরোধ করে বসে।

মিশর সমস্যার মুলে সবসময়ই দুটো বিষয়---সুয়েজ খাল এবং সুদান। চুক্তিসম্পাদন এবং যুদ্ধ শেষের মাঝখানে পেরিয়ে যাওয়া দশ বছরে সুদানের রাজনীতি সচেতনতায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রায় ৪০ বছর ধরে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ব্যাবসায়ী, আমলা,এবং পেশাগত শ্রেণী সহ এক বিপুল বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠীর জন্ম

দেয়। এই বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠী এবং দেশের দুই প্রধান ধর্মীয় গোত্র (সৈয়দ আব্দুল রহমান আল মাহদী এবং অপরটা সৈয়দ আলী আল মিরগণির)র পেছনে দেশব্যাপী গোত্র সমুহের সমর্থন সুদানের ভবিষ্যতের প্রশ্নে তিক্ত বিভক্তিতে বিভক্ত। একদল বিশ্বাস করে বৃটেন থেকে মুক্তি এবং মিশরের সাথে সংযুক্ত স্বাধীনতায়, অপরদল চায় মিশর,বৃটেনের মতই পুর্ণ স্বাধীনতা।

বৃটিশরা দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে পছন্দ করে কারণ তাদের মধ্যে এমন সব পদস্থ আমলারা আছেন যাদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক বিদ্যমান এবং তাদের স্বাধীনতার দাবীও পর্য্যায়ক্রমে বৃটিশ সহায়তায় ,সর্বোপরি তারা মিশরীয় দাবীর বিরোধীতাকারী (১৯২৪ সালের ঘটনার পর সুদান সরকারে বৃটিশ সদস্যদের কাছে মিশরীয়রা তখন অপাংক্তেয়) ,তাদের স্বাধীনতার দাবীও অন্ততঃ কমনওয়েলথ সদস্যপদের মাধ্যমে হলেও বৃটেনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পক্ষান্তরে মিশরীয়দের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, সুদানের স্বাধীনতা আন্দোলন বৃটিশ বাড়াবাড়ি মাত্র, এতে প্রকৃত সুদানীদের কোন আগ্রহ নেই। তাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। বৃটিশরা সুদানের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করলেও সেটা তাদের আবিস্কার কিংবা হাতিয়ার নয় বরং এর বাস্তবতা সুদানের দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও গোত্র বিভেদের মধ্যেই প্রোথিত।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই বৃটেন এবং মিশরের মধ্যে আলোচনার ফলে বেভিন-সিদকি (বরাবরের মত ফারুখ আবারও ওয়াফাদকে বহিস্কার করে সিদকি পাশার সংখ্যালঘু সরকার কায়েম করায়) প্রটোকল ১৯৪৬ স্বাক্ষরিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে নুতন আন্তর্জাতিক সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ার ভয় মাথায় রেখে পারস্পরিক সহযোগীতার সন্তোষজনক বিধি ব্যবস্থার শর্তে বৃটেন পুরোপুরিভাবে মিশর পরিত্যাগের প্রস্তাব দেয়। সুদানের ক্ষেত্রেও বৃটেন এমন এক ব্যবস্থায় সম্মত হয় যাতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে সুদান মিশররাজের কতৃত্বাধীন থাকে তবে শর্ত এই যে, যথেষ্ট পরিপক্কতা অর্জন করলে সুদানীরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এবং এই মধ্যবর্তি সময়ের প্রশাসন সুদানীদের স্বায়ত্ত শাসনের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে যাবে।

মিশরের সাথে সংযুক্তির প্রতিবাদে সুদানে বৃটিশ কর্মকর্তাদের সমর্থনপুষ্ট স্বাধীনতা মোর্চা প্রচন্ড প্রতিবাদ,বিক্ষোভ দেখায়। লন্ডনে প্রটোকল স্বাক্ষর শেষে ফিরে এসে সিদকি পাশা জাতীয়তাবাদী উত্তেজনায় এর এমন এক ব্যাখ্যা দেন যাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সুদানীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারই অস্বীকৃত হয়। এই পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকার প্রটোকল বাতিল করে। সিদকিও পদত্যাগ করেন; পরের বছর তাঁর স্থলাভিষিক্ত নুকরাশি পাশা নিরাপত্তা পরিষদে মিশরের আর্জি পেশ করেন। এতে কোন ফল হয়না। বৃটেন ১৯৩৬ এর চুক্তি আঁকড়ে ধরে; এবং এই চুক্তি 'যুদ্ধপরবর্তী মিশরের মর্য্যাদা ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেনি' যুক্তিতে নিরাপত্তা পরিষদ তা বাতিল ঘোষনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সবমিলিয়ে ঘটনা এই যে, বিবদমান পক্ষের মধ্যে সরাসরি আলোচনা আহ্বান প্রস্তাব দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন এক ভোটের অভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

বৃটেনের অবস্থান হচ্ছে ১৯৩৬এর চুক্তির বদলে নুতন চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলে মিশরের সাথে তার সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হবেনা। অথচ ১৯৩৬ এর চুক্তিতেও কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, এবং সুয়েজখাল এলাকা থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারনের বিধান আছে; এবং দেরীতে হলেও ইতোমধ্যে সে কার্য্যক্রম শুরু হয়, চুক্তিমত সুয়েজখাল এলাকায় সৈন্যসংখ্যা ১০,০০০এর বেশী থাকলেও স্বীকৃত এলাকা ছাড়া মিশরের আর কোথাও বৃটিশ সৈন্য অবশিষ্ট থাকেনি । শেষাবধি মিশর সরকার ১৯৫১ সালের অক্টোবরে একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করলে উত্তেজনা, আন্দোলন, সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী সংঘটিত হয় 'ব্ল্যাক স্যাটারডে'র মত ভয়ংকর ঘটনা।
সুদানে ১৯৪৮ সালে সমান সংখ্যক বৃটিশ ও সুদানী সদস্য নিয়ে আইনসভা ও কার্য্যকরী পরিষদ গঠনে বৃটিশ পদক্ষেপে চুড়ান্ত পর্য্যায়ে সুদানকে এক সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়া হলে মিশর এবং সুদানের মিশরপন্থী পার্টি তা বয়কট করে।

সুদান প্রশ্নে মিশরের সাথে এই অচলাবস্থা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সে বছর সুদান সরকার দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, পুরোপুরি সুদানী মন্ত্রীসভার মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্টার সংবিধান জারী করে। এই সরকারের মেয়াদ থাকবে তিন বছর , এবং এর পর সুদানীরা মিশর, বৃটেন ইত্যাদির সাথে তাদের ভবিষ্যত সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। এই তিন বছর বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কাজ চালাবেন। তবে সংবিধান তাঁকে পররাষ্ট্র,অমুসলিম এবং অনারব অধ্যুষিত দক্ষিণ সুদান এবং আমলাদের পদমর্য্যাদার বিষয়ছাড়া বাকী সবক্ষেত্রেই সুদানী মন্ত্রীদের পরামর্শে কাজ করার বিধান দেয়। আবারও, মিশর এই সংবিধান ঘোষনায় অংশ নিতে অস্বীকার করে এই যুক্তিতে যে এটা মিশর থেকে সুদানকে সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন করার আরেক ধাপ মাত্র। সে বছর সম্ভাব্য সুদানীজ সংসদ নির্বাচনে সুদানের মিশর পন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহন তখনও অনিশ্চিত; ঘটে যায় সম্পুর্ন অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা। জেনারেল নজীবের নেতৃত্বে এক সামরিক জান্তা ফারুখকে বহিষ্কার করে মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয়।

বিপ্লবের ফলাফল খুব দ্রুত সুদানেও অনুভূত হয়। ইতোপূর্বে জেনারেল নজীব দীর্ঘদিন সুদানে বসবাস করেন, এবং সুদানীজ স্বাধীনতা মোর্চার অনেক নেতার কাছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত (পছন্দেরও)। তাঁর কাজকর্ম এবং সংস্কারের প্রতিশ্রুতিসমুহ সুদানের সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়ায় যা ফারুখের মিশরের কাছে আশাতীত। যিনি সবসময়ই 'মিশর ও সুদানের রাজা' হওয়ার আশা করতেন স্রেফ সেই ফারুখের অপসারনই যেন সমঝোতা সম্ভাবনার নুতন দ্বার খুলে দেয়। জেনারেল নজীব এবং তাঁর সহকর্মীরা সম্ভাবনার সুযোগ নিতে একটুও বিলম্ব করেননি। তাঁরা কুটনীতির এক দক্ষ চালে সুদানের উপর বর্ষপুরোন মিশরীয় সার্বভৌমত্বের দাবী নাখচ করে দেন,এবং এতেও সম্মত হনযে, সুদানীরা আপাততঃ বৃটিশদের তৈরী স্বরাজ ভোগ করবে পরে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রয়োগের দিকে এগোবে। এই বিশাল ছাড় দেয়ার বিনিময়ে তাঁরা দাবী করেন , আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার না আসা পর্য্যন্ত সুদান থেকে সমস্ত বৃটিশ (এবং মিশরীয়ও) সেনা, পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা সরিয়ে নিতে হবে যাতে সুদানীদের মতামত অবাধ ও সত্যিকার হয়।

মিশরের প্রভুত্বের দাবী প্রত্যাহারে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে সুদানের স্বাধীনতাকামী দল এই শর্ত মেনে নেয় এবং ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে যথাযথভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী ফলাফলে মিশরের সাথে ইউনিয়নপন্থী দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জেতে। এর প্রধান কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে তখন বৃটিশ কিংবা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উত্তেজনা তুঙ্গে অথচ স্বাধীনতামোর্চা বৃটিশদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে বৃটিশ সহায়তায় স্বাধীনতা চেয়েছে। তদুপরি তাদের পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ আব্দুল রহমান আল মাহদী সুদানের রাজা হওয়ার আশা করতেন; তাঁর মাধ্যমে এমন এক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ভয় ছিল যেমন একটাকে মিশরীয়রা উৎখাত করেছে।

অবশেষে সুদান প্রশ্ন পথ ছেড়ে দিলে বৃটেন এবং মিশর সুয়েজ ঘাঁটি নিয়ে মনোনিবেশ করে। দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মে উভয়পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছে যে, পরবর্তী কুড়ি মাসের মধ্যে বৃটিশ যুদ্ধসেনারা সুয়েজ খাল এলাকা ছেড়ে যাবে, শান্তিপূর্ণ সময়ে ঘাঁটি রক্ষণাবেক্ষনে চার হাজার প্রকৌশলী নিয়োজিত থাকবে এবং এ সময়ে মিশরীয় সেনাবাহিনী ঘাঁটিতে অবস্থান করবে । মিশরের পক্ষে আরও সম্মতি দেয়া হয় কোন আরব দেশ কিংবা তুর্কির উপর আক্রমণ হলে এই ঘাঁটিতে বৃটেন পুনঃরায় সৈন্য রাখতে পারবে। এভাবে মিশরে সত্তুর বছর ব্যাপী বৃটিশ সেনাদখলদারীর অবসান ঘটে।

(৫)

আরবলীগের কথা এলেই এর গঠন, চরিত্র,এবং আরবদের জন্যে প্যালেস্টাইন রক্ষায় এর ব্যর্থতার কথাও উঠে আসে। কোন না কোন ভাবে আরব একতার ধারণা উনবিংশ শতকের গোড়ার দিনগুলো থেকেই আরব

পুনরুত্থানেরই একটা অংশ। সাধারণের কাছে তা 'আরব জাগরন ' কিংবা 'আরব আন্দোলন' হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছে। তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আবিষ্কারের পর একদিন যেখানে যেখানে তা বিকশিত হয়েছে তার অন্ততঃ বৈশ্বিক রাজনৈতিক কাঠামোয় তা পুনঃস্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। আরব জনগনের এ নুতোন সংঘবদ্ধতার স্বপ্ন (এমনকি মধ্যযুগের আরব সভ্যতার স্বর্ণযুগেও আরব বিশ্বজুড়ে ঐক্য বেশী দিন টেকেনি) মিশর কিংবা পশ্চিমের (মাগরেব) আরব দেশসমূহকে নিয়ে নয় বরং আরব এশিয়ার দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ। এর অনেক কারণের মধ্যে যেমন উল্লেখ করা যায় আরব জাতীয়তাবাদের উত্থানের অনেক আগেই মিশর আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের রূপ পেয়েছে এবং তা যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে মিশরীয় জাতীয়তাবাদের ধারায় বিকশিত হয়েছে। আরব পুনর্জাগরনের প্রাথমিক দিনগুলোতে পূর্ব ও পশ্চিমের আরবদেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল ধীর এবং কষ্টসাধ্য তদুপরি দীর্ঘকালব্যাপী তাদের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগও ছিলনা ।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর সময়েও মিশর এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় আরব দেশসমূহ বৃটেন ও তার মিত্র ফ্রান্স কিংবা ইতালীর শাসনাধীনে থাকার সময় আরব আন্দোলনের সবচেয়ে দুঃসাহসী নেতাও, এমনকি দুঃস্বপ্নেও পশ্চিমাদের বিতাড়নের কথা ভাবতে পারেননি। কিন্তু আরব এশিয়ার দেশগুলোর কথা আলাদা। এসব দেশ তখনও অটোমন প্রদেশ মাত্র; স্বাধীন হওয়া এবং আরব রাষ্ট্র গঠন করা তাদের জন্যে সহজতর, শুধু অটোমন শাসন ঝেড়ে ফেললেই চলে। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই তুর্কি থেকে স্বাধীনতার জন্যে তারা বৃটেন এবং তার মিত্রদের চ্যালেঞ্জ করার (স্বাধীনতার জন্যে যা মিশর,লিবিয়া, তিউনিসিয়া,আলজেরিয়া, মরক্কোর আবশ্যক ছিল) বদলে বরং ওদের সাহায্য তালিকায় স্থান করে নেয়া সহজ ছিল।

সর্বোপরি আরব এশিয়া ভৌগলিক ভাবে এমন এক সংহত এলাকা যা অটোমন শাসনে একক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বিধি বিধানের আওতায় , এবং উমাইয়া-আব্বাসীয় দিনগুলোতে আরব সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। ফলে আরব জাতীয়তাবাদীরা যখন বাদশা হোসাইনের নেতৃত্বে বৃটেনের সাথে আরব বিদ্রোহ নিয়ে দরকষাকষি করছিলেন , বাস্তবিকই তাদের দাবী ছিল আরব উপদ্বীপ,ভৌগলিক সিরিয়া (সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্দান এবং লেবানন) সহ একক এক আরব রাষ্ট্র; এবং বৃটেন কিছু নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে এ'দাবী মেনেও নিয়েছে। এমন যুক্তিও দেখানো যায়, এমনকি এ অঞ্চলেও বৃটিশ-ফরাসী স্বার্থের দ্বন্ধ প্যালেস্টাইনে ইহুদীবাদের প্রতি তাদের সমর্থন থাকা না থাকা নির্বিশেষেও ১৯১৮ সাল নাগাদ আরব ঐক্য অর্জনযোগ্য ছিলনা। উদাহরণ হিসেবে বাদশা হোসেইন এবং ইবনে সউদের দ্বন্ধ যার ফলে হোসেইন হেযায থেকে বহিস্কৃত হন এবং ইরাক, জর্দানে হাশেমীয়দের সাথে উপদ্বীপের অন্যান্য শাসকদের মধ্যে চিরস্থায়ী টানাপড়েনের কথা উল্লেখ করা যায়। হোসেইন এবং ইবনে সউদের দ্বন্ধ ছাড়াও দামেস্ক, বাগদাদ, জেরুযালেম, মদীনাকে একত্রিত করে রাখার মত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা,সার্বিধানিক সংসক্তি ১৯১৮ সালের আরবদের ছিলনা। সে যাহোক, বৃটিশ এবং ফরাসী স্বার্থের এলাকা, ম্যান্ডেট এলাকা ইত্যাকার ভাগাভাগি, প্যালেস্টাইনে ইহুদী জাতীয় আবাসন প্রতিষ্ঠা আরব আন্দোলনের অনুপ্রেরনা- ঐক্যের স্বপ্নে মারাত্মক আঘাত হেনেছে। আরব এশিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত; তাদের কতক জনসংখ্যা এবং আয়তন বিচারে যেমন অতি ক্ষুদ্র তেমনি স্বেচ্ছাচারী এবং অবাস্তব চরিত্রের। এই বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা বিশেষকরে ভৌগলিক সিরিয়ায় আরব ঐক্যের জন্যে ক্ষতিকর যেখানে ইতোমধ্যেই সম্ভাব্য আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় সংসক্তি প্রবন উপাদান গড়ে উঠেছে। এখানে সিরিয়ান ইউনিটির আওতায় এক ধরনের লেবানীজ স্বায়ত্বশাসনের বাড়া বিভেদের সঙ্গাত কোন কারন ছিলনা। দেশটার চার চারটি রাষ্ট্রে (সিরিয়া , লেবানন, প্যালেস্টাইন, জর্দান) বিভক্ত হওয়া পুরোপুরিই বৃটেন,ফ্রান্স, ইহুদীবাদীদের স্বার্থের ফসল,এবং তা কোনভাবেই আরব অবস্থানের বাস্তবতা কিংবা আরবদের ইচ্ছার সাথে সঙ্গাতিপুর্ন নয়।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তি সময় দু'টি প্রক্রিয়া পাশাপাশি সংঘটিত হবার স্বাক্ষী। একদিকে বিভিন্ন আরবদেশে (যেমন রাজনৈতিক অবস্থান ও জাতীয় পরিচয়, আশা-আকাঙ্খার সাদৃশ্যের কারনে মিশর তখন ক্রমান্বয়ে

সিরিয়া এবং ইরাকের কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে) স্বাধীনতার লড়াই এবং প্যালেস্টাইনের ভাগ্য নিয়ে আরবদেশ সমুহের ভাবনার বিষয় যা নিখিল আরব অনুভূতির প্রেরনা জোরদার করেছে। প্রকাশনা,রেডিও,সিনেমা এবং বিমান ভ্রমনের সুবিধা এই অনুভবকে আরো গতিশীল করেছে। অন্যদিকে ১৯১৯ সালে বৃটেন, ফ্রান্স কর্তৃক পাইকারীহারে আরোপিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ, যা তখনও বহুলাংশে কৃত্রিম, সময়ের ব্যবধানে তা ক্রমবর্ধমান বাস্তব হয়ে উঠেছে।

প্রতিটি রাষ্ট্রে বংশ,ব্যবসায়িক স্বার্থ, রাজনৈতিক দল , সেনাবাহিনী নিজেদের মধ্যে এমনভাবে সংহত হচ্ছিল যা অবাধে চলতে থাকলে ভবিষ্যত জাতীয় সমন্বয়,সংহতিকেই বিপন্ন করতো। এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ দুরদৃষ্টি সম্পন্ন আরব নেতারা তা নিরোধের চেষ্টা করেন। এঁদের অন্যতম ইরাকের রাজা প্রথম ফয়সল,এবং নেতৃস্থানীয় ইরাকী ও আরব রাষ্ট্র নায়ক নুরী পাশা আল সাঈদ আরব আন্দোলনকে কখনও অখন্ড ভিন্ন ভাবতে পারেননি এবং বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে সহযোগীতার পরিকল্পনা করতে থাকেন। ফয়সলের ভাই জর্দানের রাজা আবদুল্লাহ্‌র বৃহত্তর সিরিয়া অর্থাৎ সিরিয়া, ট্রান্সজর্দান, প্যালেস্টাইন (অথবা তার অংশ বিশেষ) কে নিজের আয়ত্বে আনার নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। দামেস্কের রাজনীতিবিদগন কিংবা ইবনে সউদ কেউই এ'পরিকল্পনা পছন্দ করেননি। প্রথমোক্তদের চরম অপছন্দ আবদুল্লাহ্‌র স্বেচ্ছাচারী শাসন পদ্ধতি এবং বৃটিশদের প্রতি হীন বশ্যতা; আর দ্বিতীয় জনের কাছে হাশেমীয় পরিবারের সমৃদ্ধি হয় এমন কিছু মাত্রই সমর্থনের অযোগ্য।

১৯৪১সালের বসন্তে যুদ্ধকালীন বৃটিশ জাতীয় সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক ঘোষনায় বলেন," গত যুদ্ধের শেষে অর্জিত নিষ্পত্তির পর থেকে আরববিশ্ব দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে এবং অনেক আরব চিন্তাবিদ আরব জনগনের মধ্যে এখনকার চেয়ে অধিকতর মাত্রায় সংহতি কামনা করেন-----আমার নিজেরও মনে হয় আরবদেশগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধন এবং রাজনৈতিক বন্ধনও আরও দৃঢ় হওয়া স্বাভাবিক এবং যথার্থ। সাধারণ সম্মতির দাবীদার এরকম যে কোন পরিকল্পনায় হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্ণমেন্ট তাদের পক্ষে পুর্ণ সমর্থন দেবে"।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে আরব আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করার যে সেমস্ত যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ আরব নেতারা ক্রমাগত বৃটেনের বিরুদ্ধে করে এসেছে তার তিক্ততা লাঘবের মাধ্যমে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আরব জনগনের সমর্থন লাভের আশা থেকেই বৃটেনের এই পদক্ষেপ। দ্বিতীয়তঃ বৃটেন আশা করেছে আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে কনফেডারেশন যুদ্ধশেষে মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা আনতে সহায়ক হবে। শেষতঃ কখনও কখনও এমন ধারণাও সামনে এসেছে যে, প্যালেস্টাইন বৃহত্তর আরব ইউনিটির অংশ হলে ক্রমান্বয়ে ইহুদীবাদের প্রতি আরবদের ভয়ও কমে যাবে এবং এর ফল প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। আরবদেশসমূহে বৃটেন, ফ্রান্সের স্বার্থের অঞ্চল হিসেবে বিভাজন, বিশেষতঃ ফরাসী ম্যান্ডেট নিয়ন্ত্রণের বাইরে সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতার মধ্যদিয়ে আরব ঐক্যের পথে অন্যতম অন্তরায় দুর হয়ে যায়। প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্দানে তখনও বৃটিশ ম্যান্ডেট বজায় থাকলেও ইরাক,মিশর, সৌদী আরব , ইয়েমেন প্রত্যেকেই স্বাধীন দেশ এবং তাদের উপর কোন বিদেশী প্রভাব থাকলেও তা একান্তই বৃটিশ এবং আরব ইউনিটিতে প্রতিবন্ধকতার চেয়ে তা বরং সহায়কই হতে পারতো।

ইডেনের উৎসাহের পক্ষে প্রথম সাড়া আসে নুরী পাশা আল সাইদের কাছ থেকে, যিনি ১৯৪২ সালে দুই মাত্রায় আরব ইউনিটির প্রস্তাব এনেছেন। প্রথমতঃ তিনি সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্দানকে নিয়ে এমন একটি (একক কিংবা ফেডারেল যা-ই সম্ভব হয়) রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন যেখানে লেবাননের খ্রীশ্চান এবং প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের জন্যে বিশেষ স্বায়ত্বশাসন থাকবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি নুতন রাষ্ট্রের সাথে ইরাককে নিয়ে এমন এক আরবলীগের প্রস্তাব করেন যেখানে যখন খুশী যে কোন আরব রাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার থাকবে, গ্রহনযোগ্য নির্বাচনের ভিত্তিতে সদস্যদের নির্বাচিত সভাপতির নেতৃত্বে এই লীগের একটা কাউন্সিল

থাকবে। এই কাউন্সিলের এখতিয়ারে থাকবে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রাব্যবস্থা, যোগাযোগ,শুল্ক এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ।

কালপ্রবাহে ১৯৪৩ সাল নাগাদ এই উদ্যোগ চলে যায় নুরী থেকে নাহাশ পাশা, ইরাক থেকে মিশরে। এই সময়েই মিশর সুনির্দিষ্টভাবে আরব আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়; বছর বছর ধরে সমান্ত রালে চলে আসা আরব জাতীয়তাবাদ এবং মিশরীয় জাতীয়তাবাদ এক স্রোতে মিশে যায়। এই সম্মিলন মিশর এবং আরব এশিয়ার দেশসমূহের পারস্পরিক আশার বাস্তবায়ন। এতে মিশর দেখেছে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আরব দেশসমূহকে নেতৃত্ব দেবার সম্মান,আর অন্যান্য আরবদেশসমূহ চেয়েছে মিশরের আয়তন,সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক মর্য্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে তার নেতৃত্ব মেনে নেয়ার সুবিধা।

লীগের নেতৃত্ব বদলের সাথে সাথে তার প্রস্তাবিত কর্মপরিরিধিতেও পরিবর্তন আসে। কায়রো আলোচনায় দেখা যায় নুরীর স্বপ্নের দৃঢ় বন্ধন আর কেন্দ্রাভিমুখী আরবলীগ মিশর , সৌদী আরব, ইয়েমেন, ইরাক এবং ভৌগলিক সিরিয়ার দেশ সমূহকে নিয়ে সম্ভব নয়। একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বংশ,স্থানীয় জাতীয় পলিসি ,সমাজ কাঠামো এবং রাজনৈতিক পরিপক্কতার মান বিচারে সাত সাতটি প্রার্থী দেশের নানারকমের ভিন্নতা তাদের মধ্যে ঘনিষ্ট ইউনিয়ন গঠনে বিরাট অন্তরায়।

বিকল্প হচ্ছে কারুর সার্বভৌম অধিকার ক্ষুন্ন না করে কোন রকমে ঢিলেঢালা কনফেডারেশনে ধরে রাখা। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত আরবলীগ তেমনি এক ঢিলেঢালা কনফেডারেশন। এর সাত সদস্যরাষ্ট্র "আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেকার অসংখ্য যোগাযোগ এবং নিবিড় সম্পর্ক নিশ্চিত করা, এবং রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে এই বন্ধন অব্যাহত ও দৃঢ় করা,এবং আরবরাষ্ট্রসমূহের সাধারণ সুখ-সুবিধার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, পরিস্থিতির উন্নতি, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা,তাদের আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে এবং বিশ্বব্যাপী আরব জনমতের দাবীতে সাড়া দিয়ে এ'সব উদ্দেশ্য সাধনে" এই চুক্তিতে অংশগ্রহন করছে। লীগের উদ্দেশ্য আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে 'সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করা, তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম এমনভাবে সমন্বয় করা যাতে তাদের মধ্যে প্রকৃত সহযোগীতা সম্ভব হয়, তাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং সাধারণভাবে আরব দেশসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনা করা।' একইভাবে সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে আর্থিক এবং অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক, জাতীয়তা,পাসপোর্ট-ভিসা, সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগীতাও লীগের কাছে সমান প্রত্যাশার। এসব বিষয়ই হবে লীগ কাউন্সিলের মুল উদ্দেশ্য। কাউন্সিলে প্রতিনিধি সংখ্যা যাই হোক সদস্যরাষ্ট্রপ্রতি ভোট থাকবে একটি।

লীগ গঠনতন্ত্রের চারটি লক্ষণযোগ্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রথমতঃ সেই বিধান যাতে প্রতিটি স্বাধীন আরবদেশের লীগভূক্ত হওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই বিধান ভবিষ্যতে নুতন সদস্য অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে (লক্ষ্য ছিল প্যালেস্টাইন, এবং ফ্রান্স নিয়ন্ত্রিত উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ) লীগকে সম্প্রসারনযোগ্য একটি সংগঠনে পরিণত করেছে। দ্বিতীয়ত, প্যালেস্টাইন সম্পর্কে সেই বিশেষ ধারা যাতে বলা হয় যে, লীগ কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করার মত নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাউন্সিল নিজে প্যালেস্টাইন থেকে একজন আরবকে কার্য্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্যে মনোনীত করবে (এর মধ্য দিয়ে আরব দেশ হিসেবে প্যালেস্টাইনের অস্তিত্ব এবং তার সম্ভাব্য জাতীয় স্বাধীনতার কথা স্বীকৃত হয়)। তৃতীয়তঃ লীগের সদস্য নয় এমনসব আরবদেশ (যেমন তিউনিসিয়া, মরক্কো ফরাসী শাসনাধীন হওয়ায় যাদের সদস্যপদ দেয়া হয়নি)কে বিভিন্ন কমিটিতে অন্ত র্ভূক্ত করার মধ্য দিয়ে কাউন্সিলের কার্যাক্রমে অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হয়। চতুর্থ সেই ধারা- "যে সমস্ত আরব রাষ্ট্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত মাত্রারও বেশী পারস্পরিক ঘনিষ্ট সহযোগীতায় আগ্রহী হয়ে তা বাস্তবায়নে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চায়" তাদের জন্যে। মুলতঃ এই সংযোজনে নুরী পাশার স্বপ্নের ভবিষ্যত বাস্তবায়ন তথা ভৌগলিক সিরিয়ার একক রাষ্ট্র কিংবা সেরকম কিছু একটাতে উত্তরনের পথ খোলা রাখে।

লীগের প্রথম উদ্দেশ্য এবং তা থেকে অর্জিত সাফল্য আরব ঐক্যের দৃশ্যমান প্রতীকের জন্ম যা অনেক আরবের মানসিক সন্তুষ্টি বিধান করলেও বাস্তবে এর দুর্বলতাও অনেক; যেমন এর কিছু সদস্য স্বাধীন হলেও এতটা পশ্চাদপর যে রাজনৈতিক, সামরিক শক্তি হিসেবে যাদের গোনাও যায়না। সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা হয়তো সমান তালে এগোতে পারেনি, তবুও লীগের মধ্যে তাদেও একত্রিত হওয়া,বাস্তবে এবং ততোধিক গুরুত্বে, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝায়। আবেগী সন্তুষ্টি এবং প্রতীকি মুল্যের বাইরে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আরব রাষ্ট্র সমুহের লীগের মাধ্যমে সম্মিলিত উদ্যোগে উদ্ধার করার মত দু'টি সুনির্দিষ্ট, জরুরী আরব স্বার্থ অপেক্ষমান থাকে। প্রথমত: সিরিয়া, লেবানন থেকে সর্বপ্রকার ফরাসী নিয়ন্ত্রণের অবসান; দ্বিতীয়ত: অব্যাহত ইহুদী দখলদারীত্ব থেকে প্যালেস্টাইনকে রক্ষা এবং সেখানে স্থানীয় আরব জনগনের সংখ্যাগরিষ্টতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

আরবলীগের পাঁচ সদস্যরাষ্ট্র মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক এবং সৌদী আরব জাতিসংঘের সদস্য। রাজা আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে জর্দানের (নুতন নাম জর্দানের হাশেমীয় রাজ্য) স্বাধীনতা স্বীকৃত,ম্যান্ডেটও অপসৃত,এবং বৃটেন তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করলেও ট্রান্সজর্দানের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির আবেদন বারংবার রুশ ভেটোর মুখে পড়েছে এই যুক্তিতে যে তা তখনও স্বাধীন দেশ হিসেবে বিবেচনা না করার পক্ষে যথেষ্ট বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন (যেহেতু জর্দান বৃটেন কতৃক প্রশিক্ষন এবং বৃটিশ সেনা অফিসারদের কমান্ডে সেনাবাহিনীর ভরন-পোষনের জন্যে বৃটেনের ভর্তুকি নিয়ে আসছে)। ইয়েমেনের ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক সংগঠনে প্রতিনিধিত্ব করার মত কুটনীতিকের অভাব, এবং দেশটাও বহির্বিশ্ব থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন যে সেরকম আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্ব আশাও করা যায়না।

সে যা হোক, জাতিসংঘের পাঁচ সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে আঞ্চলিক ব্লক হিসেবে আরবলীগের আবির্ভাব এবং কুটনৈতিক গুরুত্ব হেলায় উড়িয়ে দেবার মত নয়। শুরুতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামোয় একটি আরব রাষ্ট্রও স্থান পায়নি। এক্ষনে জাতীসংঘের প্রতিষ্টাতা সদস্য হিসেবে পাঁচটি আরবরাষ্ট্রের উপস্থিতি আরব দেশসমুহের অগ্রগতি এবং প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাবধি ২৭ বছর সময়কালে আরবদেশসমুহের আন্তর্জাতিক মর্য্যাদায় উত্তোরনের মাপকাঠি। অধিকন্তু পাঁচ সদস্যরাষ্ট্রের মধ্য থেকে মিশর লেভান্ট দেশসমুহের সাথে ফ্রান্সের বিরোধের শুনানী চলাকালীন নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম সেশনে অস্থায়ী আসন লাভ করে। ওই ইস্যুতে আরবলীগের মাধ্যমে প্রকাশিত আরব সংহতি সিরিয়া, লেবাননের আশা আকাঙ্খার অনুকুল ফলাফল নির্ধারণে সিদ্ধান্তকারী না হলেও সাহায্যকারী হয়েছে। প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে বিষয়টা সম্পুর্ণ আলাদা।

যুদ্ধকালীন সময়ে প্যালেস্টাইনে ইহুদী হুমকি বাড়ানোর মত অনেক ঘটনাই ঘটেছে। প্রথমতঃ আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান এবং সে যে যুদ্ধোত্তর ইঙ্গ-মার্কিন অংশীদারীত্বের সিনিয়র পার্টনার হতে যাচ্ছে এই বাস্তবতার ইঙ্গিত পরিস্কার করে দিয়েছিল যে, বৃটেন তার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্থ থাকলেও ১৯৩৯ এর শ্বেতপত্রের পলিসি বাস্তবায়নে সক্ষম হচ্ছেনা। ইহুদীবাদীরা বৃটেনে শক্তিশালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা আরও শক্তিশালী। নিউইয়র্ক, ইলিনয়ে তাদের ব্লক ভোট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম। অতএব, তাদের লবী সেখানে দুই পার্টির কংগ্রেসম্যন এবং রাজ্য গভর্ণরদের চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইলও করতে পারতো। এই চাপ ছিল ভয়ংকর, বিশেষতঃ বেসরকারী মালিকানায় হলেও আমেরিকার প্রবল প্রচারনার কৌশল এমন এক স্বেচ্ছাচারী পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যাতে কোন রকম আরব পক্ষের অনুপস্থিতিতে ইহুদীবাদীদের একতরফা প্রচার 'প্রপাগান্ডা' চালানো যেতো। এসবের সাথে বাস্তবতা - বৃটেন পঁচিশ বছরের তিক্ত এবং শাস্তিমুলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইন প্রশ্নের বাস্তবতা সম্পর্কে কিছু শিখতে আরম্ভ করলেও স্টেট ডিপার্টমেন্টের গুটিকতেক বিশেষজ্ঞ ছাড়া এদের ব্যাপারে আমেরিকা পুরোপুরিই অজ্ঞ।

ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং আসন্ন সুযোগের প্রতি সচেতন ইহুদীরা সিদ্ধান্ত নেয় যে পুরোনো দিনের মুখোশ ফেলে তাদের সত্যিকারের উদ্দেশ্য ঘোষনা করার সময় এসছে। তাদের প্রকাশ্য সংগঠন --প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা,ইহুদী সেনাবাহিনী গঠন, এবং দেশে সীমাহীন ইহুদী অনুপ্রবেশের দ্বার খুলে দেয়ার দাবী সম্বলিত বিল্টমোর কর্মসূচী (১৯৪২ সালে নিউইয়র্কে প্রণীত) গ্রহন করে। খোদ প্যালেস্টাইনে ইহুদীরা গোপনে এবং প্রকাশ্যে , সুযোগ আসা মাত্রই জোরপুর্বক দেশ দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা প্রকাশ্যেই চাপ প্রয়োগ করেছে এবং নিজস্ব ইউনিফর্মে বৃটিশ সেনাদলে সংযুক্ত ইহুদী ব্রিগেড তৈরীতে সফলও হয়েছে ১৯৪৪ সালে। এভাবে হাজার হাজার ইহুদী সামরিক প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। একই সময়ে ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে নিজস্ব স্থানীয় প্রতিরক্ষা সংগঠন (হাগানা) এবং তার গোপন সন্ত্রাসী শাখা গড়ে তোলে । তারা এ সমস্ত সংগঠনের জন্যে অস্ত্র ও গোলাবারূদ সংগ্রহ এবং মজুদ গড়ার লক্ষ্যে যুদ্ধের সময় প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। বৃটিশ সেনা ডিপো ডাকাতি হয়েছে, অফিসার-সৈনিকদের ঘুষ দেয়া হয়েছে অথবা সামরিক সরঞ্জাম বিক্রিতে প্ররোচনা দেয়া হয়েছে।

এই সময়ব্যাপী প্যালেস্টাইনের আরবরা আসন্ন যুদ্ধে নিজেদের প্রস্তুতির জন্যে কিছুই করেনি। ১৯৩৬-৩৯ সাল ব্যাপী বিদ্রোহে তারা সে সময় ক্লান্ত, তাদের নেতৃত্ব ছত্রভঙ্গ; তাদের অস্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, ব্যবহার করা দুরে থাক অস্ত্রসহ পাওয়া গেলেই তাদের হত্যা করা হয়েছে। মুফতি তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ সোনালী চতুর্ভূজ বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর বাগদাদ থেকে পালিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জার্মানীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বৃটেন আমেরিকার চোখে তিনি আরবদেশ সমূহে জার্মান প্রপাগান্ডা প্রচার করে আরবদের জন্যে ভাল কিছু করেননি। মুফতির বিষয়ে খোদ প্যালেস্টাইনী আরবরাও দ্বিধা বিভক্ত ছিল। বিদ্রোহের শেষ পর্য্যায়ে তিনি অনেক শত্রু তৈরী করেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপে মদদ দিতেন। তারপরেও তাঁর বিরুদ্ধাচারীরা আরবদের মধ্যে অনৈক্য তথা জায়নবাদীদের কাছে দুর্বলতা প্রকাশের ভয়ে প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধীতা করতেননা। এই নেতৃত্বহীন, হীনবল প্যালেস্টাইনী আরবরা আরবলীগের মধ্যে নুতন আশা খুঁজে পেয়েছে; বিক্ষিপ্ত অতএব আহত সে আশা।

লীগের দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ এবং তা কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখতে ভীত নন, এমন দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাব ছিলনা। কিন্তু তেমন বাস্তববাদী পর্য্যবেক্ষকরাও প্যালেস্টাইনের জন্যে সামরিক সংঘাত আঁচ করতে পারেননি; তাঁরা আশা করেছেন জাতীসংঘে আরবলীগের মাধ্যমে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করে বৃটেনকে জায়নবাদীদের ক্রমাগত ভয়ংকর দাবীসমুহ পুরন করা থেকে বিরত রাখতে পারবেন। 'সাত রাষ্ট্র এবং* ৪০ মিলিয়ন জনগন' প্যালেস্টাইন রক্ষায় সদা প্রস্তুত' আরব প্রচার মাধ্যমের এ ফাঁপানো প্রচারনায় বৃহত্তর পরিসরে জনগন শেষাবধি প্রতারিত হয়েছে।

যুদ্ধের অবসান আরবদের জন্যে দু'টো বিপর্য্যয় বয়ে আনে। প্রথমটি হচ্ছে ইউরোপ থেকে ১০০,০০০ ইহুদীকে অনতিবিলম্বে প্যালেস্টাইনে আসার অনুমতি দিতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতি ট্রুম্যানের উৎসাহ প্রদান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৃটেনে লেবার পার্টির ক্ষমতায় আসা। চার্চিল সহ বেশকিছু রক্ষণশীল নেতার সুবিদিত ইহুদী পক্ষপাত স্বত্বেও তাদের পুরোদল নীতিগতভাবে লেবার পার্টির মত ইহুদীবাদের প্রতি সমর্পিত ছিলনা। লেবার পার্টি যুদ্ধশেষ হওয়ার কয়েকমাস আগে তাদের কার্য্যকরী পরিষদে প্যালেস্টাইনে কোনরকম সংখ্যা নির্দেশবিহীন পাইকারী ইহুদী অভিবাসনের পক্ষে প্রস্তাব পাশ করে, আশ্চর্য্যরকম মধুর বাক্যবিন্যাসে (কঠোর বাস্তবে যার একটি অর্থই দাড়ায়, এবং তা হচ্ছে প্রায় পুরো স্থানীয় জনগনের উচ্ছেদ, যেমনটা সত্যি সত্যিই ঘটেছে) "ইহুদীদের প্রবেশের সাথে সাথে আরবদের বেরিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে হবে"! তথাপি ক্ষমতায় এসে লেবার পার্টি মত পাল্টায়, আর্ণেস্ট বেভিন যদি বেশী সাহায্য করতে সমর্থ নাও হন, সেই বেলফুর ঘোষনার দিন থেকে যে কোন বৃটিশ মন্ত্রীর চেয়ে আরবদের প্রতি কম অত্যাচারী প্রমাণিত হন(একমাত্র ১৯৩৯ এ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড সম্ভাব্য ব্যতিক্রম)।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের চাপের মুখে এবং বিশ্বে নিজের ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতার কারনে বৃটেন প্যালেস্টাইন বিষয়ে আরও একটি অনুসন্ধানে যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাক্ষ্য প্রমাণ শুনে সমাধান প্রস্তাবের জন্যে আরও একটি ঈঙ্গা-মার্কিন কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটিকে যে বাস্তবতা দেখতে বলা হয়েছে কার্য্যক্ষেত্রে সমাধান প্রস্তাবে তা-ই উপেক্ষিত হয় ফলত: তা অকার্য্যকর প্রমাণিত হয়। আরব- ইহুদীদের মধ্যে বিরোধ না মেটা পর্য্যন্ত ম্যান্ডেট অব্যাহত থাকা, অনুকূল পরিবেশে যত দ্রুত সম্ভব ১০০,০০০ ইহুদী অভিবাসী গ্রহন করার ট্রুম্যানের প্রস্তাব গ্রহন করা এবং শেষতঃ কমিটি পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতার দাঁতের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বেলফুর ঘোষনা থেকে আসা স্ববিরোধী মোলায়েম বাক্যবন্ধের পুনরাবৃত্তি (যা ম্যান্ডেটকালীন পুরোসময় ধরে অনুসৃত হয়েছে)কে প্রকাশ্যে বৃটেনের জায়নবাদী পলিসির ভিত্তি রচনা করে। এই কমিটি প্যালেস্টাইনে জনগনের অন্যান্য অংশের বসবাস এবং অধিকার খর্ব না হওয়ার নিশ্চয়তায় আরও ইহুদী অভিবাসনের প্রস্তাব করে।

২:১ আরব সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছেনা এটা আরবদের কাছে অসহ্য,তদুপরি বাইরে থেকে ক্রমাগত অধিকতর সংখ্যায় ইহুদী অভিবাসন চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। সামান্য গণিতেই তাদের গন্তব্য পরিস্কার- ২৫ বছর আগে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাত ছিল ৯:১, আর কমিটি আরব- ইহুদী বিরোধ দূর করতে উপদেশ দিয়েছে চলমান অভিবাসনের মাধ্যমে আরবদের মুলোৎপাটনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে উল্টে দিয়ে। আরবরা ১৯৩৯ সালে বৃটিশ শ্বেতপত্র ইস্যুর সাথে সাথেই প্রত্যাখ্যান করলেও এক্ষনে তার ভিত্তিতেই তাতে যে নিম্নতম অধিকারের নিশ্চয়তা ছিল তার জন্যে কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে আপীল করলো।

তাদের দাবী ম্যান্ডেট বাতিল, বৃটিশদের প্রত্যাহার, এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে অর্থাৎ সরকার গঠনে সংখ্যানুপাতে ইহুদীদের ভাগ দিয়ে একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। বৃটিশ সরকার ঘোষনা করে যে, কমিটির রিপোর্ট (যাতে ইহুদী সন্ত্রাসবাদের অবসানও সুপারিশ করা হয়) পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে; অধিকন্তু ১০০,০০০ নুতন ইহুদী আগমন অনুমোদনকে প্যালেস্টাইনে গোপন ইহুদী সংগঠনসমূহের অস্ত্র ত্যাগের সাথে শর্তযুক্ত করে। এই শর্তে প্যালেস্টাইনে জায়নবাদী নেতারা দুঃখিত হয় তবে রিপোর্টের যে অংশ ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে আরেক ধাপ হিসেবে নিজেদের অনুকূলে তা গ্রহন করে বাকীটা বাদ দেয়। ইতোমধ্যে ইউরোপ থেকে অধিক সংখ্যায় অবৈধ অভিবাসী (অনুমোদিত কোটারও অতিরিক্ত) আগমন অব্যাহত থাকে। এদের অধিকাংশই বিশ্ব জনমতের কাছে মানবিক কারন হিসেবে দেখানো বৃদ্ধ, অসুস্থ কিংবা শিশু নয় বরং স্বাস্থ্যবান যুবক-যুবতী , প্যালেস্টাইনে ইহুদী সেনাশক্তির ক্রমবর্ধমান সরবরাহ। সন্ত্রাস বেড়ে চলে , জেরুযালেমে কিং ডেভিড হোটেলের একাংশ উড়িয়ে দেয়ার মত ঘটনায় তা চরম সীমাতেও পৌঁছে। এটা সম্পুর্ন পরিস্কার হয়ে যায় যে, জায়নবাদীরা যখন আত্মরক্ষার জন্যে সেনা শক্তির কথা বলেছিল সেখানে সুরক্ষা বলতে তারা মুলতঃ তাদের সব জাতীয় দাবী বাস্তবায়নের কথাই বুঝিয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে অবাধ বসতি স্থাপন, প্যালেস্টাইনের যে কোন অঞ্চলে ভূমি মালিকানার স্বাধীনতা এবং পরিণতিতে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকারের কথা বুঝিয়েছে ।

আরব এবং ইহুদী প্রদেশ সমুহে মুলতঃ স্ব-শাসিত তবে ফেডারেল রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সমাধান প্রচেষ্টায় আরেক ইঙ্গা-মার্কিন উদ্যোগ , (এবার 'ফরেন অফিস' এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে) সমান নিস্ফল প্রমাণিত হয়। ইহুদীরা ঘোষনা দেয় যে, মোট প্যালেস্টাইনী ভূমির তাদের সংজ্ঞামতে সর্বোত্তম ৬৫ শতাংশ ভূমিতে তাদের জন্যে শুধুমাত্র একটি প্রকৃত রাষ্ট্রই তারা গ্রহন করবে। বাকী মধ্যাঞ্চল এবং মুলতঃ উপত্যাকাভূমি আরবদের জন্যে সর্বোত্তম উৎসর্গ হিসেবে তারা ছেড়ে দেবে।

এই ব্যর্থতার পর ,আরব সরকার সমুহ ১৯৪৬-৪৭সালের শীতে লন্ডনে আরও এক কনফারেন্সে প্রতিনিধি দল পাঠাতে বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহন করে। আরব প্রতিনিধিরা প্যালেস্টাইনে সব নাগরিকের সমান

অধিকার, ইহুদীদের জন্যে শিক্ষার স্বাধীনতা, সরকারীভাষা হিসেবে হিব্রু ব্যাবহারেরও স্বীকৃতি সম্বলিত এক স্বাধীন , গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাবীতে অনড় থাকার কথা পুনরুল্লেখ করে। তবে তারা অনতিবিলম্বে প্যালেস্টাইনে সবরকমের অভিবাসন বন্ধ করা, এবং প্যালেস্টাইনের বিশেষ কিছু অংশে ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রির বিরুদ্ধে বর্তমান আইনের বাস্তবায়নের উপর বিশেষভাবে জোর দেয় ।

প্যালেস্টাইনে উপচে পড়া ইহুদী অভিবাসন, দেশের আরব এবং স্থানীয় অন্যান্য জনগনের অধিকার কোনভাবে খর্ব না করে ইহুদী দাবী পুরনের মাধ্যমে সমাধান আনতে ব্যর্থতায় বিক্ষোরনন্মুখ পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকার এই পর্যায়ে প্রশ্নটা জাতিসংঘে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৭ সালের বসন্তে জাতিসংঘ সমাধান খুঁজে বের করতে , সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি স্বার্থ নেই এমন ১১ টি ছোট ছোট রাষ্ট্রের প্রতিনিধির সমন্বয়ে এক কমিটি গঠন করে। ১৯৩৭ সালের রাজকীয় কমিশনের প্রস্তাবে ফিরে গিয়ে কমিটির সাত সদস্যের সংখ্যগুরু সুপারিশ--- প্যালেস্টাইনকে ইহুদী এবং আরবদের দু'টি স্বাধীন দেশের মধ্যে বিভক্ত করা। নীতিগতভাবে এবং মুখোমুখী হওয়া বাস্তবতার নিরিখে জাতিসংঘ নিযুক্ত কমিটির সামনে সে মুহূর্তে একমাত্র সমাধান হিসেবে বিভক্তি এড়ানো হয়তো অসম্ভব ছিল।

কিন্তু বিভক্তির যে বিস্তৃত কর্মসূচী দেয়া হয় তা আরবদের কাছে অবিশ্বাস্য রকমের পক্ষপাতদুষ্ট। মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ---ইহুদীদের শুধু যে বৃহত্তর, অধিকতর উর্বরা ও সর্বোত্তম উপকূলীয় এলাকা এবং একমাত্র বন্দর দেয়া হল যাতে কার্যকর নৌ যোগাযোগ থেকে আরবরা বঞ্চিত হয় তা নয় বরং ৫০০,০০০ আরব (অথবা প্রায় অর্ধেক আরব জনসংখ্যা)দের ফেলা হয় ইহুদী রাষ্ট্রের ভেতর; এদের অধিকাংশই প্যালেস্টাইনের সর্ববৃহৎ আরব শহর এবং আরবদের প্রধান সমুদ্রবন্দর জাফার অধিবাসী। রাষ্ট্র দু'টির অন্ত বর্তীকালীন দু'বছর সময়কালের জন্যে ম্যান্ডেটরি শক্তির আওতায় এক অর্থনৈতিক ইউনিয়নে থাকার কথা বলা হয় যে সময়কালে ইহুদী রাষ্ট্রে আরও ১৫০,০০০ ইহুদী অভিবাসী আসার অনুমতি থাকবে।

এই স্কীমের ভুল নাম দেয়া হয় পার্টিশন। মুলতঃ এর মতলব আরব প্যালেস্টাইনকে অস্তিত্বহীন করে দেশের প্রকৃত বাস্তব ও বৃহত্তর অংশে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্টা যেখানে ৭০০,০০০ আরবদের জন্যে ফ্রন্টিয়ার ,পশ্চাদভূমি কিংবা জীবিকা নির্বাহের উপায় বিহীন অবরুদ্ধ একটুকরো ভুমি রাখা হয় তাও ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক ইউনিয়ন মেনে নেয়ার শর্তে। বৃটেন এই স্কীমের আওতায় প্রস্তাবিত ভূমিকা নিতে অনিচ্ছুক ঘোষণা দেয়। বৃটেনের পলিসি, উভয় পক্ষের সম্মতিবিহীন কোন সমাধান সে নিজে কিংবা জাতিসংঘের প্রতিনিধিরূপে কার্যকর করতে যাবেনা । ইতোপূর্বে এক রোমান প্রো কন্সাল যেমন প্যালেস্টাইন থেকে হাত ধুয়ে উঠে গিয়েছিল তেমনি বৃটেনও একটা নির্দিষ্ট তারিখে ম্যান্ডেট প্রত্যাহার এবং প্যালেস্টাইন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করে , এবং জাতিসংঘে প্যালেস্টাইন বিষয়ে বিতর্ক চলাকালীন তাতে অংশগ্রহনে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে কট্টর নিরপেক্ষ ভূমিকা দেখায়। আরবদের প্রতি নিজেদের দেশে 'রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বৃটেন ঘোষিত গ্যারান্টির বিচারে এই নীরবতাও আরবদের জন্যে কোন সুবিচার ছিলনা। ত্রিশ বছর পুর্বে বেলফুর ঘোষনা জারী করে, এবং পরবর্তী পুরো সময় ধরে প্যালেস্টাইনে 'ইহুদী জাতীয় আবাসন' প্রতিষ্ঠা তত্বাবধান করে, প্রকাশ্যে আরবদের প্রতি পবিত্র দায়াবদ্ধতার অভিনয় করে আসল মুহূর্তে পার্টিশন স্কীমের বিরুদ্ধে একটি কথাও না বলে বৃটেন দায়ীত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং পার্টিশন স্কীম কার্যতঃ আরবদের ধ্বংশ ঘোষনা করে। এটা কোন নিরপেক্ষতা নয় বরং কর্তব্য বিচ্যুতি। তদুপরি সমাধানে বৃটেনের অংশ নেয়াকে আরব এবং ইহুদীদের কাছে শর্ত সাপেক্ষ করায় বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ম্যান্ডেট অপসারন নির্ধারিত হয় যেহেতু ইতোমধ্যে পরিস্কার হয়ে যায় যেমনটা বছর বছর ব্যাপী পরিস্কার ছিল, যেখানে ইহুদী দাবী কার্যতঃ আরব প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সেখানে কোন সর্বসম্মত সমাধানই সম্ভব নয় ।

বেলফুর ঘোষণার পর পরই জায়নবাদীদের কথাএবং কাজে এই লক্ষ্য সম্পর্কে (আরবরাতো বটেই এমনকি কিং ক্রেইন কমিশনের মত নিরপেক্ষ পরিদর্শকেরাও) বৃটেনকে সাবধান করেছে। তথাপি ত্রিশ বছর ধরে বৃটেন

জায়নবাদীদের এই লক্ষ্য পুরণে সহায়তা করার পাশাপাশি আরবদের অধিকারসমূহ খর্ব হতে দেবেনা বলে চেঁচিয়েছে; এবং তার পলিসির উপায়ান্তরহীনতা, দুষ্টযুক্তি যখন তাকে গ্রাস করলো বৃটেন আরবদের উদ্দেশ্যে শুধু এটাই বলতে পারলো যে প্যালেস্টাইনে ইহুদীরাষ্ট্র মেনে নিতে সে আরবদের বল প্রয়োগ করবেনা কিন্তু ততদিনে ঢের বিলম্ব ঘটে গেছে। ১৯১৮ সাল থেকে সে ইহুদীদের পথ করে দিতে আরবদের উপর যথেষ্ট বল প্রয়োগ করেছে, ইহুদীরা সেখান থেকে বাকীটা নিজেদের উন্নত সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেরাই করে নিতে সক্ষম।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৭ জাতীসংঘে বিভক্তি প্রস্তাব পাশ হয়, যদিও প্রয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্টতার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শেষ মুহূর্তে কিছু জোর জবরদস্তিমুলক (এবং ঘুষের মাধ্যমেও) ব্যবস্থা,প্রচারনার আশ্রয় নিতে হয়। বিষয়টি প্রকাশ্যে জায়নবাদ সমর্থক ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানও স্বীকার করে। শহরে ইহুদী প্রভাবের কারণে টাইমস এর মন্তব্য- "ডেলিগেটদের সাধারণ মনোভাব , নিউইয়র্ক ছাড়া আর কোন শহরে বসে পার্টিশন স্কীম অনুমোদন করা যেতোনা"।

১৫ই মে ১৯৪৮ সালে বৃটেন ম্যান্ডেট প্রত্যাহারের ঘোষনা দিয়ে প্যালেস্টাইন থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করে। যেহেতু পার্টিশন স্কীম বাস্তবায়ন করতে জাতীসংঘ নিশ্চিতভাবে সেনা মোতায়েন করছেনা সেহেতু সেখানে আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাটাই স্বাভাবিক। এ'ধরনের যুদ্ধের জন্যে প্যালেস্টাইনের আরবদের চেয়ে ইহুদীদের প্রস্তুতি ব্যাপক। বছর বছর ধরে তারা সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধের পরিবেশে থেকে অভিজ্ঞ। পক্ষান্তরে আরবরা ১৯৩৯ সালের বিদ্রোহের পর থেকে পুরোপুরি বিশৃঙ্খল, অধিকন্তু ইউরোপ, আমেরিকা থেকে সাম্প্রতিকতম কৌশল প্রযুক্তিসহ আসা ইহুদীদের চেয়ে পশ্চাদপর। এমনকি আরববিদ্রোহও সেনা বর্বরতার দক্ষতা বিচারে ইহুদী সন্ত্রাসবাদের সমকক্ষ ছিলনা।

তদুপরি আরবরা নিজেদের দেশে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছিল যে জীবনে সংখ্যালঘু বিদেশীর মত বিপদের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত,সতর্ক,সদাপ্রস্তুতিতে একপা এগিয়ে থাকার প্রয়োজন হয়না। সর্বোপরি আরবলীগ গঠনের মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইনের আরবরা এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয় যে, প্যালেস্টাইনের প্রতিরক্ষা এখন আরব রাষ্ট্রসমূহের বিষয় যাদের অনেকের অন্ততঃ প্রমাণ সাইজের নিয়মিত সেনাবাহিনী আছে। প্রথমদিকে আরবলীগ প্যালেস্টাইন এবং পাশ্ববর্তী আরবরাষ্ট্রসমুহ থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে অনিয়মিত মুক্তিবাহিনী গঠন করার পলিসি নেয়। বৃটিশদের চলে যাওয়ার আগেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তাতে প্রমাণ মেলে যে আরব মুক্তি বাহিনী কোনভাবেই ইহুদী সেনাশক্তির সমকক্ষ নয়।

১৪ ই মে'র বিকেলে , বলা যায় আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পুর্বে ইহুদীরা তাদের ইজরায়েল রাষ্ট্র ঘোষনা করে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাৎক্ষণিকভাবে তাকে স্বীকৃতি দেন, অথচ তখনও লেক সাকসেস এ 'ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নিষ্পত্তি বাধাগ্রস্থ করতে পারে এমন কিছুই করা যাবেনা' শর্তে মার্কিন প্রতিনিধি দল আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করছিলেন!
আরব লীগ মিশর,জর্দান,ইরাক এবং সিরিয়ার নিয়মিত সেনাবাহিনী থেকে প্যালেস্টাইনে সৈন্য পাঠানোর উদ্যোগ নেয় । লেবাননেরও ক্ষুদ্র এক সেনাদল ছিল তাতে। আর্থিক প্রতীকী সাহায্যের উদ্দেশ্যে দেশে সামান্য লেভী বসিয়েছিল সৌদী সরকার, ইয়েমেন এই উদ্যোগে কোন অবদান রাখেনি।

অনৈক্যের কারণে আরব রাষ্ট্রসমূহের অভিযান শুরু থেকেই বিকলাঙ্গ। একজন জেনারেল স্টাফের অভাব সহ সবদিক থেকেই তাদের আয়োজন হতাশাব্যঞ্জক । বিশেষকরে পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে মিশর এবং জর্দানের মধ্যে সহযোগীতার সম্পর্ক স্থাপন ছিল অসম্ভব। আরব পক্ষের দুর্বলতার আরেক মারাত্মক কারন জর্দানের 'আরব লিজিয়ন' । সংখ্যায় কম হলেও আরব শক্তির মধ্যে সম্ভবতঃ এরাই ছিল সবচেয়ে উন্নত

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং সর্বোত্তম অস্ত্র সজ্জিত। রাজা আবদুল্লাহর তত্বাবধানে হলেও এই লিজিয়ন বৃটেনের ভর্তুকি ভোগী এবং সরাসরি বৃটিশ অফিসারের কমান্ডের আওতায়।

সম্ভবত: এই বাস্তবতাই জর্দানের সহায়তার উপর ভরসা করা আরবদের পুরো আয়োজনকেই ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। আমেরিকার সরকারী নীতি ও জনমত, এবং আমেরিকার উপর যুদ্ধোত্তর বৃটেনের নির্ভরতা বিচারে কীভাবে বৃটেনের অর্থ,অস্ত্র সাহায্যপুষ্ট এবং উচ্চতর কমান্ডের আওতাধীন একটা সেনাবাহিনী ইসরায়েল রাষ্ট্র ধ্বংসে সফল হতে পারে? আরব লিজিয়নে বৃটিশ অফিসারদের অবস্থান নিয়ে অবশ্যই বৃটিশ প্রেস ও পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছে। সরকার সব প্রশ্নকারীকেই নিশ্চয়তা দেন যে, এসব অফিসারদের বৃটিশ কমিশন থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং তারা ব্যক্তিগতভাবেই জর্দানে চাকুরীরত। কিন্তু ভর্তুকির প্রশ্ন থেকেই যায় , যাতে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছা কষ্টকর যে,ইজরায়েলের ক্ষতিতে বৃটেনের সায় ছিলনা বরং সে এমন এক প্রতীকী যুদ্ধ আশা করেছে যা প্রয়োজন বোধে তখন বন্ধ করা যাবে যখন জাতীসংঘ নির্ধারিত সীমানায় অথবা তার কাছাকাছিতে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এ'সব প্রতিবন্ধকতা সত্বেও যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আরবরা বিমান যুদ্ধে এগিয়ে থাকে, এবং নুতন জেরুযালেম শহরে ইহুদীদের আত্মসমর্পনে বাধ্য করার মত অবস্থানে পৌঁছে যায়। কিন্তু তখনই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয় চার সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির নির্দেশ তথা জাতিসংঘের অস্ত্র। মুলতঃ বৃটেনের চাপে আরবরা এই নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। কারন বৃটেন হুমকি দেয় যে এই নির্দেশ না মানলে সে আরবদের কাছে বিক্রীত অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেবে।

আরব রাষ্ট্রসমুহ তাতে সাড়া দেয় এবং ৯ই জুন যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। যুদ্ধবিরতির একটি স্বাভাবিক প্রচলিত শর্ত এই যে , বিরতি চলাকালীন সময়ে বিবদমান পক্ষদ্বয় কোনভাবেই বিদ্যমান সেনা অবস্থান অথবা সেনা সংখ্যা বাড়াতে পারবেনা। পুরো সময় জুড়ে বৃটেন মিশর, ইরাক, এবং জর্দানে অস্ত্র সরবরাহে কড়া নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখে যদিও সেখানে পুর্বেকার চুক্তি মোতাবেক সে অস্ত্র সরবরাহে দায়াবদ্ধ। বৃটেন ছাড়া আরবদের অস্ত্র জোগাড়ের আর কোন বিকল্প উৎস ছিলনা। পক্ষান্তরে ইজরায়েলীরা খোদ জাতিসংঘের পরিদর্শকদের সামনেই যুদ্ধবিরতির এই শর্তকে অগ্রাহ্য করেছে। তাদের যোগাযোগ আছে ইউরোপের এমন সব দেশ থেকেই প্যালেস্টাইনে সবরকমের অস্ত্র চোরাচালানের সহায়তা করা হয়েছে। ইংল্যান্ডে কেনা অথবা সেখানে কেনা পুরো বিমান বাহিনীর ইউনিট প্যালেস্টাইনের পথে উড়ে এসেছে। ফলতঃ যুদ্ধবিরতি কালীন সময়ে সামরিক পরিস্থিতি পুরোপুরি ইহুদীদের পক্ষে এমন ভাবে বদলে যায় যাতে আরবদের পুর্ববৎ নিজস্ব দুর্বলতা নিয়ে ,ফলাফল নির্ধারনী নুতন প্রতিকূলতা সমুহের মুখে পড়তে হয়। কয়েকমাসের মধ্যে ইজরায়েলীরা প্রকাশ্যে বিশৃঙ্খল আরবদের ছত্র ভঙ্গ করে দেয়। আরব প্যালেস্টাইনের অবশিষ্ট অংশ নিজের রাজ্যের সাথে যুক্ত করার রাজা আবদুল্লাহর প্রস্তাবের বিরোধীতা করে মিশর। এই প্রেক্ষাপটে আবদুল্লাহ জেরুযালেম ফ্রন্টে ইহুদীদের সাথে স্থানীয়ভাবে যুদ্ধবিরতির সন্ধি করেন এবং দক্ষিণে ক্রমাগত আক্রমণের মুখে মিশরীয় বাহিনীর সাহায্যার্থে তাঁর 'আরব লিজিয়ন' পাঠাতে অস্বীকার করেন। ইজরায়েলীরা জাতীসংঘের স্কীমে তাদের জন্যে বরাদ্দের অনেক অনেক বেশী পরিমান ভূমি অস্ত্রের জোরে দখল করে নিতে সক্ষম হয়। জাতীসংঘের মধ্যস্থতাকারী কাউন্ট বার্ণাডট ইহুদীদের বিজিত ভুমির বিপরীতে নুতন সীমানা প্রস্তাব করলে একদল ইহুদী সন্ত্রাসী তাঁকে খুন করে। যুদ্ধের পুরোসময় ধরে আরবদের দখলে থাকা পশ্চিম গ্যালিলি এবং পুরোন জেরুযালেমের ছোট এক ত্রি-ভূজ ভূমি আরব ফিলিস্তিনীদের জন্যে রেখে , তারা বারবার জাতিসংঘ প্রস্তাব উপেক্ষা করে পুর্ণ সামরিক শক্তিতে অর্জন সম্ভব সীমারেখার দিকে অগ্রসর হয়। জাতিসংঘ স্কীমের আওতায় পুরো শহরকে আন্তর্জাতিকীকরনের প্রতি সম্মতিসুচক, আবদুল্লাহ পবিত্র নগরীর অর্ধেক অংশে তার পতাকা উড়াতে মনস্থ করেন। যদিও বৃটেন , আমেরিকার চাপ ছাড়া ইহুদীরা নুতন শহরেও এর স্বীকৃতি দেবে কিনা তা অনিশ্চিত এবং এর কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিলনা অতএব, জেরুযালেম এবং অবশিষ্ট প্যালেস্টাইনের ভাগ্য সামরিক সিদ্ধান্তের সীমানায় ঝুলে থাকে।

যুদ্ধে সামরিক পরাজয় এবং প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ ভূমি হারানোর চেয়ে ভয়ঙ্কর মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে আরব জনগনের জীবনে। প্যালেস্টাইনের মোট*সোয়া মিলিয়ন আরব জনগনের অন্ততঃ ৭-৮লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় অথবা তাদের জর্দান,লেবানন, সিরিয়া এবং মিশরের দিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এই মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের মূলে ইহুদী সেনা নায়কদের পরিকল্পিত সন্ত্রাস, উচ্ছেদ অভিযানে 'দিয়ার ইয়াসিন'র মত নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ যতটা দায়ী; আরব প্রচার মাধ্যম এবং কিছু কিছু নেতার দায়ীত্বজ্ঞানহীন উঁচু গলাও কম দায়ী নয়। তাদের বড়াই ছিল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরব রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী ইহুদীদের পরাস্ত করবে এবং ফিলিস্তিনীরা এসে দেশের পুনর্দখল নিতে পারবে।

ইহুদীরা কেন এই অমানবিক নীতি অনুসরন করলো তার দু'টি সদুত্তর পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ইহুদী রাষ্ট্রের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় এক বিরাট সংখ্যক আরব জনগনকে আশ্রয় দেবার চিন্তা সবসময় তাদের উদ্বিগ্ন করেছে। তারা পুরোপুরি একটা ইহুদী রাষ্ট্র চেয়েছে। চিরতরে ইহুদীদের সাথে মিশে না গিয়ে সব সময় নিজেদের ভাগ্যের জন্যে দোষারোপ করতে থাকবে, এবং তা থেকে পরিত্রাণের আশায় চারিদিকের আরব রাষ্ট্রসমূহের কাছে হাত পেতে ইজরায়েলের ইহুদীত্ব এবং অস্তিত্বের উপর হুমকি সৃষ্টি করতে পারে এমন আশঙ্কা তারা চিরতরে নির্মূল করতে চেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইজরায়েলীরা যত খুশী ইহুদীদের জন্যে প্যালেস্টাইনের দ্বার অবারিত করতে চেয়েছে। স্বাভাবিকভাবে দেশে আরবদের সংখ্যা যত কম হবে তত বেশী ইহুদীদের জন্যে স্থান সংকুলান হবে। এবং যুদ্ধের সময়েই যদি তাদের তাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে তাদের ঘর-বাড়ি ,জমি-জমা,পুরো গ্রাম-শহর বিনামূল্যে পাওয়া যায়, বলাবাহুল্য বাস্তবেও তাই ঘটেছে।

এভাবে মাতৃভূমির সীমানা ঘেঁষে তাবু এবং গুহাবাসী, অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ঘরবাড়ীর দৃষ্টিসীমার মধ্যে জাতীসংঘ এবং আরবদেশসমূহের সহায়তায় আবার তাতে ফিরে যাবার ভরসায় অনিশ্চিত প্রবাসে চরম অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টে নিপতিত প্রায় এক মিলিয়ন সর্বস্বহারা আরব উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি। লেবার পার্টির চিরস্মরণীয় প্রস্তাব মতে "ইহুদীদের প্রবেশের সাথে সাথে এদের বেরিয়ে যেতে" উৎসাহিত করা হয়েছে। এবং 'দুই মিথ্যে দিয়ে একটা সত্য হয়না' প্রতিনিয়ত উচ্চারিত অথচ এক্ষেত্রে চোখ বুঁজে অস্বীকার করা ট্রাজেডীর বাস্তবতা নিয়ে এখনও তারা সেখানেই আছে।

ফিলিস্তিনীদের পক্ষে বলতে গেলে- প্রতিটি ঘর-বাড়ী, প্রতিটি রাস্তার জন্যে লড়াই না করে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে যদি ভীরুতা কিছু থাকে তার সমর্থনেও বলতে হয় যে, এরা ছিল মূলতঃ নিরস্ত্র, অসংগঠিত, অশিক্ষিত চাষা-ভূষা জনগন। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি এবং বিপদ কেটে যাওয়া অবধি প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়া ছাড়া হঠাৎ তেড়ে আসা মৃত্যুর জন্যে আর কোন সদুত্তর তাদের জানা ছিলনা। তাদের আশা ছিল এ'দুর্দিন কেটে যাবে।

১৯৪৯ সাল নাগাদ একের পর এক আরব রাষ্ট্র ইজরায়েলের সাথে যুদ্ধবিরতি সম্পাদন করে। যুদ্ধবিরতির শর্তসমুহ এবং তাতে চূড়ান্তভাবে সম্মত সীমান্ত মেনে চলা পর্য্যবেক্ষণের জন্যে জাতীসংঘের পর্য্যবেক্ষন কমিশন গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স এক যৌথ ঘোষনায় যাতে কোন পক্ষ নুতন সীমান্ত অতিক্রম না করে সে নিশ্চয়তা দেয়। আরবদের জন্যে অবশিষ্ট প্যালেস্টাইন জর্দানের অন্তর্ভুক্ত হয় (যে সম্মিলন বৃটেনের সাথে জর্দানের সম্পাদিত চুক্তিতে গ্যারান্টিযুক্ত), এবং মুফতির নেতৃত্বে গঠিত এবং মাত্র কয়েকমাস পুর্বে মিশর ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাকসর্বস্ব ,স্বপ্নের 'নিখিল প্যালেস্টাইন সরকার' বিলুপ্ত হয়।

সামরিক দুর্বলতা আরব রাষ্ট্রসমূহকে আপাতঃ বিরোধ নিষ্পত্তিতে বাধ্য করলেও কোনভাবে পরোক্ষে হলেও ইজরায়েলকে মেনে নেয়ার চুক্তিতে কিংবা স্থায়ী শান্তি বিবেচনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। মাসের পর মাস আরব প্রচার মাধ্যমে ইজরায়েল নামের আগে 'তথাকথিত' শব্দটি জুড়ে রইল , এবং একসময় চলমান বাস্ত

বতায় তা ঝরে গেলেও যে মানসিকতা থেকে তার উৎপত্তি তা বজায় থাকে। আরব দেশসমূহ প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বয়কটের ডাক দেয়। ইরাক সরকার ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর তেল 'হাইফা' টার্মিনালে পাঠানো নিষিদ্ধ করে, এবং বৃটেনের নানাবিধ চাপের মুখেও এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখে। সন্দেহ নেই যে এ ইস্যুতে নমনীয় ইরাকী প্রধানমন্ত্রী পদচ্যুত হবেন; গণরোষের বিস্তৃতি এবং প্যালেস্টাইন হারানোর অপমানের তীব্রতা এতটাই মারাত্মক। একইভাবে মিশরও ঘোষনা করে সুয়েজখাল দিয়ে ইজরায়েলে যুদ্ধ সরঞ্জামবাহী কোন জাহাজ চলাচল বন্ধে তার অধিকার রয়েছে। এভাবে ক্ষতিগ্রস্থপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহনকারী সবাইকে কলঙ্কের আলোয় আলোকিত করে,আপাততঃ ইতিহাসের চরম বেদনার এক অধ্যায় শেষ হয়।

জায়নবাদীরা এমন এক জরাক্রান্ত দর্শন অনুসরন করেছে ,আরবদের চরম ক্ষতিগ্রস্থ করেই কেবল যার বাস্তবায়ন সম্ভব। বৃটিশরা ত্রিশ বছর ধরে বারংবার আরবদের সাথে বঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা পুর্বক সেই দর্শন প্রতিষ্টায় অব্যাহত সমর্থন ও সহায়তা করে এসেছে। জাতীসংঘে পার্টিশন স্কীম অনুমোদন করিয়ে নিতে আমেরিকা প্রশ্নবোধক উদ্দেশ্য প্রণোদীত হয়ে প্রশ্নবোধক পদ্ধতি অনুসরন করেছে। জাতীসংঘের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘনের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইজরায়েলকে আরও সুবিধা দিয়ে খোদ জাতীসংঘই সালিশী হিসেবে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বোপরি আরবরাও প্রমাণ করেছে তাদের সুবিচারী নাহলেও গ্রেট ওয়েস্টার্ণ বন্ধুর ওয়াদা 'প্রয়োজনে মুল্যহীন'; এবং কোন ন্যায্য বিষয় নৈতিকভাবে যত নিঁখুতই হোক নিজে থেকে তা বিজয়ী হয়না। চারিদিক থেকে জড়ো হওয়া আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও, নিজেদের ভেতর কিছু মিথ্যা, দুষ্ট ক্ষত না থাকলে আরবরা প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ জিতে নিতেও পারতো।

(৭)

স্পেন হারানোর পর প্যালেস্টাইনে পরাজয়ের সবচেয়ে মারাত্মক যন্ত্রণা আরবদের মধ্যে এক নুতন জাগরণের জন্ম দেয় । এই জাগরণ উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক পুর্নজাগরণ কিংবা ১৯১৬ সালের আরব বিদ্রোহের জন্মদাতা আল ফাত্তাত, আল আহাদ'র রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সম্পুর্ন ভিন্ন।সেই প্রথম জাগরণ মুলতঃ আত্মগৌরবের রোমান্টিক স্বপ্ন, অতীত আরবের শান-শওকত ফিরে পাবার স্বপ্ন। অনেকটা আরবী কাব্য এবং বাগ্মীতায় অনুপ্রাণিত অহংকার থেকেই এর উৎপত্তি। বিভিন্ন আরব দেশে এই আত্মগৌরব ফ্রান্স, বৃটেনকে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধের উদ্দীপনায় বহুলাংশে উদ্দীপ্ত হয়েছে। নানাভাবে হতাশ, হতোদ্যম আরবরা অহমিকা এবং আড়ম্বরপুর্ণ ভাষার স্বপ্নরাজ্যে সান্ত্বনা খুঁজে ফিরেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ আরব দেশসমূহের প্রচার-প্রকাশনা এবং জনসভায় এই ধারা বজায় থাকে। প্যালেস্টাইন হারানোর ক্ষতিতে আত্মঅবক্ষয় আর আত্মসমালোচনার মত সাধারণ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে সেই প্রথমবারের মত আরবরা (পশ্চিম, বিশেষতঃ নুতনভাবে আমেরিকার প্রতি চরম বিরুদ্ধভাব বজায় রেখেও) তাদের সব দুঃখ দুর্দশার জন্যে বৃটিশ, ফরাসীদের পাইকারী দোষারোপ থেকে সরে এসে নিজেদের দোষ দেখা শুরু করে। এই আত্মদংশন বহুলাংশে দস্তয়ভস্কি স্টাইলে হতাশা এবং নিস্প্রয়োজন গোছের হলেও এর কতকাংশের গঠনমুলক প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট।

প্রসঙ্গক্রমে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, বৈরুতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ কস্টি জোরায়েক প্রণীত *The meaning of the disaster* শীর্ষক লিফলেট, এবং প্রগতিশীল প্যালেস্টাইনী নেতা মুসা আলামী (যাঁর মুক্তবুদ্ধির চর্চা ইতোপুর্বে মুফতির শত্রুতা অর্জন করেছিল)র লেখা *The lesson of Palestine* গ্রন্থ ইত্যাদিতে সরলতা ও সাহসিকতার সাথে ইতোপুর্বে সাধারণ্যে অজানা আরব জীবনের কাঠামোগত দুর্বলতা ব্যাখ্যা পুর্বক তার বাস্তব সমাধান সুপারিশ করা হয়। দুর্বলতাগুলো তেমন দুরের বিষয় নয়; উভয় লেখকই তা খুঁজে পেয়েছেন বিশাল সংখ্যাগুরু আরব জনগনের দারিদ্র্য,অশিক্ষা এবং অপ্রতুল স্বাস্থ্য

পরিসেবার মধ্যে,সাধারণ জনহিতৈষণার অভাবে, ভূ-মালিক এবং ধনী ব্যাবসায়ী শ্রেণীর আত্মসর্বস্বতায়,সর্বোপরি সরকার সমুহের অদক্ষতা; এসব থেকে জন্ম নিয়ে এসবের মধ্যেই ফুটে উঠে সমাজের অস্বাস্থ্যকর ছবি।

সমাধান হিসেবে আলামীর বইতে দীর্ঘ গবেষনায় বলা হয়, আরব জীবনকে পরিবর্তন করতে ১৫-২০ বছর সময় মেয়াদী যে ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্ধচন্দ্রাকৃতির উর্বর আরব ভূমি (সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, জর্দান এবং অবশিষ্ট ফিলিস্তিন) ও আরব রাষ্ট্রসমুহ আলাদা আলাদাভাবে উপযুক্ত নয়। মুল বাস্তবতা হচ্ছে যদি তারা একই সরকারের আওতায় এসে একক সেনাবাহিনী গঠন না করে তাহলে জায়নবাদীদের আরও গিলে খাওয়া ঠেকানোর সম্ভাবনা ততই দুর্বল থেকে যাবে। অতএব মৌলিক সমাধান- এই দেশগুলোর মধ্যে ইউনিয়ন গঠন। এভাবে আলামী , নুরী পাশা আল সাইদের ১৯৪২ সালের আরব ইউনিয়ন স্কীমকেও ছাড়িয়ে যান।

সম্ভাব্য ইউনিয়নে ইরাকের অন্তর্ভুক্তি প্রস্তাব করে তিনিও নুরী পাশা আল সাইদের মত মিশরীয় কিংবা লেবানীজ খ্রীশ্চানদের বিরাগভাজন হতে চাননি। তাই তাঁর পরামর্শ- আরবলীগকে ডিঙিয়ে যাবার কোন উদ্দেশ্য এই ইউনিয়নের থাকবেনা বরং তা মিশর এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্রসমুহের মতই লীগের সদস্য থাকবে। ইউনিয়নের মধ্যে লেবাননের নিশ্চিত স্বায়ত্বশাসনও তিনি প্রস্তাব করেন। এই ইউনিয়নের মধ্যে তিনি ভুমির মালিকানা সংস্কার, উচ্চতর আয়ের লোকজনের উপর উঁচু হারে করারোপ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন এবং জনগনের জন্যে উন্নত সামাজিক বীমা ব্যবস্থা ইত্যাদি 'লিবারেল-সমাজবাদী' কর্মসূচী প্রনয়ণ করেন। এভাবে উন্নত জনগনের মধ্য থেকে একটা ভাল সেনাবাহিনী রিক্রুট করা এবং অধিকতর দক্ষ সরকার গড়ে উঠা সম্ভব।

আধুনিক আরবী সাহিত্যে তাঁর এই বই 'সর্বোচ্চ বিক্রীর তালিকায়' স্থান করে নেয়। বিশেষতঃ উর্বর, অর্ধচন্দ্রাকৃতির আরব ভূমিতে তার একের পর এক সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হতে থাকে। এর মধ্য দিয়ে আরব লীগের প্রতি বৃহত্তর আরব জনগনের মোহভঙ্গের নমুনা এবং বিভিন্ন আরব দেশে চলমান পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক প্রথা পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণার চিত্র ফুটে উঠে। ক্ষমতাসীন সরকার সমুহের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের কারণগুলো দানা বাঁধতে থাকে, এবং তা বাস্তবে পরিণত হতেও দেরী করেনি।

সিরিয়াতেই তা প্রথম ঘটে। এখানে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে কর্ণেল হোসনি আল জাইম'র নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে ঐতিহ্যবাহী জাতীয়তাবাদী 'ন্যশনাল ব্লক সরকার'র পতন ঘটে। অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ এবং নির্দিষ্ট অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল প্যালেস্টাইনে পরাজয়ের গ্লাণি। সেনা অফিসারদের সাধারণ অনুভূতি এইযে, রাজনীতিবিদগনই তাদের হারিয়ে দিয়েছেন। অধিকন্তু সেনাবাহিনী জনগনের আবেগ অনুভব করে তা বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। সিরিয়ার বাইরে লেবানন এবং অন্যান্য আরবদেশেও এই সামরিক অভ্যুত্থান আশা-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। প্যালেস্টাইন বিপর্যয়ের পর থেকেই সর্বত্র বলাবলি হচ্ছিল একজন আতাতুর্ক ই আরবদের রক্ষা করতে পারতো এবং এখন পুনরুদ্ধার করতে পারে। জনগনের কামনা এবং অপেক্ষার লগ্নেই দামেস্ক থেকে খবর আসে: রক্ষাকর্তার আবির্ভাব ঘটেছে ;জায়েমই সিরিয়া এবং আরব দুনিয়ার আতাতুর্ক!

দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তা ছিলেননা। যদিও তিনি নিজেকে সে ভূমিকায় দেখেছেন, স্বল্পকালীন ক্ষমতার মেয়াদে বেশকিছু আধুনিক উদ্যোগ নিয়েছেন তন্মধ্যে রাজনীতিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি দামেস্কের মত রক্ষণশীল মুসলিম রাজধানীতে এক সত্যিকারের গুরুত্বপুর্ন ও সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু জাইমের কোন বিস্তৃত পরিকল্পনা,সুপরিকল্পিত কর্মসূচী ছিলনা,সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে উর্বর, অর্ধচন্দ্রাকৃতির আরব ভূমির প্রতিবেশীদের সাথে সিরিয়ার সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়ে তাঁর কোন পরিস্কার ধারনা ছিলনা। ক্ষমতা

দখলের কয়েকদিন পর প্রদত্ত এক বিবৃতি থেকে আঁচ করা হয় তিনি ইরাকের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে আগ্রহী । নূরী পাশা আল সাইদ এবং 'রিজেন্ট' তথ্যানুসন্ধানী সফরে দামেস্ক আসেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয়না। স্বল্পকাল পর জায়েম মিশরে আমন্ত্রিত হন এবং সেখান থেকে তিনি ইরাক কিংবা জর্দানের সাথে কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের ধারণার বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে মিশর-সৌদী অক্ষের মিত্র হয়ে ফিরে আসেন।

জায়েম কোন বড় মাপের নেতা ছিলেননা, ক্ষমতা ব্যবহারের মধ্য দিয়েও তাঁর অবস্থান বেড়ে উঠেনি। তাঁর অবস্থান সবসময় নির্ভর করেছে একদল সেনা অফিসারের উপর যাদের অনেকের চোখেই তিনি কোন কুশলী নেতা ছিলেননা। স্বাভাবিকভাবেই তারা ভাবতে শুরু করেন জায়েম পারলে আমরা পারবোনা কেন? তাদের ফেরাবার কোন পথ ছিলনা। তারা জায়েমকে পদচ্যুত করে খুন করতে এগিয়ে যায়। কিছুকাল পর এই দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের নায়কেরাও পরাস্ত হয় তৃতীয় অভ্যুত্থানের নায়ক কর্ণেল শিসাকলির হাতে। এভাবে যুদ্ধের আগে ইরাকে যা ঘটেছে সিরিয়ায়ও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করে। সেনাবাহিনীর হাতে দুর্বল এবং শেকড়বিহীন গণতন্ত্রের এই অপমৃত্যু অনেকটা তুর্কির মত তবে পার্থক্য এইযে, দেশ ও সেনাবাহিনীর উপর স্থায়ী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্টা করার মত যথেষ্ট বড় মাপের সেনা ব্যক্তিত্বের উত্থান এখানে ঘটেনি।

ভূমি সংস্কার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেমন সেচের মাধ্যমে কার্পাস চাষের মত কিছু কিছু কাজকর্মে একপর্য্যায়ে মনে হয়েছে কর্ণেল শিসাকলির শাসন বুঝি টিকে গেছে এবং ভাল কাজও করছে। দুর্নীতি ও মুনাফাখোরির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব থেকে সরকারকে মুক্ত করে ধর্মনিরপেক্ষতায় আনার চেষ্টায় 'রেজিম' সফল হতে যাচ্ছে। কর্ণেলের একটা সংস্কার ছিল মুসলিম আইনের স্বীকৃত ডিগ্রী ছাড়া কোন উলেমার ঐতিহ্যবাহী আলখেল্লা পরা (ধর্মীয় কতৃত্ব অর্জনের সহজ উপায়) দন্ডনীয় অপরাধ ঘোষনা। ১৯৫৩ সালে প্রনীত নুতন সংবিধান মতে সংসদীয় সরকার গঠনের সাথে সাথেই কর্ণেল শিসাকলির প্রতিশ্রুতিশীল সরকারের দিন ফুরিয়ে আসে। কোনঠাসা হয়ে যাওয়া পুরোন রাজনৈতিক দলসমূহ, জমিদার এবং বড় বড় ব্যাবসায়ীরা সেনাবাহিনীতে বিপক্ষ গ্রুপকে জিতে নেয়, তারা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ ও দেশত্যাগে বাধ্য করেন।

প্যালেস্টাইনে আরব ব্যর্থতার আরেক শিকার (যদিও এখানে আভ্যান্তরীন কোন্দল ও ষড়যন্ত্র কাজ করেছে বেশী) জর্দানের রাজা আবদুল্লাহ। ১৯৫১ সালে জুলাইয়ের এক শুক্রবারের সকালে প্রার্থনায় যাওয়ার পথে পুরাতন জেরুযালেম শহরে তিনি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। একদল ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তাঁর হত্যা মুলতঃ ব্যাক্তিগত প্রতিহিংসতা পরায়নতা । রাজার বড় ছেলে তাঁর উত্তরাধিকারী হন; পরে মানসিক অস্থিরতা তাকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করলে উত্তরাধিকার যায় তাঁর ছেলের হাতে। সম্ভবতঃ এখানেই বৃটিশ যোগাযোগ (ভর্তুকি এবং 'লিজিয়নে'র বৃটিশ কমান্ড সূত্রে) ক্ষমতার স্থায়ীত্ব এবং ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে।

আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া সাম্রাজ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে; যে পরিবর্তনে বেঁচে থাকলে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকেও খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধায় পড়তে হতো, নিজের বদ্ধমুল কতৃত্বপরায়ন স্বভাবের জনে তো বটেই । প্যালেস্টাইনে আরব বিপর্য্যয় পর্য্যন্ত ট্রান্সজর্দান (পরবর্তীতে জর্দানের হাশেমীয় রাজ্য) ছিল মুলতঃ যাযাবর শ্রেণীর*৪ লক্ষ অধিবাসীর এক ছোট্ট দেশ; সুতরাং বৃটিশ পরামর্শে পরিচালিত এক হৃদয়বান স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে তা শাসন করা খুব কষ্টকর ছিলনা । কিন্তু এর সাথে প্যালেস্টাইনের অবশিষ্টাংশ যুক্ত হয়ে পুরো পরিস্থিতিটাই পাল্টে দেয়। প্যালেস্টাইনী আরবদের বিশাল এক শিক্ষিত এবং রাজনীতি সচেতন অংশ এখন জর্দানী । তাদের অনেকেই প্যালেস্টাইনে বৃটিশ প্রশাসনে দক্ষ, দায়ীত্বশীল প্রশাসক ছিলেন । এই অগ্রসর জনগন এখন জর্দানে পরাক্রমশালী , তারা পুরোন ধাঁচের রাজতন্ত্রের স্থলে অধিকতর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাবী করে। অতীতে কেবল রাজার সিদ্ধান্ত রেকর্ড করার মত অনুগত এবং অবাস্তব কাউন্সিলের বদলে এখন তারা চায় নির্বাচিত সভার কাছে দায়ী প্রকৃত কেবিনেট ।

সবচে' গুরুত্বপুর্ন বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে মিশরে, ১৯৫২ সালের গ্রীষ্মে । মিশরীয় সেনা অফিসারেরাও তাদের সিরীয় কমরেডদের মত প্যালেস্টাইন যুদ্ধ থেকে পরাজয়ের গ্লাণির সাথে সাথে রাজা এবং পুরাতন রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের জ্বলন্ত অনুভূতি নিয়ে ফিরেছেন। প্যালেস্টাইন যুদ্ধে সরবরাহ করা ত্রুটি পুর্ন সেনা সরঞ্জাম ক্রয়ে রাজার কিছু মুনাফাখোর বন্ধু জড়িত থাকার কেলেংকারী ফাঁস হয়ে গেলে তাদের ক্ষোভের আগুন দ্বিগুন জ্বলে উঠে। একই সময়ে রাজার ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য আচরনও সাধারণের সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অধিকর, মৃত্যুকর মওকুফ, বিনামুল্যে মাধ্যমিক শিক্ষার মত কিছু প্রগতিশীল উদ্যোগ সত্বেও বয়োবৃদ্ধ নাহাস পাশার উচ্চাভিলাষী ,ক্ষমতাধর স্ত্রীর কারণে ওয়াফাদের সুনামও অক্ষত নেই। ধনী দরিদ্রের আকাশ-পাতাল বৈষম্য এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে মধ্যবিত্তের অসন্তোষ বেড়েছে। বুদ্ধিজীবি মহলে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা হচ্ছে; তাঁদের মধ্যে সেনা অফিসারের সংখ্যাও কম নয়। শতাব্দীব্যাপী নীরবে কষ্ট সহ্য করা সাধারন মানুষও মুখ খুলতে শুরু করেছে। কায়রোর গৃহভৃত্য, পোর্টার, টেক্সি ড্রাইভার, হকারেরা পর্যান্ত পাশার স্থুলদেহবাহী লিমুজিন কিংবা কোন ধনীর প্রাসাদের দিকে আঙ্গুল তুলে প্রকাশ্যে শাপ-শাপান্ত করা শুরু করেছে।

পুরো বিষয়টা ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী এক চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছে। রাজা এবং ওয়াফাদের মধ্যে দ্বন্ধ, একতরফা চুক্তি বাতিলের পর সুয়েজ এলাকায় বৃটিশবিরোধী সন্ত্রাসী কর্মে ওয়াফাদের উৎসাহ প্রদান,অন্যান্য বিপ্লবী,সংস্কারপন্থীদলের সাথে মিলে মুসলিম ব্রাদারহুডের পুনরুত্থান ইত্যাদি নানা উপাদানের সম্মিলিত ফলাফল হিসেবে কায়রোতে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, সাথে ঈর্ষাপরায়নতাহেতু অগ্নি সংযোজন। বৃটিশ সম্পত্তি এবং বৃটিশ নাগরিকেরা মুল লক্ষ্য হলেও অন্যান্য বিদেশী এবং ইহুদীরাও আক্রান্ত হয়,বিশেষকরে মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাখ্যায় যারা অনৈসলামিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। বলতে গেলে অন্যায় এবং ঘৃণার প্রতীক হিসেবে ক্ষেত্র বিশেষে মিশরীয়দের মালিকানায় দামী গাড়ী, বিলাস বহুল অট্টালিকাও আক্রান্ত হয়েছে। দিনের শেষে সেনাবাহিনী নামিয়েই কেবল আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্টা সম্ভব হয়।

একই সময়ে এক অখ্যাত প্রদেশে আরও আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে। গ্রামের প্রাসাদে সাপ্তাহান্তিক অবকাশ যাপনে গিয়ে এক বিত্তশালী মিশরীয় পরিবার রীতিমত কৃষক বিদ্রোহের মুখে পড়ে। যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা,নিপীড়নের কাছে নীরবে মাথা নত করে আসা ফেল্লাহীনরা এস্টেট ম্যানেজারের সাথে সামান্য কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে পুরো গ্রামের সমর্থন পেয়ে মারমুখী হয়ে উঠে , তারা সামন্ত প্রভুর রাজপ্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেয় । নিকটবর্তী শহর থেকে লরী বোঝাই পুলিশ এসে না পৌঁছা পর্য্যন্ত ধ্বংস যজ্ঞ চলতে থাকে।

সদুদ্দেশ্যসম্পন্ন একদল তরুন সেনা অফিসার ভাবছিলেন কত সহজেই সিরিয়ায়,এবং যুদ্ধের আগে ইরাকে বেসামরিক শাসকচক্রকে উৎখাত করা গেছে! তাঁরা সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। নিশ্চিতভাবে জানা ছিল জনপ্রিয়তাহীন,অথর্ব রাজাএবং আপোষকামী , অকর্মা রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনতা ও শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থন তাদের পক্ষে আসবে। ২৬শে জানুয়ারী কায়রোতে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কেও তাদের ধারনা হয়েছে, সে সময় বলতে গেলে দেশ সেনাশাসনের আওতায় ছিল। পরিকল্পনার চুড়ান্ত পর্যায়ে বিপ্লবী অফিসারেরা জনপ্রিয় এবং সম্মাণিত জেনারেল নজীবের শরণাপন্ন হন। প্যালেস্টাইন যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে মারাত্মক আহত হওয়া জেনারেল তাঁদের আমন্ত্রণে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে সম্মত হন। ১৯৫২'র জুলাই মাসে জেনারেল নজীবের নেতৃত্বে তাঁরা আঘাত হানেন।

প্রথমদিকে সেনাবাহিনী প্রচলিত সাংবিধানিক ধারায় বেসামরিক প্রশাসন দিয়ে দেশ চালানোর চেষ্টা করেন। বিপ্লবী সরকারকে মেনে নিয়ে সংস্কার প্রস্তাব গ্রহন করেন বলে ফারুখকেও তাঁরা রাজা হিসেবে সিংহাসনে রেখে দেয়ার কথা বলেন। কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে জানা যায় সংস্কার কর্মসুচীর প্রথমেই আছে রাজার অপসারণ; ধাপে ধাপে বিপ্লবের ধাঁচে স্বাভাবিক বিষয়গুলো প্রকাশ হতে থাকে। ফারুখ তাঁর শিশু পুত্রের পক্ষে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে (যেহেতু তখন পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র অব্যাহত রাখাই অফিসিয়াল পলিসি) মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

রাজার পক্ষে অভিবাবক পরিষদ(জবমবহপু পড়ঁহপরষ) গঠিত হয়, অফিসারদের আস্থাভাজন, প্রাক্তন মন্ত্রীসভার এক মন্ত্রীকে প্রধান করে বেসামরিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। অস্থায়ী সরকার হিসেবে তারা দেশ পরিচালনা করতে থাকে। প্রকৃত ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই অভ্যুত্থানকারী সামরিক জান্তার বিপ্লবী কাউন্সিলের হাতে। কয়েকমাস পর অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ- জেনারেল নজীব প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হন, পরে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে পরে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন। এর মধ্য দিয়ে মিশরে মোহাম্মদ আলীর বংশধরদের দেড়শত বছরের শাসনকাল শেষ হয়।

বিপ্লবী সরকারের সংস্কার কর্মসূচী শুরু হয় রাজতন্ত্র উচ্ছেদ এবং সকল খেতাব বাতিলের ঘোষনা দিয়ে। আধা সামন্ত মর্য্যাদার প্রতীক 'পাশা', 'বে' ইত্যাদি উপচে পড়া উপাধির দেশে এই সিদ্ধান্ত হালকা কোন ইশারা মাত্র নয়। এরপর নুতন সরকার প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দুর এবং অসৎ উপায়ে ধন সম্পদ অর্জনকারী মন্ত্রী ও পদস্থ লোকজনদের শাস্তি দিতে এগিয়ে আসে। এই দুঃসাধ্য কার্যক্রমে সরকার অনেকটাই সাফল্য অর্জন করে। দরিদ্র শ্রেনীর স্বার্থে জীবন যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও বড় ধরনের সফল অভিযান চালানো হয়।

আপাতঃ প্রয়োজন থেকে ফিরে সরকার দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কারে নুতন আইন প্রয়োগ, উচ্চ আয়ের লোকজনদের উপর বর্ধিত হারে করারোপ, উন্নয়নের সকল সম্ভাবনা বিস্তৃত এবং সুক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখার জন্যে জাতীয় উৎপাদন কাউন্সিল গঠন করেন, একইভাবে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কার ও সম্প্রসারন পরিকল্পনার জন্যে সামাজিক সেবা কমিশন, শ্রমিকদের মোটামুটি উন্নত জীবন যাত্রার নিশ্চয়তা বিধানে 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইউনিয়ন' গঠনের অনুমোদন এবং নুতন শ্রম আইন পাশ করা হয়। তবে নুতন সরকারের চরিত্র এবং নীতির মনস্তাত্বিক প্রভাবই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন প্রতীয়মান হয়। সরকারের মধ্যে আদর্শবাদ এবং জনসেবার উদ্দীপনা সৃষ্টি; জনগনের মধ্যেও দীর্ঘদিনের হতাশা, ঘৃণার বদলে এই আস্থা গড়ে উঠে যে, ক্ষমতাসীনরা সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের পকেট ভারী করতে নয় বরং জনগনের মঙ্গালে নিবেদিত।

খুব শীঘ্রই জেনারেল নজীব এবং বিপ্লব পরিকল্পনার মুল নেতা কর্ণেল জামাল আবদুল নাসেরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। জেনারেল নজীব জনগনের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেন এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে তিনি তাঁর ক্ষমতাও সমানুপাতিক করতে চান, পক্ষান্তরে তরুন অফিসারেরা তাঁকে সামনে এনেছেন স্রেফ নামমাত্র নেতা হিসেবে রাখার জন্যে। মতবিরোধের আরেক কারণ জেনারেল নজীব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাংবিধানিক সরকারে ফিরে যেতে চান অথচ তা করতে গেলে পুরোনো রাজনৈতিক দলসমুহ ও রাজনীতিবিদদের ক্ষমতায় ফিরে আসা এবং বিপ্লবের অনেক অর্জনই বহুলাংশে অসমাপ্ত থেকে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এই বিরোধ প্রকাশ্যে সঙ্কটে রূপ নেয় ১৯৫৪'র ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের দিকে। শেষাবধি জেনারেল নজীব তাঁর সমস্ত ক্ষমতা এবং উপাধি প্রত্যার্পন করেন, এবং ৩৬ বছর বয়সের তরুন কর্ণেল জামাল আবদুল নাসের প্রধান মন্ত্রী ও সামরিক জান্তার প্রকৃত প্রধান হন। সংসদীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা বাতিল হয়,বিপ্লবী পরিষদ তার মিশন সার্থক করতে এগিয়ে চলে। পশ্চিমে, যেখানে সেনা অফিসার শ্রেণী মুলতঃ সমাজের রক্ষণশীল উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে সেখানে সিরিয়া, মিশরের বিপ্লবী সেনা সরকার সমুহ সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থে আর্থ-সামাজিক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে আসা বিস্ময়কর ঠেকতে পারে। কিন্তু যেমনটা চার্লস ঈসাওয়ী তাঁর 'মধ্যশতকে মিশর' বইতে দেখিয়েছেন- আরবদেশসমুহের সেনা অফিসারেরা মুলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসে এবং তাদের মধ্যে চরমপন্থী ঝোঁক থাকে। টয়েনবিও একই বাস্তবতা দেখেছেন মিশর এবং তুর্কির ক্ষেত্রে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে প্রাচ্য দেশ সমুহের পশ্চিমা সভ্যতায় উত্তোরন চেষ্টায় প্রায়শঃই সেনাবাহিনী হচ্ছে আধুনিকায়নের প্রথম প্রতিষ্ঠান, ফলতঃ স্বাভাবিকভাবেই তা পশ্চিমা সংস্কার ধারনারও অনুপ্রবেশের বাহন হয়ে দাড়ায়।

১৯৪৩ সাল থেকে ক্ষমতাসীন লেবানীজ প্রেসিডেন্ট যাঁর নেতৃত্বে দেশটা স্বাধীনতা অর্জন করে তাঁর পদচ্যুতিও ঘটে ১৯৫২ সালে। তাঁর অপসারান সরাসরি সিরীয়, মিশরীয় বিপ্লবের মত প্যালেস্টাইন বিপর্যয়ের ফল বলা না গেলেও , এতেও মুলতঃ পুরোন শাসকচক্রের দুর্নীতিতে আরব বিতৃষ্ণাই প্রকাশ পেয়েছে। প্যালেস্টাইন বিপর্যয়ের সময় সর্বত্র ক্ষমতায় থেকে এরাই সামাজিক,রাজনৈতিক অবক্ষয় বাড়িয়েছে যার মুল্য বাবদ আরবরা প্যালেস্টাইন হারিয়েছে। সিরিয়া,মিশরের উদাহরণই যে লেবানীজদের পথ দেখিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। লেবাননে সেনাবাহিনী তখনও কয়েক হাজার সদস্যের ছোট দল মাত্র সুতরাং তারা দেশের জীবন ধারা ও রাজনীতিতে সিরিয়া, মিশরের সেনাবাহিনীর মত গুরুত্ব পায়নি। লেবাননের তথাকথিত 'গোলাপজল বিপ্লব' সেনাচক্রের গোপন পরিকল্পনাপ্রসূত কোন অভ্যুত্থানের ফসল নয়, বরং এটা ছিল ব্যাপক গণ-অসন্তোষের কারণে এক সাধারণ ধর্মঘটের ফল। জনরোষের মধ্যেও প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে বসেছিলেন যতক্ষন না সেনাপ্রধান তাঁকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে বলেন; তবে ক্ষমতা দখলের কোন উদ্দেশ্য লেবানীজ সেনাবাহিনীর ছিলনা। তারা একটি জনসমর্থনহীন, দুর্নীতি পরায়ণ সরকারের স্থলে জনগনের পছন্দের সংস্কারপন্থী বেসামরিক রাজনীতিবিদদের কোয়ালিশনকে সামনে আসতে সহায়তা করেছে মাত্র।

প্যালেস্টাইনে আরবলীগের ব্যর্থতা এবং ফলশ্রুতিতে প্রকাশ হয়ে পড়া দুর্নীতি ও দুর্বলতার ব্যাপকতায় ক্ষমাতাসীন শাসক চক্রসমুহের মধ্যে শুধু ইরাক এবং সৌদী আরব রক্ষা পায়। তেল প্রাপ্তি এবং তা উত্তোলনে মার্কিন কলা-কুশলীদের আসা যাওয়া সত্বেও ধর্মতান্ত্রিক , স্বৈরাচার শাসিত সৌদী আরবের মধ্যযুগীয় সমাজ কাঠামোয় তখনও তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। দেশটিতে তখনও কোন রাজনৈতিক সচেতনতা কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেনি। জনগনের বিশাল অংশ তখনও যাযাবরবৃত্তিতে অভ্যস্থ; এবং এমনকি শহুরেরাও ইরাকী, সিরীয়, মিশরীয়দের মাপকাঠিতে অনেক পেছনে। দেশজুড়ে তখনও অবিসংবাদী ব্যক্তিত্ব ইবনে সউদ।

প্যালেস্টাইন পরাজয়ের ধাক্কা স্বত্বেও ইরাকে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ঠিকে থাকার কারণ সৌদী আরবের চেয়ে ভিন্ন এমনকি বিপরীতও। যুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে ইরাক যথেষ্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সেনা অভ্যুত্থান দেখেছে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সবচেয়ে বড় সেনা হস্তক্ষেপ (রশীদ আলী বিদ্রোহ) চরম ব্যর্থতায় শেষ হয়। আরেকবার 'রিজেন্ট' এবং বেসামরিক রাজনীতিবিদদের চ্যালেঞ্জ করার মত হারানো মান সম্মান সেনাবাহিনী তখনও পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। তদুপরি যুদ্ধের ঠিক আগে আগে 'পোর্টস মাউথ'চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ে জাতীয়তাবাদী উন্মত্ততায় ইরাকের শান্ত পরিস্থিতি হুমকির মুখে পড়ে। এভাবে অংশতঃ নিজেদের অতীত অস্থিরতার শিক্ষা থেকে, সবচেয়ে কম স্থিতিশীল আরব দেশটা প্যালেস্টাইন পরাজয়ের পরেও নিজেদের সংযত রাখতে সক্ষম হয়। তবে এতে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছে সম্ভবতঃ---১৯৪৮ পরবর্তী বছরে দেশের তেল সম্পদ থেকে অতিমাত্রায় রাজস্ব বেড়ে যাওয়ায় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি এবং নুতন সম্পদ ব্যায়ে তাদের সুচিন্তিত এবং জনকল্যাণমুখী ধ্যান ধারণা।

প্যালেস্টাইন যুদ্ধ নিয়ে ইয়েমেনের কিছু করার ছিলনা তথাপি এই দুর্গম,রহস্যঘেরা দেশটাতেও সংস্কারের আশা- আকাঙ্খাতাড়িত এক রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় ১৯৪৮ সালে। অধিকতর উদার সরকার গঠনে আগ্রহী এমন এক গোষ্ঠীর হাতে আগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন ইমাম খুন হন। কিন্তু ইমামের বড় ছেলে নুতন সরকারের পতন ঘটিয়ে নিজেকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করতে সমর্থ হন। বিপ্লবীদের ভয়ে তিনি রাজধানী সানায় খুব একটা প্রকাশ্যে বের না হলেও ,দৃশ্যতঃ পিতার মতই সর্ব কর্তৃত্বময় শাসন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যান।

(৪)

এক্ষণে আবার উত্তর আফ্রিকা তথা পশ্চিম আরব দুনিয়ার দিকে নজর দেয়া যাক। এখানে ইতালীর শাসন থেকে লিবিয়ার মুক্তি এবং নুতন এক আরবরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আরবদের অর্জন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই বৃটেন ইতালীর সাথে সম্ভাব্য বিরোধে, পশ্চিমের মরুভূমিতে বৃটিশ সেনাবাহিনীর অনুকূলে সাইরেনাইকার আরবদের সাহায্য আঁচ করতে পারে । ইতালী কর্তৃক কায়রোতে নির্বাসিত কিছু গণ্যমান্য লিবীয় নাগরিক তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে বৃটিশদের সাহায্য করার প্রস্তাব নিয়ে আসে। এ উদ্যোগ, ক্ষুদ্র পরিসরে ১৯১৪ সালে কায়রোতে লর্ড কিচেনারের সাথে হোসেইন এবং তার ছেলে আবদুল্লাহর যোগাযোগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আলোচনা আরও গুরুত্ববহ হয়ে উঠে যখন সাইরেনাইকার আরব ধর্মীয় নেতা ইদ্রিস আল সেনুসি (দেশে আরব রাষ্টের একমাত্র সম্ভাব্য রাষ্ট্র প্রধান)তাতে এসে যোগ দেন। মিশর থেকে বৃটিশ সৈন্যদের সহায়তা করতে লিবীয়দের নিয়ে একটি পশ্চিমাঞ্চলীয় আরব বাহিনী গঠন করা হয়। কিন্তু সাইরেনাইকা থেকে পুরো বৃটিশ সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসারনের উপক্রম হলে পুরো আরব জনগন থেকেই সাহায্য আসে। জার্মান আক্রমনে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বৃটিশ সৈন্যদের আশ্রয়, খাদ্য এবং (পুনঃরায়) মরুভুমিতে তাদের ইউনিটে পৌঁছে দেয় আরবরা।

১৯৪২ সালে ফরেন সেক্রেটারী হিসেবে ইডেন ঘোষনা করেন,'যুদ্ধশেষে বৃটিশ সরকার কোনভাবেই সাইরেনাইকার সেনুসীদের পুনঃরায় ইতালীয়দের কর্তৃত্বাধীনে পড়তে দেবেনা।'

যুদ্ধশেষে লিবীয়াকে নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। দেশটা সাইরেনাইকা, ত্রিপোলিতানিয়া, এবং ফেজান প্রদেশ নিয়ে গঠিত অথচ ইডেনের ওয়াদায় কেবল সাইরেনাইকার কথা উল্লেখিত। রাজধানী শহর ত্রিপোলিতানিয়ার এক বিশাল জনগোষ্ঠী ইতালীর সাথে ইউনিয়ন গঠনের দাবী করে; যুদ্ধ শেষে ইতালী কোন ফ্যাসিস্ট দেশ নয় বরং এমন এক গনতন্ত্রী যার শুভেচ্ছা পেতে বৃটেন, আমেরিকা উভয়েই উদ্বিগ্ন।

স্বাভাবিক ভাবেই ইতালী ত্রিপোলিতানিয়ার ইতালীয়দের দাবী সমর্থন করে এবং লিবিয়ার এই অংশের উপর জোর দাবী জানায়। মুক্ত ফরাসী বাহিনী ফেজান প্রদেশ স্বাধীন করতে সহায়তা করেছে সে দাবীতে ফ্রান্স ফেজান চায়। উত্তর আফ্রিকায় আরব প্রদেশ দখল করতে পারে ভয়েও ফ্রান্স লিবিয়ার স্বাধীনতার দাবীর বিরোধীতা করতে থাকে। লিবিয়া তিউনিসিয়ার সাথে মার্চ করতে থাকে যাতে স্বাধীনতা অর্জন করে আরব স্বাধীনতার ফ্রন্টিয়ারকে একটা মালার মতো মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া হয়ে পশ্চিম আরব বিশ্বের দিকে নিয়ে আসতে পারে এবং যার অপর প্রান্ত মিশর হয়ে সিরিয়া,ইরাকের মধ্য দিয়ে উপদ্বীপ পর্যান্ত বিস্তৃত থাকে।

পরস্পর বিরোধী দাবীর মুখে এক সময় এমন বিপদও দেখা দেয় যাতে মনে হয় মাত্র* ১ মিলিয়ন জনসংখ্যার মুলতঃ যাযাবর প্রধান এই ক্ষুদ্র, দরিদ্র আরব দেশটি ১৯১৯ সালের পূর্বাঞ্চলীয় আরব বিশ্বের অথবা ১৯৪৮ সালের প্যালেস্টাইনের ভাগ্য বরন করতে যাচ্ছে। আরবদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু অনৈক্য , সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে সৈয়দ ইদ্রিস আল সেনুসীকে সমগ্র লিবিয়ার রাজা হিসেবে মেনে নিতে অসম্মতির কারণে এই বিপদ আরো ঘনীভূত হয়। অবশেষে সব আশঙ্কা মিথ্যে প্রতিপন্ন করে জাতিসংঘে এবং দেশের ভেতরেও একটা সমঝোতা স্থাপিত হয়। ফলতঃ ১৯৫১ সালের শেষের দিকে সেনুসির অধীনে স্বাধীন ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে লিবিয়ার আবির্ভাব ঘটে। এসময় লিবিয়ায় বিভিন্ন পেশায় দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজনের বড়ো অভাব, এবং বাইরের সাহায্য প্রয়োজন। সহযোগীতা চুক্তি সম্পাদন পুর্বক বৃটেন সে সাহায্যে এগিয়ে আসে,পূর্বাঞ্চলীয় আরব দেশসমুহ বিশেষতঃ মিশর থেকেও সে সাহায্য আসে।

লিবিয়ার স্বাধীনতা অর্জন ফরাসী জবরদখলকৃত উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতে জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণা। ইতোপুর্বে ফরাসী শাসনাধীন সিরিয়া , লেবাননের স্বাধীনতা অর্জনও একই

প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। আরবলীগের গঠনও সেই প্রথম দিন থেকেই পশ্চিম আরব বিশ্বে আশার সঞ্চার করে এসেছে। একই ভাবে ফ্রান্সের পতন এবং তার জার্মান দখলে চলে যাওয়া উত্তর আফ্রিকানদের চোখে ফরাসীদের হীনবল প্রতিপন্ন করে।

উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন সেনা অবতরন,প্রচার প্রচারনা সেই রঙ্গামঞ্চে শুধু অক্ষশক্তিকে ধ্বংসই করেনি তদস্থলে , সেই একান্ত ফরাসী সংরক্ষিত এলাকায় এ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভাবকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেখানে চার্চিল , রুজভেল্টের যাওয়া-আসা ঘটেছে; রুজভেল্ট মরক্কোর সুলতানের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তিনি মরক্কোর আশা-আকাঙ্খার প্রতি দরদও দেখিয়েছেন। সর্বোপরি সে সময় আটলান্টিক চার্টার এবং যুদ্ধকালীন অন্যান্য ঘোষনাসমুহে গণতান্ত্রিক সরকার শাসিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমুহের সাধারণ এক বিশ্বের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে; এবং যুদ্ধ শেষে জাতিসংঘের মঞ্চে শুধুমাত্র পুর্বাঞ্চলীয় আরবদেশসমূহই নয় বরং উপনিবেশবাদ বিরোধী সহানুভূতিতে বিখ্যাত ভারত ও পাকিস্তানের মত দু'টি দেশেরও উত্থান ঘটেছে।

পুরো যুদ্ধকালীন সময়ে মরক্কো মিত্রপক্ষের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন আচরন করেছে, জার্মান নির্দেশে ফরাসী চোখ রাঙানির মুখেও তাদের ঘোষিত মুলনীতি সমূহ ধারন করেছে; যেমন ভিশি সরকারের সময়ে মরক্কোর সুলতান সেমেটিয় বিরোধী উদ্যোগ নিতে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মরক্কোবাসী যুদ্ধশেষে তাদের আশা-আকাঙ্খার স্বীকৃতি প্রত্যাশা করেছে, যদিও জাতীয়বাদী আন্দোলনের মাধ্যমে সিকি শতাব্দী যাবৎ তারা সংস্কারের বেশী কিছু দাবী করেনি। কিন্তু ফরাসীদের কাছ থেকে পর্য্যাপ্ত সাড়া পায়নি। খুব কম মরোক্কানরা উচ্চতর শিক্ষা কিংবা প্রশাসনে দায়ীত্বশীল পদের সুযোগ পেয়েছে। দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্টানসমূহ দুর্বলভাবে অচলাবস্থায় পড়ে থেকেছে। ফরাসীদের নির্মিত সুন্দর সুন্দর শহরগুলোর চারপাশে ফরাসী শিল্পোৎপাদকদের স্থানীয় শ্রমিক চাহিদা মেটাতে কেরোসিন টিন, প্যাকিং বাক্সের কাঠে তৈরী বস্তি শহর, বেদুইনপল্লী গড়ে উঠেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ের খুব সামান্য অংশই ফরাসী বসতি স্থাপনকারীদের তুলনায় সংখ্যানুপাতে মুর জনগনের ভাগে পড়েছে।

১৯৪৪ সালের দিকে সংস্কারের হতাশায়, জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতাকেই তাদের লক্ষ্য নির্ধারন করে এবং তাদের দলের নাম এ্যকশন মরক্কান থেকে বদলে রাখে 'ইশতিকলাল' যার অর্থ স্বাধীনতা। তখনি দলের নেতা আল পা'সি এবং মহাসচিব বেলফারেজ গ্রেফতার হন এবং কিছু রক্তপাতের ঘটনাও ঘটে। এর মধ্যদিয়ে মরক্কোর ইতিহাসে ফরাসীদের সাথে সুলতান মুহম্মদের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান লড়াইয়ের এক নুতন অধ্যায়ের সুচনা হয়।

ফরাসী সরকারের (অন্ততঃ মঁসিয়ে ম্যান্ডেজের ফরাসী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসা পর্য্যন্ত) প্রতিটি উদারবাদী পদক্ষেপই মরক্কোর ফরাসী কর্মকর্তা এবং বসতি স্থাপনকারীরা এবং তাদের সহযোগী , মারাকেশ এর পাশা আল গ্লাউইদের মত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী নেতাদের সম্মিলিত অসহযোগীতায় ব্যর্থ হতে থাকে। এই দ্বন্ধ চলা কালে মরক্কোর ফরাসী কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ফ্রাঙ্কো-মরোক্কান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যেখানে ফরাসী সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে মরক্কো ফরাসীদের নিয়ন্ত্রণে কিছু স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করবে, তিন লাখ ফরাসী বসতি স্থাপনকারী *আট মিলিয়ন মরোক্কানদের সমান সমান ক্ষমতা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে আরব জাতীয়তাবাদীরা চায় স্বাধীন মুসলিম মরক্কো যেখানে ফরাসী বসতি স্থাপনকারীরা বিদেশীর মর্য্যাদায় থাকবে। তারা অব্যাহত ফরাসী সাংস্কৃতিক প্রভাব কামনা করে তবে রাজনৈতিক প্রভাব নয়। রাজনৈতিক সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকে মত কিংবা মরোক্কানদের সামান্য অধিকতর সম্মানের পদ দেয়ার মত সংস্কারও তারা চায়না।

১৯৪৬ সাল থেকেই বুঝা যাচ্ছিল যে সুলতান তাঁর দেশের স্বাধীনতায় নেতৃস্থানীয় ভুমিকা পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এবং তাতে তিনি সিংহাসন হারানোর ভয়েও ভীত নন। সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনাতেও তিনি অগ্রসর, বিশেষতঃ

জাতীয়তাবাদীদের মূল দাবীর অনুকূলে আরবী মাধ্যমের স্কুল প্রতিষ্টার উৎসাহ প্রদানে। নিজের ছেলে-মেয়েদের ফরাসীর পাশাপাশি আরবীতে শিক্ষিত করে ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি উদাহরণ সৃষ্টি করেন।

ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় সফরে ১৯১২ সালের চুক্তির বদলে নুতন চুক্তির জোরালো প্রস্তাব ফরাসী সরকার প্রত্যাখ্যান করলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মরক্কোর ফরাসী কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর বিরোধ লাগতে খুব বিলম্ব হয়নি । ১৯৫২-৫৩ সালের শীতে প্রথম বারের মত, জাতিসংঘের অধিবেশনে মরক্কোর বিষয় আলোচনায় এলে জাতীয়তাবাদীরা আন্তর্জাতিক ভাবে নৈতিক সাফল্য পায়। এশীয়-আরব ব্লকের চেষ্টায়, এবং ফরাসী বিরোধীতার মুখে মরক্কোর স্বাধীনতার বিষয় আলোচনায় পরিষদকে রাজী করানো হয়। ফরাসী প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ কার্য্যক্রমের রুশ ম্যানুয়েলের পাতা ছিঁড়ে বিতর্কে অনুপস্থিত থাকে। বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যাওয়ার অনীহায় আলোচনায় কোন সিদ্ধান্ত হয়না।

এই বাস্তবতা মরক্কোর ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীলদের অনুপ্রাণিত করে; আল গ্লাউই বার্বার উপজাতীদের ব্যবহার করে সুলতানকে দেশ থেকে বহিস্কারের দাবী জানায়। জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনা ধারণ করার দায়ে সিংহাসন হারিয়ে , পরাক্রমশালী শক্তির কাছে মাথা নত করে পঞ্চম মোহাম্মদ কর্সিকায় স্থান পান। তদস্থলে তাঁর পরিবারের এক বয়োঃবৃদ্ধ সদস্য সুলতান হন। খুব শিঘ্রই নুতন সুলতানকেও খুন করার চেষ্টা হয় এবং তখন থেকেই জাতীয়তাবাদীদের সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড বৃদ্ধি ,এবং তা দমন করতে ফরাসীদের অধিকতর শক্তি প্রয়োগ সব মিলিয়ে মরক্কো অগ্নিগিরি হয়ে উঠে। ১৯৫৩ সালে সুলতানের বহিষ্কারের পর নেমে আসা দমন পীড়ন, মরক্কোয় ফরাসী বসতি স্থাপনকারী এবং কর্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাবের ফলে উদারবাদী ফরাসী চেতনা থেকে সৃষ্ট কঠোর প্রতিবাদের বিস্তৃত বিবরন পাওয়া যায় বিখ্যাত ক্যথলিক লেখক ফ্রাঁসোয়া মরিসের লেখনীতে।

ফরাসী মরক্কোতে চলমান এই ফ্রাঙ্কো-আরব বিরোধের হাস্যকর এবং এক অদ্ভুত ধারাবাহিকতা শুরু হয় স্প্যানিশ এলাকায়। ইউরোপে নিজেকে অনভিজাত, একাকী বিবেচনায় জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্যালেস্টাইন বিষয়ে পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রতি আরবদের তীব্র বিতৃষ্ণাকে পুঁজি করে আরবলীগের সাথে সম্পর্ক জোরদার করতে চেয়েছেন। আরব রাষ্ট্রসমূহেরও নিজস্ব অবস্থান বিচারে ফ্রাঙ্কোকে অপছন্দ করার নয়। যেহেতু শুধু পশ্চিমা গণতন্ত্রীরা নয় বরং রাশিয়াও প্যালেস্টাইন ইস্যুতে বিরোধীদের কাতারে, তাই আরবরাও এশিয়ার বাইরে পৃথিবীতে একা। অতএব, ফ্রাঙ্কোর উদ্যোগে তারা বরং খুশী। রাজা আবদুল্লাহ স্পেন সফরে যান, তাতে বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়।

মুলতঃ রাজনৈতিক এবং একান্ত নিজস্ব স্বার্থে হলেও স্পেনের এই পশ্চাদপসারন প্রমাণ করে গত শতকের হিস্পানো-আরব সভ্যতার সোৎসাহে পুনঃযাত্রা শুরুর পক্ষে স্পেনের বুদ্ধিজীবি এবং ঐতিহাসিকবৃন্দের চিন্তা চেতনার নুতন ধারা এবং একই ভাবে স্পেনের বিভিন্ন খ্রীশ্চান এবং মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশে থেমে থেমে বিরোধ চলার মধ্য দিয়েও তারা আরো বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে একত্রে বসবাস করতে চায়।

মরক্কোয় স্পেনের অদ্ভুত সাংবিধানিক মর্য্যাদা ছিল ইতিহাস ভূগোল থেকে অনেক দূরে, ১৯০৪ সালে ফ্রান্সের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে। মরক্কোর *এক মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত(মোট জনসংখ্যার এক অষ্টমাংশ) একটুকরো ভূমিতে স্পেনের মর্য্যাদা দেশের বাকী অংশে ফ্রান্সের মর্য্যাদার সমতূল্য। খোদ সুলতানের সাথে স্পেনের কোন চুক্তি না থাকলেও স্প্যানিশ এলাকায় খলিফা (প্রতিনিধি) র উপস্থিতির মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে দেশের অখন্ডতা রক্ষা হয়েছে। খলিফা এবং স্প্যানিশ রেসিডেন্ট জেনারেল পারস্পরিকভাবে সমান মর্য্যাদা ধারণ করেছেন।

স্পেনীয়দের সাথে কোন আলোচনা ছাড়া ফরাসীরা খলিফাকে দেশচ্যুত করায় স্পেনীয়রা অপমানিত হওয়ার বদলে বরং আরবদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর আরও একটা সুযোগ পেয়ে যায়। এসব আপাতঃবিরোধী

পরিস্থিতিতে মরক্কোয় এমন এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে, স্ব-স্ব এলাকায় স্পেনের ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র ফরাসী ফোর্থ রিপাবলিকের গণতন্ত্রের চেয়েও অধিকতর উদারবাদী নীতি অনুসরন করে। তবে এসবের অর্থ এ' নয় যে, স্পেনীয়রা তাদের এলাকায় খুব শিগগির স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত। তারা অবশ্যই এমন এক ভবিষ্যতের কথা বলেছে যখন মরক্কোর জনগন অতীত স্মৃতির বন্ধনে স্পেনের সাথে বন্ধুত্ব অব্যাহত রেখে , যথার্থ যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে নিজেরাই নিজেদের শাসন করবে।

মুর এবং স্পেনীয়দের যৌথ সার্বভৌমত্ব অথবা যৌথ নাগরিকত্বের লক্ষ্যেও তারা কোন পলিসি খাটায়নি। মরক্কোর স্প্যানিশ এলাকায় সরকারী স্কুলসমূহে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া সাপেক্ষে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম আরবী,এবং আরবী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থাও রয়েছে। পক্ষান্তরে ফরাসী এলাকায় শিক্ষাপ্রদানের মাধ্যম ফরাসী,শুধু একটা বিষয় হিসেবে আরবী পড়ানো হয়। স্প্যানিশ এলাকায় সরকারী স্কুলের হেডমাস্টার মরোক্কান, দুরত্ব বজায় রেখে একজন স্প্যানিশ 'এসেসর' স্কুলের ভাল-মন্দ নজর রাখেন; ফরাসী এলাকায় হেডমাস্টার ফরাসী বাকী শিক্ষকরা মরোক্কান শিক্ষকের বেশী কিছু নন। স্প্যানিশ এলাকা যদি গরীব হয় তাহলে এর দারিদ্র্য স্বাভাবিক, এবং তা মরোক্কান, স্প্যানিশ উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্থ করে। রাবাত , কাসাব্লাঙ্কার মত বিত্ত-বিলাশের শহরের বাইরে এখানে টিন-ক্যান বস্তি শহরের মত ব্যাবধান দেখা যায়না।

মরক্কো থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হলে দেখা যাবে স্থানীয় পরিবেশ , প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আলাদা আলাদা চরিত্র হলেও আলজেরিয়া, তিউনিসিয়াতেও আরব জাতীয়তাবাদ এবং ফরাসী উপনিবেশায়নের মধ্যে একই দ্বন্ধ প্রায় একই স্তরে বিরাজমান। নেভিল বার্বার উত্তর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমগ্র ,এবং আলাদা আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন আলজেরীয় জাতীয়তাবাদ একটি বিশেষ স্বপ্নভঙ্গের তিক্ততায় বিশেষায়িত। এখানে* ৮ মিলিয়ন আরবের মধ্যে ফরাসী বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা শুধু যে ১ মিলিয়নে পৌঁছেছে তা নয় বরং ফ্রান্সের সাথে পুরোপুরি মিশে যাওয়া এবং আরব ও ফরাসীদের মধ্যে নাগরিক সমতার নীতিও সততার সাথে অনুসরন করা হয়নি। সমতার কথা শুধু তত্বে থেকে যায়।

আরব জনগনের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সাধারণ জীবনমান ফরাসী বসতি স্থাপনকারীদের তুলনায় এতটাই নীচে যে প্রকৃতপক্ষে খুব কম ক্ষেত্রেই আলজেরীয়রা সরকারী উচ্চপদে উঠতে পারে। আলজেরীয়রা নিজেদের প্রতারিত ভেবেছে, তারা ভেবেছে সরাসরি ফরাসী প্রশাসন যথাযোগ্য ক্ষতিপূরন না দিয়ে স্থানীয় আরব প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নতি বাধাগ্রস্থ করেছে, ধ্বংস করেছে। মুসলিম হিসেবে একজন আলজেরীয়ানের ব্যক্তিগত মর্য্যাদা প্রত্যাহার এবং বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সিভিল কোর্টের বৈধ কর্তৃত্ব গ্রহন করার শর্তে ফরাসী নাগরিকত্ব পাওয়ার সুবিধা দৃশ্যমান মহত্বকে ম্লান করে দেয়।

সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ফরাসীরা পুরো জনগনের মধ্যে ফরাসী ভাষা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। কিছু শিক্ষিত মুসলিম তা ভালভাবে শিখলেও বাকী জনগন স্রেফ ভাঙ্গা-চোরা খটমটই শিখেছে। ইতোমধ্যে জনগনের মাতৃভাষা আরবীর মান পড়ে গিয়েছে। আরবদেশগুলোর মধ্যে একমাত্র আলজেরিয়াতেই সম্প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ধ্রুপদী আরবীর বদলে কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যুদ্ধকালীন সময়ে মিত্রশক্তি কর্তৃক অনেক প্রতিশ্রুতির বিপরীতে খাদ্যাভাব, ব্যাপক অসন্তোষ ১৯৫৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের জন্ম দেয়। এতে ফরাসী নিহতদের সংখ্যা ৮৮ এবং আহত ১৫০ জন। ফরাসী কর্তৃপক্ষ বোমা,বুলেট, বেয়নেটে নারী-পুরুষ,যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ১৫০০ আরব (দায়ীত্বশীল হিসেবে সংখ্যাটা ৮০০০ এর মত)কে খুন করে।

১৯৪৭ সালের সংবিধি মোতাবেক আলজেরিয়ায় প্রতিশ্রুত বিপুল সংস্কার কর্মসূচীর খুব সামান্যই বাস্তবে সম্পাদিত হয়। তত্বগতভাবে মুসলিমরা প্রশাসন ও বিচার বিভাগে উচ্চ পদের জন্যে যোগ্য বিবেচিত হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ কম হওয়ার অভিযোগ থেকে যায়। নির্বাচনে সব আলজেরীয়দের অধিকার থাকলেও প্রশাসনের ফলাফল কারচুপির মুখে তা মূল্যহীন হয়ে যায়। একই সংবিধি মোতাবেক আলজেরীয়রা বিনা

বাধায় ফ্রান্সে যাওয়ার সুযোগ পায়। চাকরী এবং উন্নত জীবনের খোঁজে সেখানে হাজারে হাজারে গিয়ে তারা অভিবাসনের ফলস্বরূপ দেশের দুঃখ দুর্দশার বাড়তিই পেতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে তিউনিসিয়ার উত্থান ঘটে আলজেরিয়া কিংবা মরক্কোর চেয়ে অধিকতর অগ্রসর আরব জনগন, অধিকতর পরিপক্ক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমৃদ্ধ হয়ে। আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত তিন আরব রাজ্যের মধ্যে তিউনিসিয়া বরাবরই বাকী রাজ্যদ্বয়ের চেয়ে অগ্রগামী। জনসংখ্যা *তিন মিলিয়ন আরব, দুই লক্ষ ফরাসী বসতি স্থাপনকারী। এই দেশ মরক্কোর মত বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একটানা মধ্যযুগের খাঁচায় বন্দী নয়; বরং পূর্বাঞ্চলীয় আরব এবং ইউরোপীয় বিশ্বের কাছাকাছি হওয়াতে উভয় বিশ্বেরই ভাল দিক গুলো যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করতে পেরেছে। দেশে আরবী সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র মসজিদ-বিশ্ববিদ্যালয় জয়তুনা এবং এর শিক্ষার মানও সর্বোচ্চ।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে মিশর এবং লেবাননে শুরু হওয়া জ্ঞানের পূর্ণজাগরণে তিউনিসিয়াও সংশ্লিষ্ট। এখানে পশ্চিমা প্রভাবের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে প্রথমে ইতালীয় এবং পরে ফরাসী প্রভাব মরক্কোর চেয়ে আরো গভীরে, আরব এবং ইউরোপীয় উভয় সভ্যতার দ্বৈত ঐতিহ্যের শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক অতি অগ্রসর বুদ্ধিজীব শ্রেণীর বিকাশ ঘটায়। এই দ্বৈত সংস্কৃতির মেলবন্ধনের চিত্রই ফুটে উঠে প্রাক্তন শেখ আল ইসলামের মেয়ে বশীরা মুরাদের নেতৃত্বে আধুনিক নারীবাদী আন্দোলন এবং 'নিউ দস্তুর' পার্টির নেতা হাবিব বরগুইবার মধ্যে, যাঁর জন্মগত দক্ষতা যেমন আরবীতে লেখা এবং বক্তৃতায় তেমনি ইউরোপীয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক হাতিয়ারেও (ফরাসী স্ত্রীর কথা নাহয় বাদ থাক)।

তিউনিসিয়ার নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫ সালে আরবলীগ প্রতিষ্টায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। লীগ প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে পশ্চিম আরব বিশ্বের সাথে যোগাযোগে সমন্বয় সাধন করতে। তাই শুরুতেই প্রচন্ড আশাবাদী তিউনিসীয় নেতৃবৃন্দ কায়রোয় মাগরেব অফিসে খুব সক্রিয় হয়ে উঠেন। প্যালেস্টাইন বিপর্যয় এবং লীগের টাল মাটাল অবস্থা 'নিউ দস্তুর' নেতাদের পলিসিতে মেরুকরণ আনে। তাঁরা আবারও ফরাসী কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। এই আশা আকাঙ্খার অন্যতম তিউনিসিয়ার এমন সার্বভৌমত্বের পুনঃনিশ্চয়তা যাতে তা শুধু 'বে' বংশের মধ্যে আটকে না থেকে পুরো জাতীর কল্যাণে আসে।

অর্থাৎ তাদের কামনা--তিউনিসীয় জাতীয় সংসদের সৃষ্টি এবং আভ্যান্তরীন সর্ববিষয়ে স্বায়ত্বশাসনের চর্চা । অধিকাংশ তিউনিসীয় নেতাই চান প্রয়োজনীয় সময় পর্য্যন্ত বিদেশ নীতি এবং প্রতিরক্ষার বিষয় ফরাসীদের হাতে থাক। যে স্বাধীনতা সিরিয়া এবং লেবানন নিঃশর্তে অর্জন করেছে, মিশর এবং ইরাক অর্জন করেছে নিজ ভুমিতে বৃটিশ সেনা ঘাঁটি রাখার শর্তে, তিউনিসিয়ার চাওয়া স্বাধীনতার ব্যাপকতা তারচেয়ে কম; এমনকি মরক্কোর 'ইশতিকলাল' পাটির আন্দোলন কিংবা মেসালি হাজীর নেতৃত্বে আলজেরিয়ার অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর দাবীর চেয়েও কম।

১৯৫০ সালে 'নিউ দস্তুর' পার্টিকে সরকারে অন্তর্ভুক্ত করে তিউনিসীয় নেতাদের এই দাবীকে ফরাসীরা মর্য্যাদা দেন; তখনও ফরাসী রেসিডেন্ট জেনারেল 'বে'র কার্য্যকলাপে নজরদারী করেন। দুঃখজনকভাবে এই পদক্ষেপের পর একই লক্ষ্যে আর কোন উদ্যোগ আসেনি, অধিকন্তু 'নিউ দস্তুর' এবং ফরাসীদের সাথে টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়। ফরাসীদের অভিযোগ তিউনিসীয় নেতারা সরকার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের চেষ্টার চেয়ে আরও বেশী সুবিধা আদায়ের উস্কানীতে সুযোগের ব্যবহার করছে। তিউনিসীয়দের অভিযোগ, ফরাসীরা একহাতে যা দিচ্ছে অন্যহাতে তা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফরাসীরা তিউনিসীয়দের সাথে যৌথ সার্বভৌমত্বকে আইনগত বৈধতা দেয়ার উদ্যোগ নিলে সঙ্কট ঘনীভূত হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এই বিধানকে নীতিগত বৈধতা দিতে তিউনিসিয়রা তখনও অনিচ্ছুক।

১৯৫১ সালে বিরোধ,বিশৃঙ্খলার অনুগামী হয় ধরপাকড়,এবং জাতীসংঘের কাছে তিউনিসিয়ার দেন দরবার। জাতীয়তাবাদীদের দমন পীড়ন সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের জন্ম দেয়, অপরপক্ষে ফরাসী বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যেও জন্ম নেয় পাল্টা সন্ত্রাস। ১৯৫২-৫৪ সালে মরক্কো এবং তিউনিসিয়া উভয় দেশে জাতীয়তাবাদীদের সাথে ফরাসীদের সংঘাত এমন এক রূপ ধারন করে যাকে গৃহযুদ্ধ সন্ত্রাসবাদ বলা যায়। ব্যক্তিগতভাবে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় শঙ্কিত ফরাসী বসবাসকারীরা প্যারিস সরকারের নীতির চেয়ে অনেক কম উদারবাদী , তারা স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় সংস্কারের বদলে নিপীড়ন,গোপনে আরবদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সহিংস আক্রমণে জড়িয়ে পড়ে। নেভিল বার্বার তাঁর বইতে এমনও লেখেন 'আলজেরিয়ায় বসতি স্থাপনকারীরা (মোট জনসংখ্যার ১: ৮) মেট্রোপলিটন ফ্রান্স তাদের বিসর্জন দিয়েছে মনে করলে , দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের মত ইউরোপীয় প্রাধান্যে সরকার গঠনের পথও নিতে পারতো।'

১৯৫৪ সালে তিউনিসিয়ার অচলাবস্থা ভাঙ্গেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ম্যান্ডেজ ফ্রান্স। ক্ষমতায় এসেই তিনি উত্তর আফ্রিকায় বাস্তবমুখী নীতি অনুসরণের ঘোষনা দেন। পুরো উত্তর আফ্রিকা জুড়ে জাতীয়তাবাদী প্রেরনায় প্রভাব বিস্তারী ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তিতে কুড়ি মাসের ভেতর মিশর থেকে বৃটেনের সেনা প্রত্যাহারের ঘোষনায় তাঁর এই বাস্তবতাবোধ উৎসাহিত হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। সে যাই হোক তিউনিসিয়ায় যৌথ সার্বভৌমত্ব চাপানোর উদ্যোগ বাদ দিয়ে ফ্রান্স বসতি স্থাপনকারীদের স্বার্থ রক্ষায় কতিপয় শর্তে তিউনিসিয়ায় আভ্যান্তরীণ সর্ববিষয়ে স্বায়ত্বশাসন, সব পরিষদে 'নিউ আল দস্তুর' কে অংশ দিতে সম্মতির ঘোষণা দেয়। বিনিময়ে 'নিউ আল দস্তুর' প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ফ্রান্সের হাতে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর বাস্তবমুখী পলিসি ঘোষনায় মরক্কোর কথা থাকলেও বাস্তবে এখানে তা কার্য্যকর করার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়না। এখানকার পরিস্থিতি তিউনিসিয়ার চেয়েও জটিল। বিশেষতঃ মরক্কোর জাতীয়তাবাদীদের মুল দাবী পুর্ণ স্বাধীনতা দিতে ফরাসী বাস্তবতাবোধ অবশ্যই অপ্রস্তুত। তদুপরি ১৯৫৩ সালে সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদকে বহিষ্কার এবং তদস্থলে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যকে বসানোয় একটা বংশানুক্রমিক ধারার সৃষ্টি হয় । সুলতান মোহাম্মদ বেন আরাফা (যিনি নিজেকে চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত ভাবতেন, শত্রুতায় অবসন্ন) সিংহাসন ত্যাগে রাজী হতেও পারতেন কিন্তু ফরাসীরা তাঁর পরবর্তী বংশধরদের তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে দেবেন কিনা তাতে ঘোর সন্দেহ। পঞ্চম মোহাম্মদের ছেলেকে প্রার্থী হিসেবে সামনে আনা যায় কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা তাতে রাজী না হলে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়না।

শেষতঃ মরোক্কানরাও তিউনিসীয়দের মত আধুণিক প্রশাসনের কলা কৌশলে ততটা অগ্রসর নয় এবং দেশে বিবাদ-বিসংবাদের উপাদানও যথেষ্ট বেশী। সুতরাং স্বৈরতন্ত্রে পতিত হওয়ার মারাত্মক ঝুঁকিবিহীন ভাবে তারা আভ্যান্তরীন সর্ব বিষয়ে আশু নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে পারবে কিনা তাতে সন্দেহ থেকেই যায়। এই বক্তব্য শুধু ফরাসীদের নয় বরং অনেক দেশপ্রেমিক মরক্কোবাসীরও। সত্য বটে মরোক্কানদের প্রশাসনিক ও কারিগরী পশ্চাদপদতার জন্যে বহুলাংশে ফরাসীরাই দায়ী। অর্ধশতাব্দীর ফরাসী শাসন জাতীয়বাদীদের একটা যুক্তিসঙ্গত অবস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে তর্কের খাতিরে এমন বলা গেলেও তা চলমান সমস্যা সমাধানে কোন সহায়তা করেনা।

সবচেয়ে বড় যে আশা করা যায়, ফরাসী পলিসির উদ্দেশ্যে ও কেন্দ্রে দৃশ্যমান ,বৈপ্লবিক পরিবর্তন; আশা আকাঙ্খার পুর্ন বাস্তবায়নের জন্যে জাতীয়তাবাদীদের অপেক্ষা করতে রাজী হওয়া। আশু স্বাধীনতা যতি অবাস্তবও হয় পুর্ন স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে তাকে একটা পলিসির মাধ্যমে ধাপে ধাপে তৈরী করা যেতে পারে যার অর্থ হবে অনেক ব্যাপক---জনগনের জন্যে উন্নত এবং দ্রুত শিক্ষা ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের আয়োজন ইত্যাদি। তবে এর জন্যে ফরাসীদের কাছে মরক্কোর স্বাধীনতার মুলনীতি গৃহীত হওয়া এবং তার মর্মে পৌঁছানোর জন্যে মরোক্কানদের কিছু বিলম্ব স্বীকারে সম্মত থাকতে হবে।

(৬ষ্ঠ অধ্যায়)

ভবিষ্যতের পথে

ইতিহাসের সর্বব্যাপী আরব অনুসন্ধানে আমরা এমন এক বর্তমানে এসে পেঁছেছি যেখানে আরবদের অর্জন রোম অথবা গ্রীস থেকে মহত্তর। পৃথিবীতে আজ গ্রীক বিশ্ব , রোমান বিশ্ব নেই কিন্তু আরব বিশ্ব আছে। প্রাচীন গ্রীকরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ছড়িয়ে পড়ে আবার উৎপত্তিস্থলেই ঠাঁই নিয়েছে। গ্রীস এবং তদসংলগ্ন দ্বীপ ছাড়া তাদের ভাষায় এখন আর কেউ কথা বলেনা। একইভাবে রোমানরাও আর রোমান নেই, তাদের ভাষা মৃত। কিন্তু আরবদের বিষয় পুরোপুরি ভিন্ন। তারা এখনও পুরো উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে সার্বজনীন সমাজ হিসেবে বসবাস করে। কিছু ভিন্নতা, সামান্য ব্যতিক্রম স্বত্বেও তারা সর্বত্র আরবীতে কথা বলে এবং নিজেদের আরব পরিচয় দেয়। লেবাননের বৈরুতে বিদেশী "ফ্রাঙ্গদের" থেকে নিজেদের আরব সন্তান, আরবদুহিতা পরিচয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার দাবী এখনও সমান অব্যাহত।

আরব বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা *এখন ৬৫ মিলিয়ন। দীর্ঘকালের আবদ্ধতা, জড়তা ভেঙ্গে এখন তা উপচে পড়া নদীর মত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু এই যাত্রার গন্তব্য কোথায় , পথের প্রতিবন্ধকতা কোথায়? গত একশতক জুড়ে পশ্চিমের সাথে নানাভাবে মেলা মেশাই আরব জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য । আরব জনগন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই করার মধ্যেও জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে পশ্চিমা প্রভাব আত্তীকরণ করেছে, ইউরোপের সাথে অভেধ্য যোগাযোগ প্রতিষ্টা করেছে। এটা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘাত মুসলিমদের জন্যে পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহনে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে যেহেতু ইতোমধ্যেই তা মুসলিমদের চোখে খ্রীশ্চান সভ্যতা হিসেবে পক্ষপাতদুষ্ট। সংস্কারবাদী আদর্শ এবং পশ্চিমা জীবনধারার বিপরীতে মুসলিম মূল্যবোধের পুনঃস্থাপনে মুসলিম ব্রাদারহুডের মত আন্দোলন , বিদেশী রাজনৈতিক এবং সেনাকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এক শক্তিশালী নতুন মাত্রা যোগ করে।

এই আন্দোলন মুলতঃ শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্তের মধ্যে বিকশিত যারা ইউরোপের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক , আধ্যাত্মিক যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে এর উপস্থিতিকে বিরূপ শক্তি হিসেবেই অনুভব করেছে। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ পশ্চিমা প্রযুক্তি, কৌশল প্রয়োগের দাবীর মধ্যদিয়ে তা আংশিক গ্রহন করেছে একই সাথে যে সভ্যতা থেকে তা সৃষ্ট তাকেও। প্যালেস্টাইনে আরব পরাজয় আরবদের প্রথাগত জীবনধারায় অপর্য্যাপ্ততার চিত্র তুলে ধরে আধুনিকতার দাবীকে বেগবান করে। এভাবে উপদ্বীপের আরব ছাড়া পুরো মুসলিম শহুরে আরব জনগোষ্ঠী আজ যতটা তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবাধীন ততটাই পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবাধীনে এবং এর আবশ্যকীয় সেক্যুলারিজমে অভ্যস্ত। উচ্চ শিক্ষিত সংখ্যগুরুদের মধ্যে এ প্রভাব আরো অধিক বিদ্যমান। আধুনিক যুগে প্রবেশকালীন খ্রীশ্চান পৃথিবীর মত এখানেও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে কখনওবা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের সমান্তরালে উদারনৈতিকতাবাদ হিসেবে অজ্ঞেয়বাদ ছড়িয়ে পড়ছে। তর্কসাপেক্ষ মূল্যবান , ইচ্ছার স্বাধীনতায় কঠোর ধর্মীয় বিধি-বিধান এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। তবে নারীমুক্তি এবং বহুগামীতা বিষয়ে আরব মুসলিম সমাজের নিশ্চিত গুণগত পরিবর্তন অবশ্যই চোখে পড়ার মত।

প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে আরবদেশগুলোর চোখে পশ্চিমের চরিত্র যেমন আগ্রাসী এবং কর্তৃত্ববাদী থেকে বন্ধু এবং সহায়ক শক্তিতে বদলাচ্ছে তেমনি পশ্চিমা প্রভাবের প্রতিও তারা উন্মুখ হতে বাধ্য। আরও

উন্মুখ সেই বিশ্বসভ্যতার অংশ হতে যা গ্রীস,রোম, প্যালেস্টাইনে জন্ম নিয়ে থাকলেও এই আরবরাই একদিন পরম মমতায় লালন করেছে, অক্লান্ত পরিশ্রমে পুষ্ট করেছে। তুর্কীর উদাহরণ এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে। যে আগ্রহভরে তুর্কীরা পশ্চিমা সভ্যতাকে গ্রহন করেছে (ইসলাম এবং কয়েক শতকব্যাপী খিলাফতের ধারক হয়েও) তার মুল কারণ তারা কখনও পশ্চিমা শাসনাধীনে ছিলনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর (এবং অনেকটা প্যালেস্টাইনী আরবদের মতই পরাজয়ের পরেও) শাসিত গোষ্ঠীর হীনমন্যতা নয় বরং শাসক জাতের গর্বিত মানসিকতা নিয়েই তারা তাদের জীবনকে আধুনিক করতে মনস্থ করে। আধুনিক রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি কিংবা অচল ধর্মতন্ত্র পুনঃস্থাপনের নামে জাতীয় গৌরব বাড়ানোর কোন প্রয়োজন তাদের ছিলনা। পক্ষান্তরে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ এসব পথে এগিয়ে যেতে আরবদের বাধ্য করেছে।

আরব পুনর্জাগরণের প্রাথমিক দিনগুলোতে আরববিশ্বের খ্রীশ্চান সম্প্রদায়গুলো বিশেষকরে লেবানীজ "কপ্ট"রা খোলাখুলিই পশ্চিমা সভ্যতাকে (ছেলে মেয়েদের জন্যে ইউরোপীয় খ্রীশ্চান নাম সহ) গ্রহন করেছে যা মুসলিম আরবদের সম্ভব ছিলনা। এই খ্রীশ্চান সম্প্রদায়গুলো শুধু যে অনায়াসে পশ্চিমা মুল্যবোধে মিশে যেতে পেরেছে তাই নয়, মুসলিম আধিপত্যে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাসের বদলে ইউরোপীয় উন্নত জাতীর সাথে একাত্মতায় মনস্তাত্বিক সান্ত্বনাও পেয়েছে। সে সময় ইউরোপীয়রা মিশর,লেবাননে এসে মুসলিমদের চেয়ে খ্রীশ্চানদেরকেই সহজে কাছে পেয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশেষতঃ লেবানীজ খ্রীশ্চানরা মুসলিম আরবদের কাছে পশ্চিমা সভ্যতার দোভাষী হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে আজ ওসব ব্যবধান প্রায় উবে গেছে বলা যায়। একদিকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম আরব লেবানীজ খ্রীশ্চান এবং কপ্টদের মতই পশ্চিমায়ীত অথবা পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণে প্রস্তুত; অন্যদিকে শেষোক্ত খ্রীশ্চানরাও আগের মত অন্ধ পশ্চিমানুরাগী নয় বরং তাদের স্বদেশী মুসলিমদের আরো কাছাকাছি।

ঈজ্ঞা-মিশরীয়, ঈজ্ঞা-ইরাকী সমস্যার সমাধান শেষে সমগ্র পূর্বাঞ্চলীয় আরব বিশ্ব (জর্দানে ঘাঁটি সমূহ এবং এডেন ও পারস্য উপসাগরীয় প্রটেক্টরেট সমূহ বাদে) ইউরোপীয় সামরিক দখল কিংবা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত। বৃটেনের প্রতি মিশরের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে আরব অনুভূতিতে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করবে, যেহেতু পুরো এলাকাটাতে মিশরীয় প্রচার প্রকাশনা বিশেষ প্রভাবশালী এবং যা অতীতেও বৃটেনের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির কারণ হয়েছে। ফরাসী নিয়ন্ত্রণ থেকে উত্তর আফ্রিকা পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমের সাথে আরববিশ্বের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান হবেনা। আমরা দেখেছি তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়ার জনগনের একাংশের কাছে স্বাধীনতা বলতে আজ ফ্রান্স থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়া নয় বরং ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে থেকে স্বায়ত্বশাসন তথা প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতিতে অব্যাহত ফরাসী নির্দেশনার অধীনতা বুঝাচ্ছে।

ইতিহাসের শিক্ষা এটাই শেখায় যে, আগে পরে উত্তর আফ্রিকার সব দেশ প্রতিরক্ষা, বিদেশে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব, জাতিসংঘে নিজেদের আলাদা আসন সহ পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করবে এবং তা পেয়েও যাবে। স্বায়ত্বশাসন চর্চার মধ্যদিয়ে যতই তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, বুদ্ধিজীবির সংখ্যা যত বাড়বে, সম্পদের যত উন্নয়ন ঘটবে ততই পূর্ণ স্বাধীনতার কম কিছুকে তারা নিজেদের জন্যে লজ্জাষ্কর মনে করবে। বিশেষকরে পূর্বাঞ্চলীয় সহোদরা আরব রাষ্ট্রসমুহের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সামনে এটা আরও লজ্জাষ্কর মনে হবে। যদি আরবলীগ ঠিকে থাকে এবং যদি এর শক্তি ও সদস্যদের মধ্যে বন্ধন আরো দৃঢ় হয় তাহলে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোও তাতে যোগ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে ; যা তাদের স্বাধীন প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি ছাড়া সম্ভব নয়। তবে এখানে আবারও আরব বিশ্বের ভবিষ্যতের মৌলিক প্রশ্ন চলে আসে। ইউরোপের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের পর আরব বিশ্বকে নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কও নির্ধারণ করতে হবে। এই সম্পর্ক কোন খাতে প্রবাহিত হবে?

(২)

প্যালেস্টাইন বিপর্য্যয়ের পর আরব লীগের ভবিষ্যত , স্থায়ীত্ব এবং এটা পোষা ঠিক হবে কিনা নানা কথাবার্তা হয়েছে। এর ভাগ্য অন্ততঃ কয়েক মাস যাবৎ মিশর ও জর্দানের মধ্যেকার প্রচার যুদ্ধের উপর ঝুলেও ছিল। বিশেষকরে মিশরে (যার জাতীয়তাবাদ আরবলীগ প্রতিষ্টা পর্য্যন্ত নিজস্ব পথ ধরে চলেছে) বাড়তি আরব বিষয়ে জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে উঠে। নিজের সম্মান প্রতিপত্তির জন্যে মিশর আরবলীগ প্রতিষ্টায় নেতৃত্ব দিয়ে বিনিময়ে মারাত্মকভাবে পরাস্ত হয়েছে এবং মিত্রদের কাছে পরিত্যক্ত, প্রতারিত বোধ করেছে। স্বভাতঃই প্রশ্ন উঠেছে 'কেন আমরা আরবলীগে অংশ নিলাম , কেনইবা এতে থাকবো।' এমন রাজনৈতিক নুতন চিন্তাধারারও উদ্ভব হয়েছে 'মিশরের ভবিষ্যত আরব বিশ্বে নয় বরং নীলনদের প্রবাহের ধারায় সুদানের দিকে,আফ্রিকায়।'

তবে শেষ পর্য্যন্ত আরবলীগ থেকে মিশর সরে যায়নি, লীগও ভাঙ্গেনি। সকল দুর্বলতা,ব্যর্থতা বিশেষতঃ প্যালেস্টাইন রক্ষায় ব্যর্থতার পরেও এমনকি নিজেদের মধ্যে পাসপোর্ট ,ভিসা শুল্ক তুলে দিতে সক্ষম না হওয়া সত্বেও আরবলীগ ঠিকে আছে অধিকন্তু তাতে ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা লাভ করে লিবিয়াও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মাঝে মাঝে লীগের কাউন্সিল বসে, এবং এর মাধ্যমে আরব রাষ্ট্রসমূহকে অভিন্ন স্বার্থের কথা বলার সুযোগ করে দেয়; বিদেশ নীতির নির্দিষ্ট ইস্যুতে বিশ্বের সামনে একটা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট তুলে ধরে। আরবদেশ সমূহ জাতিসংঘে একটা স্বীকৃত ভোটিং ব্লক হিসেবে বিভিন্ন ব্লকের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আভ্যান্তরীন বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় করার জন্যে লীগ উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছে। লীগের এই কোনরকম অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মধ্যেও (তুর্কির সাথে চুক্তি করা নিয়ে ১৯৫৫ সালে মিশর-ইরাক দ্বন্ধে লীগের কাঠামো প্রচন্ড ধাক্কা খেলেও শেষ পর্য্যন্ত তা ভাঙ্গেনি)কিছু গুরুত্ব আছে। কারণ এতে প্রমাণিত হয়, যত ত্রুটিপুর্নই হোক, আরব রাষ্ট্রসমূহের কোন রকম একটা কনফেডারেশনে আসার প্রবল আশা আকাঙ্খার কিছু বাস্তবায়ন এতে হয়েছে। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, লীগের মাধ্যমে আরব রাজনীতিবিদগন অভিন্ন কার্যক্রমের একটা কার্যকর হাতিয়ার তৈরীতে নিয়োজিত। বর্তমানে তা তেমন কাজের কিছু হয়তো নয় তবে তা পরিত্যাগ করাটা হবে মারাত্মক ভুল।

স্বাভাবিক প্রশ্ন এসেই যায়, বিভিন্ন সদস্য অথবা তাদের গ্রুপের মধ্যে ইউনিয়নের বন্ধন দৃঢ় করার আশু কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, অন্ততঃ অর্ধচন্দ্রাকৃতির উর্বর ভূমির দেশ সিরিয়া,লেবানন, জর্দান, ইরাকের মধ্যে ইউনিয়ন গড়ার উপাদান বিদ্যমান, এবং তা যে কোন সময় একটা ফেডারেল রাষ্ট্রের রূপ নিতে পারে। এরকম একাত্মীকরণের পথে কিছু বাধা দুর হয়েছে , বাকী যা আছে তাও অপসারন অযোগ্য নয়। জর্দানের সাথে সিরিয়ার ইউনিয়ন গঠনে মুল দুই প্রতিবন্ধকতার একটি-- রাজা আবদুল্লাহ বেঁচে নেই। মিশরও অংশতঃ আবদুল্লাহ এবং সাধারণভাবে হাশেমীয় বংশকে অপছন্দ করার কারণে বৃহত্তর সিরিয়ার ইউনিয়ন গঠনে বিরূপ ভাব দেখিয়েছে। দৃশ্যপট থেকে ফারুখ সরে গেছেন, আবদুল্লাহও বেঁচে নেই , সুতরাং বংশ দ্বন্ধের কারণে মিশরীয় বিরোধীতার কোন হেতু নেই। এই বাস্তবতার যথার্থতা পাওয়া যায় কায়রোয় টাইমস প্রতিনিধির রিপোর্টে, 'কর্ণেল আব্দুল নাসের মিশরে সিরিয়ার রাষ্ট্রদুতকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, অর্ধচন্দ্রাকৃতির উর্বর দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্টতর কোন ইউনিয়ন গঠন করতে চাইলে তাঁর সরকার তাতে আপত্তি করবেনা। (অবশ্য পরবর্তীতে মিশর-ইরাক বিরোধ এবং ইরাক থেকে সিরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার মিশরীয় উদ্যোগের ফলে পরিস্থিতি বদলে যায়)।

এ'পথে তিনটি বাধা থেকে যায়। প্রথমতঃ জর্দানকে ইউনিয়নে নেয়ার ক্ষেত্রে সিরিয়া এবং ইরাকের আপত্তি। আপত্তির কারণ-বৃটেনের সাথে চুক্তিমতে নিজের মাটিতে বিদেশী সৈন্য, ঘাঁটি থাকায় জর্দানের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে ইরাক, সিরিয়ার স্বাধীনতা পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ লেবানীজ খ্রীশ্চানরাও

ইউনিয়ন পরিকল্পনার পক্ষে নয়, হয়তো আরব ইউনিয়নের মধ্যে তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তায় স্বায়ত্বশাসন দিতে হতে পারে। তৃতীয়তঃ ইরাক এবং জর্দান উভয় দেশের রাজতন্ত্র (উভয় রাজারা পরস্পরের চাচাতো ভাই)ও যে কোন একাত্মীকরণ কিংবা ফেডারেশন গঠনে বাধা হয়ে আসতে পারে যদি না দুয়ের একজনকে ফেডারেশনের প্রধান করলে অন্যজনকে খানিকটা খাটো হতে রাজী করানো যায়। আপাততঃ নিকট ভবিষ্যতে সেরকম কিছু ঘটার লক্ষণ নেই। সুতরাং ভবিষ্যতের অদৃশ্য সম্ভাবনার কথা বাদ দিলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির উর্বর ভূমিতে সীমিত পরিসরে ফেডারেশনের চেয়ে কম কিছু হতে পারে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে,কাঙ্খিত এই গুরুত্বপুর্ন দিকেই আরব সংহতি এগোতে পারে।

পরবর্তীতে মিশর-সুদানীজ সহযোগীতার সম্ভাবনাও আছে। এখন প্রায় নিশ্চিত যে সুদান মিশরের সাথে ইউনিয়নে যাওয়ার চেয়ে স্বাধীনতাই চাইবে। ১৯৫৩ সালের নির্বাচনে ন্যাশনাল ইউনিয়নিস্ট পাটির বিজয় সত্বেও তারা এখন মিশরের সাথে সমানে সমান হিসেবে সার্বভৌম সুদানীজ রিপাবলিক (নিজেদের আলাদা প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্ট এবং সেনাবাহিনী সহ) ঘোষনা করছে । তবে দুই দেশের সম্পর্ক যে ধরনেরই হোকনা কেন, ভবিষ্যতে যে তাদের মধ্যে অধিকতর সহযোগীতা,আদান প্রদান হতে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের রয়েছে নীলনদের অভিন্ন প্রবাহ। উভয় দেশে যৌথ উদ্যোগে (উগান্ডা এবং আবিসিনিয়াকেও এর ভেতর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে) অনেকগুলো বাঁধ পরিচালনা; অনেকগুলো নুতন বাঁধ তৈরী করে নীল নদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদের পুর্ণ ব্যবহার সম্ভব। জলপ্রবাহ ভাগাভাগির জন্যে চুক্তি করতে হবে। মরুপ্রধান দেশ হলেও সুদান জনসংখ্যাল্পতায় ভুগছে; তাই সীমিত পরিসরে মিশরীয়দের জন্যে অভিবাসন অনুমোদন করে মিশরকে জনসংখ্যার চাপ থেকে মুক্তি দিয়ে সুদানও উপকৃত হতে পারে। উত্তর সুদান এবং মিশরের উপরের অংশের জলবায়ুগত মিল আছে, এখানে কয়েক লাখ মিশরীয় চাষা খুব সহজেই সুদানীদের সাথে মিশে যেতে পারে। শেষতঃ সুদানীজদের জন্যে পুর্ব কিংবা পশ্চিমের অন্যান্য আরবদেশে এমনকি ইউরোপ যেতে হলেও মিশর হচ্ছে বর্হিবিশ্বের সিংহদ্বার।

ভবিষ্যত প্রবক্তা এবং স্বপ্নদ্রষ্টরা এর বাইরে গিয়ে ইরাক,ইয়েমেন থেকে মরক্কো পর্য্যন্ত সব আরব রাষ্ট্রের সম্মিলনে আরব বিশ্বের যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে পারেন; তবে ইতিহাসের যাত্রাপথ বিবেচনা করলে দেখা যাবে হাইড্রোজেন বোমায় নাক গলানো ছাড়া এটা করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা। অবশ্যই এর পক্ষে নানাবিধ উপাদান আছে। প্রত্যেক দেশের আরবরাই নিজেদের এবং অন্যদেশে স্বজাতীয়দের আবিস্কার করছে। আরববিশ্ব জুড়ে লেখ্যভাষার অভিন্ন রূপ, যদি বিভিন্ন কথ্যভাষার উদ্ভব সত্বেও আরবদের মৌলিক সাংস্কৃতিক পরিচয় তেরশত বছর ধরে সংরক্ষিত থাকতে পারে তাহলে রেডিও, সিনেমা, গ্রামোফোন, বিমান ভ্রমন, এমন এক জনপ্রিয় স্তরে পৌঁছেছে তাতে সেই সামান্য ব্যবধানও মিশে যাচ্ছে।

প্রত্যেক আরব রাজধানীরই প্রচার কেন্দ্র আছে। খার্তুম,দামেস্ক, বাগদাদ, বৈরুতে মিশরীয় ছায়াছবি চলে। ইরাকী,কুয়েতী এবং হেযাযীরা (মহাযুদ্ধের আগে যাদের জন্যে লেবানন ভ্রমন প্রায় অকল্পনীয় ছিল) কয়েক ঘন্টার ভ্রমন পথে ছুটি কাটাতে নিয়মিত পাহাড়ে আসছে। প্রত্যেক আরবদেশেই একদিকে শিক্ষা বিস্তার এবং অন্যদিকে ধ্রুপদী আরবীভাষার আধুনিকীকরণ লেখ্য এবং কথ্য ভাষার ব্যবধান ঘুচাচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গানেও আধুণিক বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ আঞ্চলিক জোট গঠনের পক্ষে। আরবদেশসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে নিজস্ব গুরুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হলেও বিশ্বপরিস্থিতিতে কার্য্যকর ভূমিকা ছাড়াই থেকে যাবে। একটি ফেডারেশনে সংঘবদ্ধ হলেই শুধু তারা বিশ্ব মানচিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অন্যতম প্রধান শক্তি হতে পারে।

তবে এ'ধরণের ইউনিয়ন গঠনে তাদের পারস্পরিক বিরোধ এবং বিচ্ছিন্নতা প্রবনতা যা এযাবৎ আরবলীগের সর্বনাশের কারণ হয়ে রয়েছে তা অতিক্রম করতে হবে। অধিকতর আনুগত্যে ক্ষুদ্রকে বশে রাখার মৌলিক

রাজনৈতিক ধর্ম তাদের অর্জন করতে হবে; এমন এক শৃঙ্খলাবোধ শিখতে হবে যা এযাবৎ আরব চরিত্রে দেখা যায়নি।

(৩)

আরবলীগের ভবিষ্যতের প্রশ্ন আপাততঃ তুলে রেখে, বিবেচনা করার মত আরো মৌলিক বিষয় রয়েছে;যেমন- এককভাবে আরব রাষ্ট্রসমূহে মানবিক, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সম্ভাবনাসমূহ। ঐক্যের উপাদানগুলো আরও দৃঢ় এবং সুগঠিত না হলে তাদের মধ্যে পুর্ন ইউনিয়নও কোন উপকারে আসবেনা। গত ক'বছরে সিরিয়া এবং মিশরে পরীক্ষামুলক সংস্কার কর্মসুচীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে এবং অন্যান্য আরবদেশসমূহেও আরও অনেক কিছু করার বাকী রয়ে গেছে। এ'ক্ষেত্রে মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন,সামন্তবাদ বিলোপ , বড় বড় জমিদারী ভেঙ্গে দেয়া,কৃষকদের জন্যে ছোট কৃষিজোত তৈরী এবং তাদের শহুরে মহাজনদের হাত থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা।

মিশরে দারিদ্র্য প্রকট। এখানে জনসংখ্যার আধিক্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এক হিসেবে দেখা যায় মিশরের অর্ধেক জনসংখ্যা উদ্বৃত্ত, অর্থাৎ অর্ধেককে বাদ দিলেও মোট উৎপাদনের কোন হেরফের হয়না। সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে নীলনদ থেকে বাড়তি জলের ব্যবস্থা (যা প্রকল্পাধীন রয়েছে) ছাড়া কৃষি জোতের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। তবে এই বৃহৎ নদীর শেষবিন্দু জল নিংড়ে জমির উৎপাদন পর্য্যাপ্তভাবে বাড়িয়েও জনগনের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব নয় যদি বাড়তি উৎপাদন বাড়তি মুখের গ্রাসাচ্ছাদনে ফুরিয়ে যায়। জনগনের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে মিশরের সামনে তিনটি রাস্তা খোলা আছে। শিল্পায়ন, বহির্গমন, এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ। শেষোক্ত পন্থতির জন্যে আশার কথা এইযে, মিশরের মুফতি (মুসলিম আইনের প্রধান ব্যাখ্যাকারী) জন্ম নিয়ন্ত্রণের সাথে ইসলামের কোন অসামঞ্জস্যতা নেই বলে মত দিয়েছেন। বহির্গমনের জন্যে, আগেই বলা হয়েছে সুদান সীমিত সুযোগ দিয়েছে। বিক্ষিপ্ত জনসংখ্যা অনুপাতে বিস্তীর্ণ চাষযোগ্য ভুমি বিচারে ইরাক চাইলে এর চেয়েও বেশী সংখ্যায় লোক নিতে পারে। অবশ্য নিকট ভবিষ্যতে তেমনটা ঘটার কোন লক্ষণ নেই। বাকী রইল শিল্পায়ন; ইতোমধ্যে মিশরের বিভিন্ন শহরে পোষাকশিল্প কারখানার বিকাশ ঘটছে; এখানে অন্যান্য আরবদেশসমূহের তুলনায় বেশী পরিমানে বিনিয়োগ ফান্ড এবং শিল্প দক্ষতার সন্নিবেশ ঘটেছে।

এর বাইরেও মিশর অন্যান্য আরবদেশসমূহের সাথে বৃহত্তর পরিসরে অর্থনৈতিকভাবে পরস্পরের সহযোগী হতে পারে যেমনটা চার্লস ঈসাওয়ী দেখিয়েছেন , যদি অন্যান্য আরব দেশগুলো মিশর থেকে বিশেষ কিছু শিল্প পন্য যেমন টেক্সটাইল, সিমেন্ট, গ্লাস, ভোজ্যতেল, সাবান, ম্যাচের মত পন্য আমদানী করতে সম্মত হয় বিনিময়ে ইরাক, সিরিয়া তাকে গম, বার্লি দিতে পারে, লেবানন দিতে পারে ফল এবং অবকাশ যাপনে পর্যটন সুবিধা,সুদান এবং লিবিয়া দিতে পারে লাইভ স্টক ইত্যাদি। যেহেতু এই দেশসমূহ প্রত্যেকে অন্যের দিকে না তাকিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই অদক্ষতা, একই পন্য উৎপাদনের সুযোগও থেকে যাচ্ছে। সবার স্বার্থে এই প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালের মে মাসে বৈরুতে আরব অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; এবং সেখানে কর হ্রাস, যৌথ উদ্যোগ এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব পাশ হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমন্বয়ের এ উদ্যোগ এবং আরবলীগের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমন্বয়ের উদ্যোগ কোনটা বেশী ফলপ্রসূ হয় তাইই এখন দেখার বিষয়।

উল্লেখিত স্কীমের আওতায় যে সিদ্ধান্তই নেয়া হোকনা কেন সিরিয়ার আশ্চর্য্যরকম শিল্পোন্নয়নকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। যুদ্ধের আগে যে সিরিয়ায় কুটির শিল্প বাদে কোনরকম শিল্প কারখানাই ছিলনা আজ সেখানে সম্পুর্ন নিজস্ব উদ্যোগে নিজেরা সিল্ক, টেক্সটাইল, চিনি, সিমেন্ট, গ্লাস, ভোজ্যতৈল, ম্যাচ এবং অনুরূপ পন্যে সে স্বনির্ভর। ক্ষেত্র বিশেষে রফতানী যোগ্য উদ্বৃত্তও আছে। এই অগ্রগতির গুরুত্ব আরো বেশী কারণ এটা সম্ভব

হয়েছে কৃষিতে বড় রকমের সাফল্যের ফলে। যুদ্ধের আগের এবং পরের কৃষিজাত পন্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান এর প্রমাণ।

মিশরের মত সুদানেরও মুল শিল্প কার্পাস উৎপাদন । এক্ষেত্রে 'জজিরা স্কীম' বৃটিশদের রেখে যাওয়া অন্যতম ভাল উদাহরণ। উৎপাদনে সরকার এবং কৃষকদের অংশীদারীত্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সিংহভাগ রাজস্ব আনে। খার্তুমের দক্ষিণে 'ব্লু' এবং শ্বেত নীল নদের মধ্যবর্তী ত্রিভুজ অঞ্চলে এই স্কীম জন-জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে। শুধু কৃষকদের বাৎসরীক আশাতীত উপার্জনের (বাম্পার ফলন এবং সর্বোচ্চ দামে পরিবার পিছু ৭০০ পাউন্ড স্টার্লিং)মাধ্যমে নয় বরং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সামাজিক সেবাতেও। এই খাতে বাৎসরিক লাভের ২০% ব্যয় হয় ।

ইরাকের কৃষিক্ষেত্রেও বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটছে; জর্দান এবং ইয়ারমুক নদীর জল বেঁধে এমন সব প্রজেক্ট পরিকল্পনা করা হচ্ছে যাতে প্রতিবেশী দেশসমুহেরও উপকার হয়। জর্দান, সিরিয়ার সাথে এখানে ইজরায়েলও সংশ্লিষ্ট। এবং যেহেতু আরবরা ইসরাইলের সাথে সরাসরি কোন কাজ করবেনা তাই এই পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের পথে বাধা অনেক। তবে টাইবেরিয় হ্রদকে কার্য্যকরভাবে আন্তর্জাতিকীকরন এবং এর জল বন্টনে জাতীসংঘের কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা করা গেলে কিছু একটা অর্জন সম্ভব।

জর্দান উপত্যাকায় ,জেরিকোর কাছে এ জলশূন্য মরাভূমিতে মুসা আলামি প্রণীত একটা প্রতিশ্রুতিশীল পাইলট স্কীম রয়েছে। 'জর্দান উপত্যাকার সাব সয়েলে কোন পানি নেই, থাকলেও এই লোনাভূমি কৃষির জন্যে অনুপযুক্ত' বিদেশী বিশেষজ্ঞদের (জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞসহ) এই মতামত অগ্রাহ্য করে আলামী খনন কাজ চালিয়ে প্রচুর পানির সন্ধান পান। ভূমিকে লবনমুক্ত করে সাফল্যের সাথে সেখানে ট্রপিক্যাল, সাব ট্রপিক্যাল শস্য ফলান। প্যালেস্টাইনী আরব উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের জন্যে এতিমখানা কেন্দ্রীক আরব ভূমি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে তিনি এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় আবাদ এবং উন্নয়নের জন্যে কয়েক হাজার একর জমি রয়েছে। প্রতিদিন এতিমখানার শিশু কিশোর ছাড়াও এক বিরাট সংখ্যক কৃষক পরিবার এখানে কাজ করতে আসে। আলামীর মুল লক্ষ্য হলো কীভাবে যতবেশী সংখ্যক প্যালেস্টাইনী আরব উদ্বাস্তুদের লাভজনক এবং চিরস্থায়ীরূপে জর্দান উপত্যকায় প্রতিষ্টা করানো যায়।
তবে আজকের আরব জীবনে সবচে' বড় অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তেল আবিস্কার এবং আহরণের ফলে।

পরিবর্তনটা বৈপ্লবিক, কারণ তেল উঠছে মুলতঃ মরুভূমিতে (সৌদী আরব, কুয়েত,বাহরায়েন) যেখানে চাষাবাদের প্রয়োজনীয় পানি নেই ,এবং তেল উত্তোলনের আগমুহূর্ত পর্য্যন্ত স্থানীয় জনগন দরিদ্র এবং পশ্চাদপর, অর্থনীতিও ছিল অতিমাত্রায় আদিম। স্টিফেন লংগ্রিজের 'অয়েল ইন দ্য মিডল ইস্ট' গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য দেয়া যেতে পারে; ১৯৩৮ সালে আরবদেশসমূহ এবং পারস্য ১৫ মিলিয়ন টন তেল তথা বিশ্বের মোট ২৭০ মিলিয়ন সরবরাহের ৫.৫ শতাংশ উৎপাদন করতো। ১৯৪৬ সালে এই উৎপাদন দাঁড়ায় ৩৫.৫ মিলিয়নে,বিশ্বের মোট ৩৮১ মিলিয়ন টন উৎপাদনের ৯.৪ শতাংশ। ১৯৫২ সালে একা আরবদেশসমূহ (পারস্য সরকার এবং ঈঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানীর মধ্যেকার বিরোধের ফলে উৎপাদন বন্ধ থাকার পরেও) উৎপাদন করে ১০৪.৫ মিলিয়ন টন তথা বিশ্ব উৎপাদন ৬০৫ মিলিয়ন টনের ১৭ শতাংশ । তেল উৎপাদনে এই আশ্চর্য্যজনক পরিমাণে আরবদেশগুলোর অংশ যথাক্রমে *সৌদী আরব ৪১ মিলিয়ন টন, কুয়েত ৩৭ মিলিয়ন টন, ইরাক ১৮.৫, কাতার ৩.২,মিশর ২.৪ এবং বাহরায়েন ১.৫ মিলিয়ন টন। ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে আরব দেশসমূহ বাৎসরিক ১২০ মিলিয়ন টন লক্ষ্যমাত্রায় , মাসিক ১০ মিলিয়ন টন ছাড়িয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যতে এই পরিসংখ্যানের প্রভূত উন্নতি আশা করছেন। এযাবৎ বিশ্বের প্রমাণিত মজুদের প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৬৮০০ মিলিয়ন টন আরব দেশসমূহে, যাতে বাহরায়েন ৪০ মিলিয়ন টন,মিশর ৮০মিলিয়ন টন, ইরাক ১৬৫০,কুয়েত ২৫০০ , কাতার ৩০০ , সৌদী আরবে ২২৫০ মিলিয়ন টন তেল রয়েছে।

এই পরিসংখ্যান রীতিমত আরবদেশেরই আরব্যরজনীর গল্পের দৈত্যের হঠাৎ করে মহামুল্যবান উপহার নিয়ে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু উপহারটা যে চিরস্থায়ী নয় তা সামান্য অংকেই পরিস্কার। ৫০ কিংবা ১০০ বছরের মধ্যেই বিশ্বের আপাতঃ সবচেয়ে সমৃদ্ধ কুয়েতের তৈল ক্ষেত্র ফুরিয়ে যাবে। সুতরাং তেল সম্পদের বর্তমান রাজস্ব শুধু বর্তমান জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় না করে তেলের বদলে অন্যান্য সম্পদের উন্নয়নেও ব্যয় করা আরবদেশগুলোর জন্যে জরুরী।

এই কাজটাই বর্তমানে ইরাক সন্তোষজনকভাবে করছে। এটাই স্বাভাবিক , কারণ যে তিনটা প্রধান তেল উৎপাদক দেশ (সৌদী আরব, কুয়েত ,ইরাক) বড় ধরণের মুলধনী উন্নয়নে ব্যয়করার ক্ষমতা রাখে তন্মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে একমাত্র ইরাকই সবচে বেশী উন্নত। আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো, সক্রিয় জনমত, এবং প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ একমাত্র ইরাকেরই আছে। শুরু থেকেই ইরাক কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও তার তেল রাজস্ব বাবদ আয় থেকে বাৎসরীক বাজেটের বর্তমান ব্যয় নির্বাহের বদলে মুলধনী উন্নয়ন ব্যয়ের নীতিতে কাজ করে আসছে। সরকারী বাজেট থেকে আলাদাভাবে তেল রাজস্বের ফান্ড পরিচালনার জন্যে ১৯৫০ সালে এক বিশেষ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়।

উন্নয়ন কাজে শুধু স্বায়ত্বশাসন নয় বরং এটাকে রাজনীতির বাইরে রেখে নির্বচনী ভাগ্য জেতার হাতিয়ার হওয়া থেকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য। বোর্ডের আট সদস্যের মধ্যে সরকারের সদস্য শুধু প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী। বাকী ছয় সদস্য রাজকীয় ফরমান বলে পাঁচ বছরের জন্যে নিয়োগ প্রাপ্ত বেতনভুক্ত কর্মচারী হলেও তারা আমলা নন। এই ছয়জনের দুই জন যথাক্রমে সেচ এবং অর্থনীতিবিদ। এটা অবশ্যই* বর্তমান সরকারের কৃতিত্বই বলতে হবে যে তাঁরা পশ্চিমা বিরোধী কুসংস্কার অতিক্রম করে বোর্ডের সচিব এবং অর্থ বিশেষজ্ঞ হিসেবে এক ইংরেজ এবং সেচবিদ হিসেবে এক আমেরিকানকে নিয়োগ দিয়েছেন। প্রথমে সিদ্ধান্ত হয় যে তেলের পুরো রয়্যালটি বোর্ডের হাতে থাকবে। পরে তা সংশোধন করে ৭০% শতাংশে নামানো হয়; বাকী ৩০% স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয় নিজেদের প্রকল্পসমূহে ব্যয় করার জন্যে।

১৯৫০ পর্য্যন্ত ইরাক পেট্রোলিয়াম কোং টন প্রতি নির্দিষ্ট হারে রয়্যালটি পরিশোধ করতো। কিন্ত সে বছর আরামকো (পারস্যে ইঙ্গ-ইরানী কোং এর বিপর্যয়ের পর),স্থানীয় আরব সরকার সমুহ এবং এলাকায় কর্মরত মধ্যস্বত্বভোগী কোম্পানীগুলোর সম্পর্কের ভিত্তি বদলে দেয়ার মত এক উদ্যোগ নেয়। টন প্রতি নির্দিষ্ট হারের বদলে কোম্পানী এবং সরকারগুলোর মধ্যে লভ্যাংশ আধাআধি ভাগের সিদ্ধান্ত হয়। এই নুতোন ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক সময়ে বর্ধিত উৎপাদন একত্রে মিলে ইরাকের তেল রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক প্রায় ৫০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং। এই রাজস্ব দেশের আঞ্চলিক অসুখ দারিদ্র্য নির্মুল করে পুরো জীবন ব্যবস্থা বদলে দিতে পারে। নগর উন্নয়ন ,যোগাযোগ, এবং সেচ প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থ বাদে এই বোর্ড স্কুল , হাসপাতাল, এবং সমাজ সেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে।

কুয়েতের গল্প পরীর কল্পকাহিনীকেও হার মানায়। *সিকি মিলিয়ন জনসংখ্যা, ছোট্ট পশ্চাদভূমিতে কিছু গ্রাম একটি বড় শহর নিয়ে এই শেখতন্ত্র। এটা হচ্ছে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রিন্সিপালিটির একটি যাতে গত একশত বছর ধরে বৃটিশ সরকার আগ্রহ দেখিয়েছে মুলতঃ ভারতের নৈকট্যের কারণে, এবং এরাও বৃটেনের সাথে চুক্তি সম্পর্ক করতে প্ররোচিত হয়েছে,বৃটিশ নিরাপত্তা গ্রহনের বিনিময়ে আর কোন বিদেশী শক্তিকে ঘাঁটি করতে না দিতে সম্মত হয়েছে। সর্বত্রই স্থানীয় শাসক শেখকে বৃটেনের একজন রেসিডেন্ট সাধারণ পলিসি সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেন ;তবে প্রশাসন পুরোপুরি স্থানীয় এবং তাতে বৃটেন সরাসরি প্রভাব খাটায়না।

তেলক্ষেত্র আবিস্কারের পূর্বে ভারত মহাসাগরে চলাচলের জন্যে জাহাজ তৈরী এবং আদিম উপায়ে মুক্তো আহরন করে কুয়েত মধ্যযুগীয় পশ্চাদপর জীবন যাপন করেছে। *আজ তার হাতে ৫০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশী বাৎসরিক রাজস্ব আয়, যেন সত্যিকারের এক যাদুর আংটি পরে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান শেখ একজন বিজ্ঞজন, বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্তৃকও তিনি ভাল ভাবে উপদেশ পেয়ে যাচ্ছেন। রাজস্বের এক বিশাল অংশ কুয়েতের আধুনিকায়নে ব্যয় করে চলেছেন। বাড়ী-বাড়ী প্রতিটি অলি গলি, রাস্তা নুতন করে তৈরী হচ্ছে। হাসপাতাল এবং স্কুল নির্মিত হচ্ছে; হাজার হাজার ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার্থে ইংল্যান্ড, মিশর, লেবাননে পাঠানো হচ্ছে। তবে সরকার পদ্ধতি এখনও মধ্যযুগীয় এবং স্বৈরতান্ত্রিক। তেল রাজস্ব শেখের কাছে পরিশোধ করা হয় এবং তাত্বিকভাবে তিনি এবং তাঁর পরিবার এর মালিক। অবশ্যই এই অবস্থা বেশীদিন চলবেনা বিশেষ করে যখন অধিক হারে কুয়েতীদের বিদেশে পড়ালেখার জন্যে অধিকতর অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে আধুনিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানসিকতার বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর উন্মেষ ঘটছে; সরকারের পুরোন ভিত্তি প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে এবং গণতন্ত্রের দাবী অধিক শোনা যাচ্ছে।

সৌদী আরবের সরকারও স্বেচ্ছাচারী পরিবারের হাতে। তেল রাজস্ব ইবনে সউদের ছেলেদের কাছে পরিশোধ করতে হয়। সরকারী তহবিল এবং রাজকোষের মধ্যে পরিস্কার কোন সীমারেখা না থাকার ফলে তেলের টাকা তত্বগত এবং বাস্তবক্ষেত্রেও রাজার নিজস্ব রাজস্ব। অধিকন্তু দেশটা আয়তনে কুয়েতের চেয়েও বড় এবং নানাদিক থেকে একরকম চারণ যুগের হওয়ার ফলে নিকট ভবিষ্যতে এখানে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন আশা করা যায়না। জনগনের কার্য্যকর প্রতিনিধিত্বমুলক প্রতিষ্টান, সজাগ জনমত, প্রচার প্রকাশনা মাধ্যমের অভাবে পুরো তেল রাজস্ব জনগনের কল্যাণে ব্যয় নিশ্চিত করা কঠিন। এই রাজস্বের বড় অংশই রাজপরিবারের ভোগ বিলাসে ব্যয় হওয়ার সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। তার পরেও আমেরিকান তেল কোম্পানীসমুহের সুনীতি এবং সরকারের সাথে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কের ফলে দেশের অবস্থা, উন্নয়নের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে শহরে স্থায়ী জল সরবরাহ, বিমান বন্দর তৈরী,দেশজুড়ে অয়্যারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্টা এবং আধুনিক কৃষির পরীক্ষামুলক স্কীম (বিশেষকরে যান্ত্রিক সেচ ব্যবস্থা), আগে যেখানে পানির অস্তিত্ব ছিলনা সেখানে আর্টিজান কুপ খনন, জেদ্দার পোতাশ্রয় উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা যায়।

সৌদী সরকারের দাবীর প্রেক্ষিতে আরামকো তার পুরো হেড কোয়ার্টার ন্যুইয়র্ক থেকে দাহরানে নিয়ে আসে এবং দুই সৌদী নাগরিককেও পরিচালনা সভায় নিয়োগ দেয়। আরবের তেলসম্পদ শুধু যে উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিচ্ছে তা নয় বরং শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবেও অবদান রাখছে যেমন: তেল উত্তোলন, শোধন এবং রফতানী (ট্যাংকার কিংবা পাইপ লাইনে) প্রক্রিয়ায় তেল কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় বিশাল এক কর্মী বাহিনীর কর্মসংস্থান হবে এবং ওরা এক নুতন জীবনে অভ্যস্থ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় জনগনের মধ্যে দক্ষ, যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী না থাকায় আরববিশ্বের প্রাগ্রসর এলাকা যেমন মিশর,সিরিয়া, লেবানন, জর্দান থেকে বিশেষতঃ সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনী আরব শরণার্থীদের ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে। চুড়ান্ত পর্য্যায়ে এখানে তেল কোম্পানীগুলো আসার আগ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ মধ্যযুগীয় মুসলিম জনগনের মাঝে ইউরোপীয়, আমেরিকান প্রকৌশলী, পদস্থ কর্মকর্তারা পশ্চিমা জীবন যাত্রার মান সম্পন্ন কলোনী স্থাপন করছে; এসব বিষয়াদি নানামাত্রায় পরিবর্তনের ধারায় অবশ্যই ভুমিকা রাখবে। এই পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে অবশ্যই আরব চিন্তা চেতনা এবং বস্তুগত উন্নয়নে বহির্বিশ্বের সাথে আরো যোগাযোগের দিকে, বিংশ শতকের যোগ্য অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে।

এমনকি যে সমস্ত আরবদেশে তেল পাওয়া যায়নি তারাও তেল পরিশোধন এবং তা বাইরে রফতানীর ব্যাপক কর্মতৎপরতায় জড়িত। সৌদী আরব এবং ইরাক থেকে তেল পাইপ লাইনে সিরিয়া, জর্দান এবং লেবানন হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইন যুদ্ধের কারণে হাইফা টার্মিনাল বন্ধ হয়ে গেলেও ,আরও তিনটি যথাক্রমে সিরিয়ার বানিয়াস এ একটি, লেবাননের সাইডন, ত্রিপোলীতে আরো দুইটি টার্মিনাল খোলা

হয়েছে। দীর্ঘ মরু ভ্রমনের পথে নির্দিষ্ট স্টেশন থেকে পাম্প করে তেলের যাত্রা সচল রাখতে হয়,পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণও করতে হয়।

আরব উপদ্বীপে এই নুতোন সম্পদ আবিস্কারের পর থেকে একটি বিশেষ চিন্তা আরব দুনিয়ার চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদদের মনোযোগ দাবী করছে। তা হচ্ছে; তেল রাজস্ব শুধুই কি তেল উৎপাদক দেশসমুহের উন্নয়নে অব্যাহতভাবে খরচ হতে থাকবে? অথবা জর্দান,লেবানন, সিরিয়ার মত দেশসমুহ যেখানে তেল উৎপাদন হয়না তাদেরও উপকারে আসার মত ব্যাপকভাবে তা ছড়িয়ে দেয়ার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা। কতক তেল উৎপাদনকারী দেশের আয়তন অনুপাতে তাদের তেল রাজস্বের আশ্চর্য্যরকম স্ফীতি এ প্রশ্নকে জোরদার করে। এই অসমানুপাত সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে কুয়েতের ক্ষেত্রে। এই নগর রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৈরুত কিংবা দামেস্ক শহরের চেয়ে বেশী নয় অথচ তাদের বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমান সিরিয়া,লেবাননের যৌথ বাজেটের চেয়ে বেশী; এমনকি কয়েক লক্ষ প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেয়া জর্দানের চেয়েও অতি মাত্রায় বেশী।

তেল সমৃদ্ধ এবং তেলহীন আরব দেশগুলোর মধ্যে কোনরকম ফেডারেশন সম্ভব হলে সমস্যাটার সমাধান হতে পারতো। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে সেরকম আশা নেই । দেশগুলোর দুই ব্লকের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্তর এতটাই অসম যে তা কোনরকম ফেডারেল ইউনিয়ন গঠনের অনুকূল নয়। বিভিন্ন স্থানীয় গোত্র, শাসক শ্রেণীর বিরোধের কথা নাহয় বাদ থাক। তবে একটি আরব উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্টার মাধ্যমে সমঝোতা সমাধানে পৌঁছা যেতে পারে যেখানে উদ্বৃত্ত তেল রাজস্ব জমা রেখে লেবানন, সিরিয়া, জর্দানের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব। তেল কোম্পানীসমূহ এবং যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগীতায় আরবলীগ এ'ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে। ভূগোল এবং ভূতত্বের দুর্ঘটনা,মরুভূমির বুক চিরে টানা সীমান্তের অর্থহীনতা, এখানে ওখানে শাসক পরিবার সমূহের স্বার্থ ইত্যাদি যেন বৃহত্তর পরিসরে আরব জনগনের সর্বোত্তম কল্যাণে তেল সম্পদের লভ্যাংশ বন্টনে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

(৪)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে শিক্ষাও আরবদেশসমুহকে বদলে দিচ্ছে। সত্য স্বীকার করতেই হয়* লেবানন (যেখানে শিক্ষিতের হার ৮০%) ছাড়া পুরো আরব বিশ্বে নিরক্ষরতা ছড়িয়ে আছে। * নিরক্ষরতার হার মিশরে ৭৫, ইরাকে ৮৬ এবং সৌদী আরবে ৯০ শতাংশেরও বেশী। এটাও সত্য যে কৃষি নির্ভর দেশগুলোতে সব ছেলে মেয়েদের স্কুলের ব্যবস্থা করার মত ফান্ড নেই। তা সত্বেও মিশর, সিরিয়া, সুদান, ইরাকে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চলছে।

সৌদী আরব, সুদান এবং ইরাক যেখানে বিশাল সংখ্যায় যাযাবর জনগন আছে সেখানে শিক্ষা বিস্তারের সমস্যা মারাত্মক। ইরাক এবং সুদানে পরীক্ষামুলকভাবে যাযাবরদের বাৎসরিক অভিবাসনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভ্রাম্যমান স্কুল প্রতিষ্টার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু শিক্ষার্থীদের হাজিরার অনিয়ম, শিক্ষকদের গোত্র-শেখের ব্যক্তিগত কেরানী হওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি কারণে ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক। আপাততঃ অন্যভাবেও চেষ্টা চলছে যেমন:-যাযাবরদের চারণভূমির নিকটতম শহরসমূহে প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রাবাস তৈরী হয়েছে এবং গোত্রের লোকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে যেন তারা বাৎসরিক নিয়মিত ঠাঁই পরিবর্তনের সময় যেন ছেলেমেয়েদের ছাত্রাবাসে রেখে যায়। এই প্রচেষ্টাও আগেরটার চেয়ে ফলপ্রসূ কিংবা স্থায়ী হবে কিনা তা বলার সময় এখনও আসেনি। যাযাবরদের শিক্ষিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রথমে তাদের যাযাবর বৃত্তি থেকে সরিয়ে কৃষিভিত্তিক, স্থায়ী বসবাসের জীবনধারায় ফিরিয়ে আনা।

তবুও শহর এবং গ্রামে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। তুলনামূলক পরিসংখ্যানে মিশরের অবস্থান দীর্ঘদিন ধরে ভাল; যেহেতু আরবদের মধ্যে প্রথম স্বাধীনতা পাওয়া দেশ হিসেবে মিশর নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছে। ১৯২২ সালে স্বাধীনতা পেয়েই মিশর ১৯২৩ সালে ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের সবার জন্যে বিনা বেতনে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রনয়ণ করে। ১৯১৩ সালে মিশরে স্কুলে যাওয়া মোট ছাত্রসংখ্যা ৩২৪,০০০জন; ১৯৩৩ সালে তা এসে দাড়ায় ৯৪২,০০০। ১৯৫১ সালে সে সংখ্যা ১,৯০০,০০০ এ উন্নীত হয়। ১৯২০ সালে মিশর শিক্ষাখাতে ব্যয় করে ১,৬০০,০০০ পাউন্ড,তথা জাতীয় বাজেটের ৪%। ১৯৫১ সালে সে ব্যয় এসে দাড়ায় ২৯০০,০০০ পাউন্ড তথা মোট বাজেটের ১৩%। সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে ১৯৩৩ সালে শুধু ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৫০০ জন, ১৯৩৩ সালে ১৫,০০০ ছাত্র যার ১৫০০ জন ছাত্রী। ১৯৫১ সালে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,২২০০০ যার ১৯০০০জন ছাত্রী। ১৯১৩ সালে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই নগন্য;১৯৫১ সালে এসে সে স্তরের ৪১০০০ জন দেশে এবং ১০০০ মিশরীয় ছাত্র বিদেশে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছে।
বাস্তবতা হচ্ছে মিশরে অর্ধেকেরও কম ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল সংকুলান সুবিধা আছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার পরবর্তী ২০ বছরের আরো ৫০০০ স্কুল তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছে।

যে সমস্ত দেশে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে যখন যেমন কাজ করতে হয় সেখানে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব খুব বেশী। এই বিষয়ে মিশর সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ১৯৪৪ সালে বড় ভূ-সম্পত্তির মালিক এবং নিয়োগ কর্তাদের জন্যে তাদের কর্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা বাধ্যতামুলক করে আইন পাশ করেন। ১৯৫০সালে ৩০০,০০০ নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করা হয়। ১৯৫১ সালে আরববিশ্বে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্যে ইউনেস্কো এক বিশেষ কর্মসূচী হাতে নেয় যার ফলে মিশরের গ্রাম পর্যায়ে ছয় মাসের বদলে ছয় সপ্তাহে আরবী শিক্ষার সরল কোর্স প্রণীত হয়। ১৯৫৩ সালে ইউনেস্কো (যার কর্মকর্তাদের মধ্যে এক স্বনামধন্য ইরাকী শিক্ষাবিদও অর্ন্তভুক্ত ছিলেন) আরব সরকার সমুহের সাথে একত্রে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের জন্যে কায়রোতে মৌলিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করে। অধিকন্তু ১৯৪৬ সাল থেকে 'গণ বিশ্ব বিদ্যালয়' নামে বিনা বেতনে সাংস্কৃতিক এবং কর্মমুখী কোর্স চালু রয়েছে যার কেন্দ্র কায়রোতে এবং প্রদেশ সমুহে শাখা রয়েছে।

শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে আরববিশ্বের বড় রকমের প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় এই পরিসংখ্যানে। ইরাকে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১৯২০সালে ৮০০০ থেকে ১৯৫০ সালে ১৮১০০০এ উন্নীত হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলে ১০০ থেকে ২২৭০০, উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্র সংখ্যা ৬৫ থেকে ৪৮৬০জন। সিরিয়ায় গত তিন বছরে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তিনগুন বেড়েছে। সম্ভবতঃ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে দামেস্কে সিরিয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটির (একসময় যা মুসলিম রক্ষণশীলতার দুর্গ বিবেচিত হতো)। ৫০০০ ছাত্রের মধ্যে ৮০০০ এর বেশী সংখ্যায় ছাত্রী এবং অনেক বিভাগে তাদের অধিকাংশই মুসলিম বালিকা।

আরব বিশ্বে *আজ আধুনিক, সেক্যুলার শিক্ষা প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০। এর চারটি মিশরে; তন্মধ্যে তিনটি রাষ্ট্র পরিচালিত এবং একটি আমেরিকান। লেবাননে একটি ফরাসী , একটি আমেরিকান এবং রাষ্ট্রীয় একটি শুরুর পর্যায়ে রয়েছে। সিরিয়ায় একটি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ইরাক একটি করছে। সিরিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রয়েছে যা ১৯৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা পাবে; আপাততঃ এরা অধিকতর অগ্রসর ছাত্রদের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েশন করার জন্যে তৈরী করছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মিশরীয়রা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিদেশে কর্মমুখী উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সেই দলে * ইরাকের শিক্ষাথীর সংখ্যা কয়েক শত, ১৯৫৩ সালে বৃটেনে প্রায় ১০০ সুদানী ছাত্র ছিল । কুয়েতও তার নুতোন পাওয়া তেল সম্পদের অর্থে অধিক সংখ্যায় ছাত্রদের উচ্চতর পর্য্যায়ে আধুনিক শিক্ষার্থে বৃটেন পাঠাচ্ছে। তিউনিসীয়, আলজেরীয় এবং মরোক্কানরা ফ্রান্সে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত তবে পূর্বাঞ্চলীয় আরবদের চেয়ে তাদের বিষয়টা ভিন্ন, যেহেতু তাদের নিজদেশে সেক্যুলার আধুনিক কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই।

এখানে বিরক্তিকর প্রশ্নের চ্যালেঞ্জসহ কিছু বিরূপ বিষয় আলোচনা করার আছে। প্রথমতঃ সমালোচনা রয়েছে কিছু কিছু আরবদেশে শিক্ষাগত উন্নতিতে সংখ্যার জন্যে গুণগতমানে ছাড় দেয়া হয়েছে; নুতন শিক্ষার ফসল মুলতঃ মেকী অনুকরন, এতে উদ্যোগের অভাব রয়েছে, শিক্ষার প্রতি ততটা আগ্রহ নেই যতটা আগ্রহ এর মাধ্যমে সরকারী চাকরী পাওয়ার প্রতি। ভাল কর্মমুখী শিক্ষার চেয়ে সহজতর উদারবাদী শিক্ষার বিষয়ই ছাত্রদের (এবং তাদের পিতামাতাদেরও) আকৃষ্ট করছে কারণ এতে রয়েছে উচ্চতর সামাজিক মর্য্যাদা এবং এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিশ্রমী কারিগরের বেঞ্চের বদলে অলস কেরানীর টেবিলের দিকে নিয়ে যায়।

উপরের প্রতিটি বিষয়ে কিছু পরিমান সত্য আছে। কিন্তু সাক্ষরতা এবং আধুনিকায়ন তা যতই ত্রুটিপুর্ণ হোকনা কেন তা যদি নিরক্ষরতা, কুসংস্কারের জায়গা দখল করে তাহলে সব সমালোচনা একত্রে যোগ করলেও লাভের পাল্লা ভারী থাকে। যদি ভাবা যায় মেয়েরা অধিক সংখ্যায় এই শিক্ষার সুযোগ নিচ্ছে তখন বুঝা যাবে কত চমৎকার পরিবর্তন আরব জনগনের জীবনে প্রভাব ফেলছে। অর্জিত বিদ্যা আরবভুমিতে শুধু যে জ্ঞান এবং দক্ষতা বাড়াবে তা নয় বরং নারী পুরুষের সম্পর্ক বদলের মাধ্যমে মুসলিম আরব পরিবারের চরিত্র এবং পুরো সমাজ জীবনও পাল্টে দেবে।

দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমা সভ্যতাজাত সেক্যুলার শিক্ষাগ্রহনকারীদের সাথে কায়রোর আল আজহার কেন্দ্রীক মাদ্রাসায় প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষায় (কিছু নুতন বিষয় অর্ন্তভুক্ত করে সামান্য পরিবর্তিত) শিক্ষিতদের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সমস্যা অবশ্যই সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্যা ,আধুনিক বিশ্বের প্রতি মুসলিম আরবের দৃষ্টি ভঙ্গীর সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সেক্যুলারিজম এবং অজ্ঞেয়বাদ প্রসারের কথা আগেও কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে; সেক্যুলারবাদীরা হচ্ছে ঐ মুসলিম যারা আধুনিক পশ্চিমা প্রভাবে ধর্ম বিশ্বাস হারিয়েছে কিন্তু প্রকাশ্যে তা স্বীকার করেনা। আবার আধুনিক পন্থীরাও আছে যারা ধর্ম বিশ্বাস হারায়নি , তবে তা ধরে রাখতে অথবা অন্ত তঃ এটুকু বিশ্বাস করতে উদ্বিগ্ন যে তারা এখনও বিশ্বাসী ।

ধর্ম বিশ্বাসকে বিজ্ঞান এবং আধুনিক চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্য বিধান না করে তারা তা করতেও পারেনা। তাদের প্রবণতা হচ্ছে মধ্যযুগীয় মুসলিম ধর্মতত্বের সাথে তাদের যুক্তির বিরোধ ঘটে এমন সব কিছুই ত্যাগ করা; বলা যায় অধিকতর আধ্যাত্মিক ও রূপক উপমায় ব্যাখ্যা দিয়ে বলা সর্বসাম্প্রতিক বিজ্ঞান, দর্শণ এবং কোরান পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। *চৎড়ভবংঃড়ৎ এরনন* দেখিয়েছেন কীভাবে এই আধ্যাত্মিক নির্বাচন প্রবনতা পুরো ইসলামী ধর্মতত্বের কাঠামোকে ধ্বংস করে নৈতিক বিশৃঙ্খলার দ্বার খুলে দিচ্ছে। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ডারউইনের মুখোমুখি হয়ে আধুনিকপন্থী খ্রীশ্চানরাও কি একদিন একই কাজ করেনি? আধুনিক পৃথিবীতে খ্রীশ্চানরা কি তিন প্রধান গ্রুপে বিভক্ত নয় যারা জীবনের ব্যাখ্যা এবং নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে ধর্ম বিশ্বাস হারিয়ে সেক্যুলারপন্থী হয়েছে; যারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যযুগীয় প্রয়োজনীয়তা ধরে রাখতে গিয়ে নুতন জ্ঞানের প্রতি (যেমন বিবর্তনবাদ)দীর্ঘদিন বিরোধ চালিয়ে এসেছে; এবং যারা পুরোন তত্বকে আধুনিক মনের জন্যে গ্রহনযোগ্য করে পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেছে যতক্ষণ না তা হাওয়ায় মিশে যায়? আধুনিক পশ্চিমা জ্ঞান এবং মৌলবাদী মুসলিম বিশ্বাসের দ্বন্ধের ফলে আজকের আরববিশ্বে লক্ষণীয় বিরোধ-বিভ্রান্তি অবধারিত; এবং এটাকে আরব আত্মায় অধিকতর বিচ্যুতি ঘটাতে দেয়া যায়না, যতটা পশ্চিমা বিশ্বের আত্মার ক্ষেত্রে ঘটেছে।

অবশ্যই পশ্চিমা শিক্ষা নিজে, ভারতের মত একপথে বা পদ্ধতিতে (ক্ষুদ্র ফরাসী, পর্তুগীজ বসতিগুলো বাদ দিলে) আরব বিশ্বে আসছেনা। এর ফরাসী, বৃটিশ এবং আমেরিকান সব সংস্করনই আরবদেশসমুহে পাওয়া যাবে। সত্য বটে, উত্তর আফ্রিকা পুরোটাই পেয়েছে ফরাসী স্টাইলে , এর বিপরীতে ইরাক, কুয়েত, জর্দান এবং সুদান কোন ফরাসী প্রভাবের সাথে পরিচিত নয়। তবে মিশর ,লেবানন,সিরিয়ায় 'গেলিক এবং এ্যাংলো-স্যাক্সন' উপাদান সমুহ যথেষ্ট প্রভাব নিয়ে বিদ্যমান। লেবাননে ফরাসী শিক্ষিত জনগনের মধ্যে যারা

ফরাসী ভাষা এবং সংস্কৃতিতে (এমনকি দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ আলাপচারিতায়ও) মিলেমিশে গেছে ; আর বৈরূতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় ভেদাভেদ আছে। অতীতে বিশেষকরে ম্যান্ডেটকালীন সময়ে ফরাসী শিক্ষা এখানে প্রভাব বিস্তার করেছিল ; কিন্তু ফরাসী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ খর্ব এবং বিশ্ব শক্তি হিসেবে আমেরিকার আবির্ভাব, তেল এবং চার দফা নীতিমালার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সরাসরি স্বার্থ সব মিলিয়ে ঝোঁক এখন আমেরিকান শিক্ষার দিকে। বৃটিশ কাউন্সিলেরও একটা প্রজেক্ট আছে ভিক্টোরিয়া কলেজের ধারায় বৈরূতে একটা ইংরেজী মাধ্যমিক স্কুল খোলার।

ভিক্টোরিয়া কলেজ হচ্ছে আরবদেশসমূহে শিক্ষাক্ষেত্রে বৃটেনের উল্লেখযোগ্য অবদান। আলেকজান্দ্রিয়ায় মুল এবং কায়রোতে শাখা নিয়ে এটা শুধু মিশরীয় কিংবা মিশরে বসবাসকারীদের নয় বরং ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ইরাক, সৌদী আরব, কুয়েত এবং সুদানের ছাত্রদের ইংলিশ পাবলিক স্কুল শিক্ষা প্রদান করছে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর ডুবে যাওয়া, এবং জারতন্ত্রী রাশিয়ার পতনের পুর্বে লেবানন এবং প্যালেস্টাইনে কিছু জার্মান এবং রাশান স্কুল ছিল। এককালে লেবাননের গ্রামে 'মাস্কোভিয়া'নামে পরিচিত স্কুল থেকে বেশ কিছু লেবানীজ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়াশোনার জন্যে কিয়েভ, মস্কো অথবা সেন্ট পিটাসবার্গে গিয়েছিলেন।
আরবদেশসমূহে পশ্চিমা শিক্ষা প্রবেশের এই নানা পথ পদ্ধতি সাময়িক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও মুলতঃ এতে কোন ক্ষতি নেই। বিপরীতক্রমে এর মাধ্যমে আরবদেশসমূহে সমৃদ্ধশালী বহুমুখীনতা আসছে। এখানে সেই একই মাটি একসময় যেখানে সব বিদেশী স্রোতধারা মিলেমিশে গৃহীত হবে এবং সেটাই হবে আরবী ভাষায় সৃষ্ট সংস্কৃতি।

প্রচার প্রকাশনার কথা বাদ দিলে আরব বিশ্বের সাংস্কৃতিক ফসল তা আরবী কিংবা বিদেশী যে কোন ভাষাতেই হোক না কেন , নিতান্ত নগন্য। চার্লস ঈসাওয়ী মিশরে (আরব দেশসমূহের মধ্যে বৃহত্তম এবং সবচেয়ে অগ্রসর দুই দেশের একটি) প্রকাশিত পুস্তকের পরিসংখ্যান দিচ্ছেন:-১৯৪৮ সালে ৫৪৮ টি তন্মধ্যে ৬৭ টি অনুবাদ। সে যাহোক, জ্ঞান এবং গবেষনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিমা পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররা ক্রমবর্ধমানহারে এগিয়ে আসছে এবং আরব দুনিয়ার সমস্যা সমাধানে দক্ষতার সাথে তাদের শিক্ষা প্রয়োগ করছে।

সাহিত্যের কাছাকাছি শিল্পকলার জগতও কিছু আলোচনার দাবী রাখে। খুব কম সংখ্যক ভাস্কর এবং অঙ্কন শিল্পী (মুলতঃ মিশরীয় এবং ফরাসী প্রভাবিত) সামান্য মাত্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন। আধুনিক আরবী সঙ্গীত এখনও নিজস্ব চরিত্র অর্জন করতে পারেনি । সিনেমা, গ্রামোফোন, রেডিও অথবা সরাসরি পরিবেশনায় তা বেশ জনপ্রিয় হলেও এতে পুরাতন লোকগীতির আনন্দ কিংবা সততার যেমন অভাব তেমনি যে পশ্চিমা ঢংয়ের নকল করতে চাইছে তার মৌলিক, জটিল সুর সামঞ্জস্যতারও অভাব। শব্দ এবং প্রধানতঃ সহজে অন্তঃমিলের শব্দই এখনও আরবদের শৈল্পিক প্রকাশের মুল মাধ্যম। তবে এ'ও লক্ষণীয় যে ক্রমবর্ধমান পশ্চিমা প্রভাবে সাহিত্যের নুতন ধরণ আসছে; প্রধানতঃ ছোটগল্প ও নভেল আসছে যাতে আরব জীবনের এক নুতোন ধরণের বাস্তবতার চিত্র পাওয়া যায়।

(৫)

সমসাময়িক আরবদের বিষয়ে উৎসাহী পাঠকের প্রবল আগ্রহের দুটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে এই আলোচনা শেষ করা যাচ্ছেনা। প্রথম প্রশ্ন আরব এবং ইসরায়েলের ইহুদীদের সম্পর্কের বিষয়ে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিম এবং কম্যুনিজমের মধ্যে আরব অবস্থান সম্পর্কে। বর্তমানে আরবদের প্যালেস্টাইনে পরাজয় এবং ইহুদী রাষ্ট্রের গঠন মেনে নিতে হয়েছে; এদের মধ্যে ওরাও আছে যারা কথায় কথায় তাচ্ছিল্যের সাথে অথবা আন্তরীক কামনায় নিকট ভবিষ্যতে ইসরায়েলকে ধুলিস্যাৎ করে প্যালেস্টাইন পুনর্দখল করার জন্যে 'আরেক

রাউন্ড' আশা করে। তবে অধিকাংশ আরবরাই মনে করে এসব কথা এবং কামনা নিরর্থক। এই উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্যে জরুরী ঐক্য কিংবা সেনাশক্তি আরবরা অর্জন করেনি। পশ্চিমা শক্তিবর্গ এবং জাতিসংঘ তা তাদের করতে দেবে ধরে নিলেও, বলপুর্বক ১৯৪৮ সালের সিদ্ধান্ত পাল্টে দেবার মত শক্তি আগামী বছর বছর ধরেও তাদের পক্ষে অর্জন করার মত নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, এবং ফ্রান্স ইসরায়েল এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সীমান্তের গ্যারান্টি দিয়েছে , এবং জাতীসংঘের যুদ্ধবিরতি কমিশন স্থায়ী পর্যবেক্ষণে রয়েছে যাতে তার কোন লঙ্ঘন নাহয়। অধিকন্তু জর্দানে বৃটিশ প্রভাব (চুক্তি,ভর্তুকি, এবং আরব লিজিয়নে বৃটিশ অফিসারদের মাধ্যমে প্রসারিত) তেমনি মার্কিন প্রভাব সেখানে, এবং লেবানন ও মিশরে (চার দফা সহায়তার মাধ্যমে) আরব রাষ্ট্রসমূহের প্যালেস্টাইন উদ্ধারে যে কোন সামরিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবহৃত হবে। অনেক আরব রাষ্ট্রই যা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছেনা তা হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক প্রভাব সমূহ ইহুদীদের আরও আরব রাষ্ট্র জবর দখল বিশেষতঃ জর্দানের দিকে সম্প্রসারণ চেষ্টার বিরুদ্ধেও সমানভাবে প্রয়োগ হবে কিনা।

এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে জর্দান উপত্যকায় আরব উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে ইহুদীরা বিরূপ ভাবাপন্ন, এবং তারা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে সিরিয়া, লেবাননে যতবেশী সম্ভব আরব উদ্বাস্তুদের পাকাপাকি ঠাঁই করে দিতে চেষ্টা করছে। এই প্রমাণকে আরবরা জর্দান উপত্যকায় ইসরায়েলী সম্প্রসারণের গোপন অভিপ্রায় হিসেবে ব্যাখ্যা করে। আরবরা আরও যুক্তি দেখায়- অনিয়ন্ত্রিত ইহুদী আগমন চালু রাখার ইসরায়েলী নীতি যদি ইসরায়েলী সম্প্রসারণবাদের আরেক চি হ্ন না ও হয় তা ভবিষ্যতে প্যালেস্টাইনী ভূমিতে এমন ঠাসাঠাসি ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য যা প্রতিবেশী সব আরব রাষ্ট্রের জন্যে বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতির জন্ম দেবে। হতে পারে আরবরা জায়নবাদীদের আন্তর্জাতিক শক্তিকে বাড়িয়ে দেখছে কিন্তু গুরুত্বপুর্ন বিষয় হচ্ছে তারা বিশ্বাস করে এটা সত্যি সত্যিই এতটাই শক্তিশালী যে (আরব রাষ্ট্রসমূহ যথাযথভাবে নিজেদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে) জর্দান অথবা গাজা অঞ্চলে আরেক টুকরো আরবভূমি সহজেই গ্রাস করে নিতে পারে। তাই আরব রাষ্ট্র নেতাদের প্রাথমিক চিন্তা হচ্ছে নিজেদের সামরিক শক্তি এতটা বাড়ানো যাতে ইসরায়েলের চারিদিকে দুর্ভেধ্য লৌহবর্ম খাড়া করানো যায়।

কিন্তু তারপর? আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে বড় ধরনের কোন সম্ভাব্য সংঘাত কি আন্তর্জাতিক তৎপরতা অথবা বিবদমান উভয়পক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্যপুর্ন শক্তির ভারসাম্য বিধান করে কিছু সময়ের জন্যেও তা কি ঠেকানো সম্ভব? প্রকৃত শান্তি এবং বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়ার কোন আশা কি আছে? আরবরা কি ইসরায়েলীদের মেনে নিয়ে সামাজিক,স্ট্রাটেজিক,অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের অঞ্চলে সংযুক্ত করবে?

অদুর ভবিষ্যতের জন্যে এ প্রশ্নের বাস্তব এবং সদুত্তর হচ্ছে না। আরবচোখে ইহুদীরা হচ্ছে এমন এক জঘন্য দুস্কর্মের হোতা যেমনটা নাৎসীরা করেছিল ইহুদীদের বিরুদ্ধে। তারা এমন এক আগ্রাসী যারা পুরো এক আরব জনগোষ্ঠীর দেশ কেড়ে নিয়ে সবাইকে অথবা তাদের মধ্যে বিরাট এক অংশকে প্রতিবেশী আরব দেশসমুহে ঠিকানাবিহীন উদ্বাস্তু হিসেবে তাবু জীবনে ঠেলে দিয়েছে। আরবদের কাছে ইসরায়েল হচ্ছে বিদেশী, ঘৃণিত এবং আরব বিশ্বে এক ভয়ংকর অনুপ্রবেশ; এক উগ্র মিলিশিয়া জাতীয়তাবাদ যা আরব সমাজের অস্তিত্ব,এবং সুস্থ অগ্রগতির সাথে খাপ খায়না। আরবদের কাছে চিরদিন প্যালেস্টাইন এক নিঃশর্ত আরবভূমি যা বিদেশী আগ্রাসীরা জোর পুর্বক কেড়ে নিয়েছে। এই আগ্রাসীদের মেনে নেয়া, তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করা, তাদের সাথে বিনিময়, অর্থনৈতিক কিংবা স্ট্রাটেজিক সহযোগীতা করা আরব জাতীয়তাবোধের বিরোধী, অতএব কোন আরব রাষ্ট্র তা করছে ভাবাই অবান্তর। প্যালেস্টাইন যুদ্ধের ছয় বছর পরে এখনও আরবদের পক্ষে ইসরায়েলীদের সাথে কোন রকম সম্পর্ক, শান্তি স্থাপন কিংবা পরোক্ষ স্বীকৃতির সামান্য চি হ্নও দেখা যাচ্ছেনা।

অফিসিয়াল এবং অত্যন্ত কার্য্যকর বয়কট সত্বেও সামান্য চোরাকারবার ছাড়া ইসরায়েলের সাথে তার চতুর্পার্শ্বের আরব রাষ্ট্রসমুহের কোন বাণিজ্য সম্পর্ক এমনকি যান চলাচলও নেই। কায়রো-হাইফা ট্রেন আর চলেনা, হাজার হাজার মিশরীয়রা যারা প্রতি বছর প্যালেস্টাইন হয়ে লেবাননে ছুটি কাটাতে যেতো তারা এখন বিমান অথবা সমুদ্রপথে যায়। বৈরুত-হাইফা সড়কের উভয় দিকে পন্য এবং যাত্রীবাহী হাজার হাজার যানবাহন এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। পাসপোর্টে ইসরায়েলের ভিসা থাকলে কোন বিদেশী ভ্রমনকারী কোন আরবদেশে ঢুকতে পারেনা।

ইসরায়েল, অবশ্যই চুড়ান্ত নিস্পত্তি করতে চায় যাতে আরব রাষ্ট্রসমুহ তার সাথে শান্তি স্থাপন করে এবং তাকে মধ্যপ্রাচ্যের জাতি গোষ্ঠীতে অন্তর্ভূক্ত করে। সে জানে তার সংকীর্ণ এলাকায় শুধু শিল্পায়নের মাধ্যমেই সে সন্তোষজনক জীবনমান অর্জন করতে পারে, এবং সে আরো ভালো করেই জানে আরবদেশগুলো তার পন্যের জন্যে বাজার খুলে না দিলে এই শিল্পায়ন সম্ভব নয়।

পশ্চিমা শক্তিবর্গও চায় ইসরায়েল এবং তার প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে যেন শান্তি স্থাপিত হয়, কারন যতক্ষণ শান্তি স্থাপন না হবে ততক্ষণ মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী বিস্পোরনের বিপদ থেকে যাবে; কারণ আমেরিকান স্ট্রাটেজী প্রণেতাদের প্রিয় মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠন অনেক সহজ হয় যদি এতে আরব এবং ইসরায়েলীরা সহযোগীতা করে। শেষতঃ মোটেই যা তুচ্ছ নয়, কেউ যখন অন্যের মারাত্মক ক্ষতি করে তবে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ তা হজম না করে নেয়া পর্য্যন্ত অপরাধীকে তার বিবেক তাড়া করে ফিরে।

তবে পারিপার্শ্বিকতার যুক্তি এবং আরব উদ্বাস্তুদের প্রশ্নে ইসরায়েলীদের দৃষ্টিভঙ্গী আরব রাষ্ট্রসমুহকে ইসরায়েলের সাথে শান্তি স্থাপন না করার পক্ষে সমর্থন দেয়। তারা দাবী করে, যে কোন নিস্পত্তির শর্ত হতে হবে উদ্বাস্তুদের প্যালেস্টাইনে ফিরে যাওয়া এবং তাদের হৃত সম্পত্তি ফিরে পাওয়া; অবশ্যই নিস্পত্তির আগেই ইসরায়েলকে এ শর্ত পুরন করতে হবে। ইসরায়েলীরা এতে সম্মত হবেনা; এমনকি তারা ইচ্ছা করলেও তাতে সম্মত হতে পারবেনা যেহেতু প্যালেস্টাইনে (নুতন অভিবাসীদের আনার ফলে) পূর্বতন অধিবাসীদের জন্যে কোন জায়গা নেই। ইসরায়েলীরা আরব উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধান হিসেবে অন্য আরব রাষ্ট্রে উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনে সাহায্য স্বরূপ তাদের সর্বোচ্চ ছাড় সামান্য অর্থ দান (যা প্যালেস্টাইনে আরব সম্পত্তির আনুমানিক মুল্য প্রায় *৫০০,০০০,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরও সমান নয়) করার প্রস্তাব দিয়েছে। আরবরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

অচলাবস্থা চলছে, আরবরা নিকট স্বার্থ হাণির ঝুঁকি নিয়েও ইসরায়েলীদের প্রতি তাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে রাজী নয়। এভাবেই ইরাক প্রচন্ড আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও হাইফায় তার তেল প্রবাহ বন্ধ করেছে। সর্বোপরি, ১৯৫৪সালে ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনায় উপর্য্যপুরি চাপের মুখেও সুয়েজ খাল দিয়ে ইসরায়েলগামী জাহাজের উপর এযাবৎ চালিয়ে আসা নিষেধাজ্ঞা কোনভাবে শিথিল করার কথা দিতেও অস্বীকার করে । মিশরের কাছ থেকে ইসরায়েলের পক্ষে কোন সুবিধা আদায় ছাড়াই শেষাবধি বৃটেনকে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছে; বৃটিশ ফরেন সেক্রেটারী কমন্স সভায় জায়নবাদীদের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে শুধু এটুকু বলতে পেরেছেন 'তিনি বৃটেন এবং মিশরের মধ্যে নুতন এবং অধিকতর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের আশা করেছিলেন যা ইসরায়েলের জন্যে পরিস্থিতির আরো উন্নতিতে সহায়ক হতো'।

প্রশ্ন আসতে পারে বয়কট এবং ইসরায়েলকে একেঘরে করে রাখার নীতি দিয়ে আরবরা কি অর্জনের আশা করতে পারে? এ'প্রশ্নের দু'টি উত্তর । প্রথমটি আবেগী এবং যুক্তিবিহীন ধরনের যাতে অনেক মানবিক বিষয় সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়টি হিসেব নিকেষ করা বাস্তব পর্য্যায়ের। প্রথমতঃ ইসরায়েলের প্রতি আরবদের দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমানে চরম বন্ধমুল ঘৃণার। আরবদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে ইসরায়েলকে বয়কটের মাধ্যমে কিছুটা

হলেও তারা সে ঝাল মেটাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ আরবদের বিশ্বাস; ইসরায়েলের সাথে কিছু করার অস্বীকৃতির ফলে সময়ের ব্যবধানে দেশটা একঘরে হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা জানে,এবং ইসরায়েলীরাও জানে আরব বাজারে প্রবেশ করতে না পারলে ইসরায়েল ঠিকে থাকতে পারবেনা এবং এই প্রবেশাধিকার ছাড়া ক্রমান্বয়ে সে আমেরিকান জায়নবাদীদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে যারা এখন পর্য্যন্ত তাদের ভর্তুকি পাঠিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আরবদের আশা, ইসরায়েলকে বাজার সুবিধা অস্বীকারের ফলে সেখানে জীবন মান কমবে এবং অভিবাসনের ঝোঁক বিপরীতমুখী হবে;ইসরায়েলে আসার বদলে ইহুদীরা তা ছেড়ে যাবে যেমনটা জার্মানীতে নাৎসীদের ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে হয়েছে। তাদের স্মরণে আছে ১০০ বছর টিকে থাকার পর জেরুযালেমে ল্যাটিন রাজত্ব শেষ হয়েছিল। তাদের কাছে ইসরায়েল হচ্ছে তেমনি এক কৃত্রিম সৃষ্টি,এমন এক জগদ্দল পাথর যা মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে আরব পাহাড়ের ঢাল ঠেলে কিছুটা উপরে উঠানো হয়েছে।

একা মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের সংখ্যাই * ৫০ মিলিয়নেরও বেশী , বিপরীতে ইসরায়েলের দেড় মিলিয়ন; তাকে বিচ্ছিন্ন এবং অত্র অঞ্চলের আদি জনসমাজের বাইরে রাখা হলে কালক্রমে ক্রমবর্ধমান আরব সম্পদ, শক্তি, সংহতির মুখে সে নি:শেষ যাবে। আমদানী করা বৃক্ষ এবং তার ন্যুয়র্কের শেকড় মরে যাবে, মধ্যাকর্ষণকে আপাতত: প্রতিরোধকারী পাথর উপত্যাকার তলায় গড়িয়ে যাবে। যারা মনে করে আরবদের দৃষ্টি বদলানো যাবে,আরবদেশসমূহ এবং ইসরায়েলের মধ্যে প্রকৃত সহযোগীতা ও শান্তি আনা যাবে, বর্তমান উদাহরণ এবং যতটা সম্ভব ভবিষ্যত বিবেচনার নিরিখে বলতেই হয় তারা স্বেচ্ছা বিভ্রমে আছেন।

এখানে আমরা রাশিয়া ও পশ্চিম তথা সাম্যবাদী ও মুক্ত বিশ্বের মাঝে আরবদেশসমূহের অবস্থান খতিয়ে দেখতে পারি।

প্রথমতঃ আরবদেশসমূহে সামাজিক,রাজনৈতিক শক্তির আভ্যান্তরীন বিবর্তনের ঝোঁক কোনক্রমেই সাম্যবাদের দিকে নয় বরং পশ্চিমা ধরণের দিকে মনে হয়। সিরিয়া,লেবানন, ইরাক,মিশরে যে সব সাম্যবাদী আন্দোলন কিংবা পার্টি ছিল গত ২০-৩০বছরে তারা খুব সামান্যই এগিয়েছে যদিও দারিদ্র্য, সামাজিক অস্থিরতার মত যে সমস্ত পরিবেশে কম্যুনিজম উন্নতির আশা করে তার কোন অভাব এ অঞ্চলে ছিলনা। এর অনেক কারণও আছে; যেমন ক্ষমতাসীন সরকার সমূহের (বেসামরিক কিংবা সাম্প্রতিক সময়ের সামরিক) সাম্যবাদীদের কার্যক্রমে বাধাপ্রদান, বিরাট সংখ্যায় শিল্প প্রলেতারিয়েত এবং শক্তিশালী ট্রেডইউনিয়নের অভাব যা সাম্যবাদীরা দখলে আনতে পারতো, বস্তুবাদী এবং অবিশ্বাসী উপাদান ও জীবন ব্যবস্থা যার প্রতি ইসলামের বিরোধ, এবং আরব চরিত্রের দৃঢ় এমনকি স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

তদুপরি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ইত্যাদি পশ্চিমা ধারণার প্রভাবাধীনেই আরবরা রাজনৈতিক বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেছে। এমনকি যখন তারা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে,তাও পশ্চিমা ধ্যান ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিমা আদর্শের লক্ষ্যেই তা করেছে। পশ্চিমা ধাঁচের জন প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্টান সমূহের ভিত্তি যত নড়বড়েই হোক তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মনীষা পুরোটাই পরিপক্ক হয়েছে পশ্চিমে কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের পশ্চিমা স্কুল সমূহে। এই মনীষার অংশ বিশেষ যুদ্ধের আগে পরে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাদের আগ্রহের প্রধান উৎস মুলতঃ পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক সাম্যবাদ, যেদিকে যুদ্ধমধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমা উদারবাদীদের কোন নগন্য অংশও হতাশায় দিক ফেরাননি।

সিরিয়া এবং মিশরের মত আরবদেশগুলোতে যখন বিপ্লব আসে তা কম্যুনিস্টদের মাধ্যমে নয় বরং জাতীয়তাবাদ এবং লিবারেল ও কিছুটা সমাজতন্ত্রী ধাঁচের সংস্কারে অনুপ্রাণিত সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তা সংগঠিত হয়। এভাবে বলাযায়,অধিকতর অগ্রসর আরবদেশসমূহের আভ্যান্তরীন রাজনৈতিক বিবর্তন সেনা একনায়কতন্ত্রের সহায়তায় খোঁড়া এবং টলমল পদক্ষেপে সামনে এগিয়েছে।
পশ্চিমায়ীত, সেক্যুলার গণতান্ত্রিক তুর্কি রাষ্ট্র কিছু আধুনিকপন্থী আরবদের আদর্শ। যতদুর দেখা যায়, রাশিয়াকে যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে রাখা গেছে, পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং সংস্কারপন্থী সেনা একনায়কতন্ত্র ব্যর্থ হলে এখানে বিকল্প হিসেবে মাঠ দখল করতে পারতো ইসলামী ধর্মতন্ত্র; পুনরুত্থানকারীদের শক্তি স্বরূপ মুসলিম ব্রাদারহুড যার প্রতিনিধি। সত্যবটে, ব্রাদারহুডের ভেতর সাম্যবাদী অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং তারা তাকে সংগঠিত করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু আন্দোলনটা পুরোপুরি ইসলামী চরিত্রের এবং উদ্দীপনার। ফরাসী উত্তর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদীরা এমনকি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাদের তিক্ততম সংঘাতের মুহূর্তেও সাম্যবাদীদের সাথে আঁতাত করেনি।

আভ্যান্তরীন বিবর্তনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যদি আমরা বিদেশনীতি এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর দিকে তাকাই তাহলেও দেখতে পাব আরব বিশ্বের বরাবরের ঝোঁক পশ্চিমের দিকে। একসময় আরব চোখে যখন পশ্চিম ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক তখন আরবরা রুশকে তাদের স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে দেখেনি কারণ তারা কখনও রুশ কিংবা সাম্যবাদী শাসনাধীনে পড়েনি অথচ যুগ যুগ ধরে বৃটিশ অথবা ফরাসী শাসনে কাটিয়েছে। সে সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। পুর্বাঞ্চলীয় আরব বিশ্বে তা একরকম ফুরিয়ে গেছে, পশ্চিমাঞ্চলেও এর গত হওয়ার দিন তিউনিসিয়া থেকে শুরু হচ্ছে। আরব রাষ্ট্রসমূহের উপর পশ্চিমা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সেনা দখলদারীত্বের অবসানের সাথে সাথে পশ্চিমের সাথে তার মৈত্রী সম্পর্ক মজবুত হতে বাধ্য কারণ তখন তাদের নুতন পাওয়া স্বাধীনতার উপর হুমকি আসতে পারে একমাত্র পূর্বদিক থেকে। ইতোমধ্যে ঈঙ্গা-মিশরীয় চুক্তি পুর্নমুল্যায়নের মধ্য দিয়ে মিশর (বলা যায় মিশরের নেতৃত্বে পুরো পূর্বাঞ্চলীয় আরব রাষ্ট্রসমূহ) পশ্চিম এবং রুশের মধ্যে যে কোন সম্ভাব্য সংঘাতে, যাতে এই সেদিনও তারা পরিত্রাণের স্বপ্ন খুঁজে পেত, নিরপেক্ষ থাকার নীতি থেকে সরে এসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে । শুধু যে কোন আরব রাষ্ট্রের উপর হামলা হলেই নয় অধিকন্তু তুরস্ক আক্রান্ত হলেও বৃটেন কতৃক সুয়েজঘাঁটি পুনর্দখলে মিশর সম্মতি দিয়েছে।

মিশর সরকারের এক নেতৃস্থানীয় কর্তা আরও বলেছেন, তুর্কির উপর আক্রমণ হওয়া মানেই বিশ্বযুদ্ধ এবং এ ধরণের পরিস্থিতিতে 'বৃটেনকে পাশে পাওয়া মিশরের জন্যে খারাপ কিছু হবেনা'। নিঃসন্দেহে, চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন সময়ে অর্থাৎ অন্ততঃ পরবর্তী সাত বছর মিশরের নিরপেক্ষ থাকার নীতির এখানেই ইতি। এবং যেহেতু মিশরের বৃটিশ দখলদারীত্ব বিরোধী অবস্থানের কারণেই আরব দেশসমূহের অনেকেই ফলাফল সম্পর্কে সন্দেহ প্রবণ হয়েও সাগ্রহে নিরপেক্ষতার নীতি মেনে এসেছে, এখন আশা করা যায় তারা (ইরাক,সিরিয়া,জর্দান এবং বিশেষকরে লেবানন) খোলাখুলি ভাবেই পশ্চিমের সাথে অধিকতর সম্পর্কের নীতির দিকে ঝুঁকবে। কিছু সময়কাল আগে থেকে আরব দেশসমূহ বৃটেন এবং আমেরিকা থেকে অস্ত্র এবং অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়ে আসছে। চারদফা নীতির আওতায় উন্নয়নশীল অঞ্চলে সম্পদ ও জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া হচ্ছে, কালক্রমে যা কমিউনিজমের একমাত্র উত্তর হয়ে দাঁড়াবে কারণ সেখানকার প্রধান অভিশাপ দারিদ্র্য এবং তা থেকে মুক্তি পেতে জনগন সামনে পাওয়া যে কোন তন্ত্র-মন্ত্রকেই আঁকড়ে ধরবে। আরবরাষ্ট্র মিশর এবং ইরাকের সাথে বৃটেনের যত বকেয়া রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির সাথে সাথে আরব দেশসমূহের জন্যে পশ্চিমা সাহায্যের দ্বার খুলে যাবে এবং উভয় পক্ষে আরও আন্তরীক সহযোগীতা সম্ভব হবে।

তেল শিল্পে ইতোমধ্যেই আরব দেশসমূহ এবং পশ্চিমের মধ্যেকার সম্পর্কের বন্ধন বেশ জোরালো। ইরাক, সৌদী আরবসহ পুরো পারস্য উপসাগর ধরে এবং মিশরেও তেল আহরনে একদিকে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও হল্যান্ড অন্যদিকে আরবদের সর্বোত্তম পারস্পরিক মুনাফার অংশীদারীত্ব নিয়ে আসছে। এখন কোন আশঙ্কা

ছাড়াই আশা করা যেতে পারে যে , পারস্যের মর্মান্তিক ভুল বুঝাবুঝি থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের জনগন এবং মধ্যসত্বভোগী কোম্পানীগুলো উভয়েই অন্যত্র তেমন বিপর্যয় ঘটতে দেবেনা, এবং আরবদেশসমুহ ও পশ্চিমের সাথে ইতোমধ্যে স্থাপিত অংশীদারীত্ব সম্পর্ককে এই গুরুত্বপুর্ন ক্ষেত্রে আরো সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে।

মানচিত্রের দিকে এক নজর ভালকরে তাকালেই দেখা যাবে ভৌগলিক সম্পর্কের কতোটা গাঢ় বন্ধন ইউরোপ এবং আরব বিশ্বকে একত্রে বেঁধেছে। এই ভূ-মধ্যসাগরের চারপাশে পুর্ব এবং পশ্চিম চিরকালের জন্যেই পুর্ব এবং পশ্চিম এমন কোন কথা নেই। এখানে বৈশ্বিক ভূগোলের বিচারে, ছোট্ট এক সমুদ্রের চারপার্শ্বে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বিখ্যাত যত মৌলিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং মিলেমিশে বিকশিত হয়েছে। স্পেন থেকে মরক্কো এক কদম দুরত্বে; এবং মাল্টা, সিসিলি, সার্দিনিয়া,কর্সিকা সবসময়ই উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপের মধ্যেকার পথে জিরিয়ে নেবার ঠাঁই।

জিব্রাল্টার পেরিয়ে ৮০০ বছর স্পেন দখলে রেখে, ফ্রান্সে ধাক্কা দিয়ে এবং মহাদেশের উল্টোদিকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মধ্যযুগে আরবরাই ইউরোপে অনধিকার প্রবেশ করেছে। আধুনিক যুগে স্রোত উল্টো দিকে ঘুরে গেছে। এখন ইউরোপীয় জাতী সমূহ আরববিশ্বের উপর হামলে পড়েছে; তবে তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আরবদের ইউরোপ শাসনের চেয়েও বহুগুন প্রভাবশালী এবং চূড়ান্ত পর্য্যায়ে তা পুরো আরববিশ্ব তথা উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া সত্বেও কোথাও তারা দখলীকৃত অঞ্চল নিজেদের সাথে পাকাপাকি মিশিয়ে নেয়নি অথবা স্পেনে আরবদের মত দীর্ঘদিনের জন্যে ধরে রাখেনি ।

শেষাবধি আরবদের যেমন স্পেন ছেড়ে আসতে হয়েছে তেমনি ইউরোপীয় জাতীসমূহকেও আরবদেশসমূহ ছাড়তে হয়েছে (কিংবা হচ্ছে)। ইউরোপ এবং আরব বিশ্বের জন্যে এখন সময় এসেছে কেউ কারো ভূমি জবরদখল না করে, ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অপরিবর্তনীয়ভাবে নিজেদের হওয়া ভূমিতে স্ব-স্ব অবস্থান বজায় রেখে , যে সমুদ্র তাদের উভয়ের অধিকারে রয়েছে তার এপার ওপারে সুপ্রতিবেশীসুলভ আদান প্রদানের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বন্ধুত্বপূর্ণ অংশীদারীত্বে উপভোগ করার; এমন আশা করা কি খুব বেশী হয়ে যাবে?

সমাপ্ত

লেখকের চিঠি...

সম্মানিত লেখকের পক্ষ হতে সম্পাদকের কাছে একটি পত্র

সম্মাণিত সম্পাদক

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের বাতাবরনে, আরবদের হেনস্থা হওয়ার প্রেক্ষাপট খুঁজতে গিয়ে, নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা ও ভাললাগা থেকে বইটি অনুবাদের চেষ্টা করেছিলাম। তদবধি কর্ম (দুষ্কর্ম)টি ওভাবেই রয়ে গেছে। এক্ষণে, আপনার ওয়েভ সাইটে

(http://www.marupalash.com) প্রকাশিত বই পত্রের উদাহরণ দেখে অনুপ্রাণিত হলাম। যদি আপনার পাঠকদের কোন উপকারে আসে, তা ভেবে প্রকাশের জন্যে পাঠালাম।

ধন্যবাদ
শুভেচ্ছান্তে
মো: আলী আজম
১০ নভেম্বর ২০০৮ইং
কুয়েত।